ওঁ তৎসৎ।

অভিব্যক্তিবাদ।

কলিকাতা।

৩৯নং সিমলা ষ্ট্রীটস্থ "সাহিত্য প্রেসে" শ্রীপান্নালাল সেন

কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩০৯ সাল।

 [মূল্য ২৷৷০ টাকা মাত্র।

৺দ্বারিকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, আদিব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণ সম্পাদক, অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রণেতা, কলিকাতা, যোড়াসাঁকো নিবাসী, শাণ্ডিল্যগোত্র,

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি,এ, তত্ত্বনিধি,

কর্ত্তৃক বিরচিত, "অভিব্যক্তিবাদ" পুস্তক অদ্য ১৮২৪ শকে, ৫০০৩ কলিগতাব্দে শুক্লপক্ষে শুভ মহাষ্টমীতিথিতে কন্যা-রাশিস্থ ভাস্করে আশ্বিনমাসে শুভ চতুর্বিংশদিবসে শুক্রবারে, প্রকাশিত হইল।

ওঁ

উপহার।

বিজ্ঞানভিক্ষু বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের করকমলে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপে আমার এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থখানি উপহার দিলাম।

ভূমিকা।

বর্ত্তমানে অভিব্যক্তিবাদ পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে—অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে তাহা গোঁড়ামী ও অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া উপেক্ষার বিষয় হয়। আমাদিগের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইংরাজীতে অভিব্যক্তিবাদ বিষয়ক অনেক পুস্তকই পড়িয়া থাকেন। আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গেই ইহার ছায়া পড়িয়াছে। মাসিকপত্রাদিতে এতদ্বিষয়ক সুন্দর ও সারগর্ভ প্রবন্ধও অনেক প্রকাশিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এপর্য্যন্ত এতৎসম্বন্ধীয় একখানিও সাঙ্গ পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল না। আজ অনেক বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় "মানব-প্রকৃতি" নামক একখানি পুস্তক বাহির করিয়াছিলেন। গ্রন্থের নামেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি তাহাতে মানব-প্রকৃতির অভিব্যক্তিই বুঝাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন—কিন্তু ইহা অভিব্যক্তিবাদের একটী অংশ মাত্র। যাই হৌক্, তিনি বাঙ্গালাভাষায় এবিষয়ের গ্রন্থরচনা বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলিয়া আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদের পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার পর আর একখানিও এই সরস ও বিস্ময়োদ্দীপক বিষয়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হইল না কেন? ইহার কারণ আছে বলিয়া বোধ হয়। শুনিয়াছি, ক্ষীরোদ বাবুর গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর তদানীন্তন কতকগুলি সংবাদ-পত্রের সমালোচনায় তিনি নাস্তিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষীরোদ বাবু অবশ্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের অনুসরণে তাঁহার পুস্তকে অভিব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব দেখাইয়াছেন, ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব তাহার নিয়মত্ব প্রদর্শন করেন নাই—নিষ্প্রয়োজন বোধে করেন নাই। লোকে ভাবিল যে তিনি নাস্তিকতা প্রচারে উদ্যুক্ত। লোকেদের ও যে তাহাতে বিশেষ দোষ ছিল তাহা বলি না—সেই সময়ে নাস্তিকতা সমর্থন করিয়া সাহিত্য জগতে অক্ষয় নাম রাখিবার এক ভ্রান্ত ধারণা সাহিত্যরথীগণের মধ্যে বলবতী হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ক্ষীরোদ বাবুর গ্রন্থ বিদেশীয় দৃষ্টান্তে এবং বৈদেশিক পরিভাষায় পূর্ণ হওয়াতে শিক্ষিতমহলে বিজ্ঞানের এই অংশ দেশীয় পরিচ্ছদে প্রকাশ করিবার

সক্ষমতা বিষয়ে এক গভীর নিরাশা আসিয়াছিল। সেই নৈরাশ্য আজও যে সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। আমি কেন অসমসাহসিকতার সহিত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম, তাহা এইবারে বলা আবশ্যক।

আজ প্রায় ১৫ বৎসর হইল, কতকগুলি কারণে পূজ্যপাদ পিতৃব্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশে অভিব্যক্তিবাদ আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। যতই আলোচনা করিতে লাগিলাম ততই জগতের কার্য্য মধ্যে ভগবানের মঙ্গলহস্তের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। আমার অনেকগুলি সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। সেই সকল মীমাংসা আমি বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া এতদ্বিষয়ক একখানি সাঙ্গ পুস্তকের বড়ই অভাব বোধ করিতে লাগিলাম এবং অবশেষে ভগবৎপ্রেরিত হইয়া আমিই সেই অভাব মোচন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলাম। জানি না, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যে অভিব্যক্তিবাদ বিষয়ক সম্পূর্ণ গ্রন্থ তাহা বলিতেছি না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, অভিব্যক্তিবাদের ইতিহাস অবধি আরম্ভ করিয়া তাহার ফলাফল পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সাধ্যমত সংক্ষেপে অথচ বিশদরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সমগ্র জগতে অভিব্যক্তির কার্য্যে যে এক মঙ্গলময় নিয়ন্তা পুরুষের হস্ত পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও গ্রন্থের আদ্যন্তে দেখাইতে ত্রুটী করি নাই। সাধ্য মত বিদেশীয় পরিভাষা ও দৃষ্টান্ত বর্জ্জন পূর্ব্বক দেশীয় দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া এবং অনেক গুলি চিত্র সংলগ্ন করিয়া গ্রন্থখানিকে সরস করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। রাশীকৃত বর্ণনায় যে বিষয় বুঝা যায় না, একটী মাত্র চিত্রে তাহা বিশদ হয়। এরূপ গুরুতর বিষয়ের সাঙ্গ পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল, সুতরাং ইহাতে ত্রুটী থাকা স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বে আমার জ্ঞানের অভাব এবং সুতরাং তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার অক্ষমতাই এই ত্রুটীর যে একটী প্রধান কারণ তাহা এই স্থলেই পাঠকবর্গের নিকট জানাইয়া রাখিতে আমার সঙ্কোচ নাই। আমি বিজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞ নহি, এই কারণে আমি ইচ্ছা করিলেও হয়তো অভিব্যক্তির সূক্ষ্ম দুরবগাহ তত্ত্ব সকল ব্যক্ত করিতে পারিতাম না এবং সে বিষয়ে চেষ্টাও করি নাই। অভিব্যক্তিবাদের মূল মন্ত্রগুলি যে সকল দৃষ্টান্তের সমর্থনে যে ভাবে আমার বুদ্ধিতে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল, আমিও সেই ভাবে মূল মন্ত্রগুলি বিবৃত করিতে প্রয়াস

পাইয়াছি। আজকাল বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গবাসীর কতকটা আগ্রহ দৃষ্ট হয়। আশা করি, বঙ্গের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান-মহারথীগণ অভিব্যক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বসকল বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিয়া বঙ্গবাসীর একটী মহান অভাব মোচন করিবেন।

গ্রন্থে দুএকটী নূতন মত সন্নিবিষ্ট করিয়া যথেষ্ট ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছি—যদি ইচ্ছা করেন, পাঠকগণকে সেগুলি উপেক্ষাদৃষ্টিতে দেখিবার অধিকার প্রদান করিলাম—বামনেরও সময়ে সময়ে আকাশস্থিত চন্দ্রে হস্ত প্রদানের লোভ জন্মিয়া থাকে। আমাদের দশাবতার যে সত্যসত্যই পৃথিবীর বিভিন্ন যুগ সূচনা করিয়া দেয়, তাহা প্রমাণ প্রয়োগে নির্ণয় করিতে যাওয়া ধৃষ্টতার সর্ব্ব প্রধান দৃষ্টান্ত—ইহাতে যাহা কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকিবে, তজ্জন্য আমি দায়ী—আমি কোন গ্রন্থ হইতে ইহা গ্রহণ করি নাই। মানবাত্মার অভিব্যক্তি বিষয়ক কথায় দুএকটী নূতন মত ব্যক্ত হইয়াছে, তজ্জন্যও আমিই দায়ী। তৃতীয়ত, জড়াভিহিত শক্তি হইতে আত্মার যে অভিব্যক্তি হইয়াছে, বিজ্ঞানের দিক দিয়া সেই তত্ত্বে বহু পূর্ব্বেই উপনীত হইয়াছিলাম, অবশেষে "জড় ও আত্মা" মূলক কথা লিখিবার কালে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার হইতে যথেষ্ট সমর্থন লাভ করিয়াছিলাম। অভিব্যক্তি যে প্রধানত সংহতিমূলক, বোধ হয় এই মত এত স্পষ্টরূপে অপর কাহারও কর্ত্তৃক বিবৃত হয় নাই। চতুর্থত, ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, নিরপেক্ষভাবে অভিব্যক্তির সহিত মৃত্যু ও পাপের সম্বন্ধ মূলে যাইয়া ধরিবার চেষ্টা ইতঃপূর্ব্বে কেহ করিয়াছেন কি না জানি না। মহাত্মা হক্সলি তাঁহার এক বক্তৃতায় এই বিষয়ে স্পর্শ মাত্র করিয়াছেন বলিতে পারি। এই ভূমিকা লিখিবার কালে জানিতে পারিলাম যে পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিদিবসের ঘটনা কোষ্ঠীর সহিত মিলিত। আরও দুএকটী ফলিত জ্যোতিষে অশ্রদ্ধাবান বন্ধুরও জীবনের ঘটনা কোষ্ঠীর সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে, তাঁহাদের স্বমুখে শুনিয়াছি।

উপসংহারে যে সকল বন্ধুবর্গের এবং গ্রন্থকারের নিকট উপকার পাইয়াছি, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এই ভূমিকা সমাপ্ত করি। জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিলাতপ্রত্যাগত অমায়িক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট অনেকগুলি দুর্বোধ্য তত্ত্ব সকল বুঝাইয়া লইয়াছি—তাঁহার সাহায্য না পাইলে গ্রন্থে কত গুরুতর ভ্রম যে থাকিয়া যাইত, পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে

কত যে বিলম্ব লাগিত তাহা বলিতে পারি না। বঙ্গের হক্‌সি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ও অনেক ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়া চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তাতোষ বসু চিত্র-প্রকাশে যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ডার্বিন, ওয়ালেস, ক্যাত্‌রফাগেস, গীকী, হক্‌সি, হেকেল, এডওয়ার্ড মরিস, এডওয়ার্ড ক্লড এবং বেইসম্যান প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থকারের নিকটে এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে সাহায্য পাইয়াছি, অধিক বলা বাহুল্য, তাঁহাদিগের নিকট চিরজীবন ঋণী রহিলাম।

এই গ্রন্থ যদি পাঠকবর্গের হৃদয়ে অভিব্যক্তিবাদ জানিবার ও অপরকে জানাইবার সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত করিতে পারে, তবেই পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

৬, দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি,
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
২৪শে আশ্বিন, ১৩০৯ সাল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুক্রমণিকা।

সপ্তম কথা—ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার।

অষ্টম কথা—মানবশরীরের অভিব্যক্তি।

নবম কথা—মানবাত্মার অভিব্যক্তি।

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ কথা—বামন অবধি কল্কীযুগ।

চতুর্দ্দশ কথা—জড় ও আত্মা।

পৃষ্ঠা

পঞ্চদশ কথা—অভিব্যক্তিবাদ ও মৃত্যু।

ষোড়শ কথা—অভিব্যক্তিবাদ ও পাপ।

পরিভাষা।

অভিব্যক্তিবাদ —Theory of evolution.

সৃষ্টিবাষ্প —Cosmic vapour.

স্বনলিপি—Phonograph.

উপপত্তি—Theory.

সমস্যা—Problem.

বিশেষসৃষ্টিবাদ—Theory of special creation.

গুণোত্তর বৃদ্ধি—Geometrical progression

পরিবৃত্তি—Variation.

যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন—Survival of the fittest.

জীবনসংগ্রাম—Struggle for existence.

জীবনসংগ্রামজনিত বা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন—Natural selection.

কাম্য নির্ব্বাচন—Sexual selection.

নিয়ম—Law.

জীবাদি বা প্রাণপঙ্ক—Protoplasm.

বর্ণবিভাগ—Variety.

শ্রেণী—Species.

জাতি—Genus.

বর্গ—Order.

যাদুঘর—Museum.

জ্বালামুখীর গর্ত্ত—Volcanic crater.

ধেপসো বা তগরে পোকা—Moth.

দ্বিকোণ পুষ্প—Bigonia.

বৃহৎ দ্বিকোণ—Double bigonia.

গ্লক্সিনিয়া—Gloxinia.

লক্কা—Fantails.

কড়িয়া—Barb.

গেরোবাজ—Tumbler.

লোটন—Ground Tumbler.

পেচক—Owl.

মানবের অভিব্যক্তি—Evolution of man.

নিগ্রোবটু—Negritto.

মধ্যবর্ত্তী—Intermediate.

সংযোগী শৃঙ্খল—Connecting link.

তারামাছ—Starfish.

বর্ণপুটিকা—Pigment cell.

ন্যুব্জ—Convex.

দর্শন—Lens.

পরিপার্শ্ব—Environment.

জীবশ্রেণীর মূল—Origin of Species.

অবরোহ—Descent.

অনুসৃত—Inherited or hereditary.

উষর—Barren.

প্রশীল—Fossil.

খটিকযুগ—Chalk age.

স্তাণ্ডার—Deposits.

কোণিক—Conical.

পর্ণী—Fern.

সমুদ্ধৃত—Restored.

উষস্তর—Eocene period,

মধ্যস্তর—Miocene.

অন্তস্তর—Pliocene.

অগ্রপদ—Foreleg.

পশ্চাৎপদ—Hindleg.

অগ্রবাহু—Forearm.

চর্ব্বক—Molar.

বর্ণবৈচিত্র্য—Variation of colour.

পত্রককীট—Leaf-insect.

গঙ্গাফড়িং বা দুর্ব্বাফড়িং—Grasshopper.

অহিপক্ষী—Snakebird.

অলস—Sloth.

প্রাণপ্রসার—Distribution of life.

আর্কেয়যুগ—Archæan age.

মৎস্যযুগ—Paleozoic or Primary Period.

শম্বুকযুগ—Cambrian age.

মোলস্ক—Mollusk.

কৃকলাস—Crustacea.

ত্রিবলি—Trilobite.

শম্বুক—Shells.

শিরঃপদী—Cephalopoda.

বাহুপদী—Brachiopoda.

পর্ণাস্তর—Upper silurian.

শল্ক—Scale.

অঙ্গারস্তর—Carboniferous stratum.

স্তর—Stratum.

মৎস্যস্তর—Permian stratum.

বরাহযুগ—Tertiary or Cainozoic.

কূর্ম্মযুগ—Sacondary or mesozoic period.

শৈবালস্তর—Lower silurian.

বগড়া—Cycad.

ত্রিস্তর—Triassic.

কোষপায়ী—Marsupial.

মৎস্যকূর্ম্ম—Ichthyosaurus.

লম্বগ্রীব কূর্ম্ম—Plesiosaurus.

উৎসর্প কূর্ম্ম—Pterodactyl.

বৃহৎ গোধা—Megalosaurus.

বৈহগকূর্ম্ম—Pterosaur.

স্থূলপদ গোধা—Brontosaurus.

বিহগনোদন—Iguanodon.

ঐরাবত—Mastodon.

বক্রদন্ত—Deinotherium.

নৃসিংহযুগ—Quatermary Period.

তুয়াতারা—Tuatara.

অন্তর্জাত—Indigenous.

বর্ম্মিল—Armadillo.

গণ্ডকোষী—Pouched.

মাছি ধরা—Flycatcher.

নরকপি—Ape-man or Man ape.

নেগ্রিল—Negrillo.

বিহৃত—Rudimentary.

বিহৃতি—Degeneration.

কপাটকল—Valve.

সমকোণ—Rectangular.

সমতল—Horizontal.

ধমনী—Artery.

পেশী—Muscle.

স্ফুটতা—Development.

ভ্রূণ—Embryo.

করোটী—Skull.

তরল অবস্থা—Tor diffused.

সামঞ্জস্য ফল—Resultant.

প্রব্রজনশীল—Migratory.

কালমুখ—Calmuk.

বিপক্ষিত—Chipped.

অগ্নিপ্রস্তর—Flint.

দক্ষিণাস্থ হস্তী—Elephas meridionalis

হিমশৈল—Glacier.

হেমন্তযুগ—Glacier age.

নৃসিংহমানব—Cromagnon.

বামন—Furfooz.

গুহাঋক্ষ—Cave bear.

বৃন্ত—Stem.

সাপি—Barb.

নেহাই—Hammer-stone.

সুকুমার শিল্প—Fine art.

ব্যোম—Ether.

সংহত—Compact.

ও তৎসৎ।

অভিব্যক্তিবাদ।

প্রথম কথা—অভিব্যক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

আজকাল পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মনুষ্য প্রভৃতি সকল প্রকার জীবজন্তুর উৎপত্তি লইয়া কত বাদানুবাদ চলিয়াছে। বুদ্‌বুদের ন্যায় কত উপপত্তি উঠিতেছে আর যাইতেছে। এই সকল উপপত্তির মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ চার্লস্ ডার্ব্বিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত অভিব্যক্তিবাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছে—সিদ্ধান্তকল্প করিয়া গৃহীত হইয়াছে।

অভিব্যক্তিবাদ কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বৃক্ষ বীজ হইতে প্রকাশিত হইল, ইহার নাম অভিব্যক্তি; ডিম্ব হইতে পক্ষী নির্গত হইল, ইহার নাম অভিব্যক্তি; বরফ হইতে জল হইল, জল হইতে ধূম হইল; ধূম হইতে জল হইল, জল হইতে বরফ হইল—এই সমস্তকে আমরা অভিব্যক্তি বলিতে পারি। যে তত্ত্ব এই অভিব্যক্তি প্রণালী বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রকাশ করিতে পারে তাহার নাম অভিব্যক্তিবাদ বলা যাইতে পারে। কিন্তু আজকাল অভিব্যক্তিবাদ একটী সঙ্কীর্ণ শব্দ হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ ভিন্ন শ্রেণীর জীবজন্তু হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি, দ্বিতীয়তঃ প্রাণপঙ্ক হইতে জীবজন্তুর উৎপত্তি এবং তৃতীয়তঃ জড় সৃষ্টিবাষ্প হইতে প্রাণের উৎপত্তি, এই তিনটী বিষয় আজকাল অভিব্যক্তিবাদের সীমার মধ্যে পতিত হয়।

ভারতের ঋষিরা স্বীয় অন্তরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কত মহান্ সত্য সকল আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহির্জগৎ পর্য্যালোচনা করিয়া ঈশ্বরের কত আশ্চর্য্য সত্য নিয়ম সকল আবিষ্কার করিয়া

জগতকে চমকিত করিয়া দিয়াছেন। জেমস্ ওয়াট্ বাষ্পশক্তির আবিষ্কার করিয়া জগতের কি উপকারই করিয়াছেন—দূরতম দেশসমূহকে অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করিবার উপায় করিয়াছেন। জর্ম্মানি দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কেপ্লার গ্রহগণের গতিনির্ণায়ক নিয়ম সকল আবিষ্কার করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যার কত না উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আমেরিকাবাসী এডিসন সাহেব স্বনলিপি (Phonograph) যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া কি আশ্চর্য্য কাণ্ডই সংসাধিত করিয়াছেন! পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেককে যেমন পদার্থ-বিদ্যা বিভাগে দেখিলাম, সেইরূপ আবার লামার্ক, ডার্বিন, ওয়ালেস্ প্রভৃতি অনেককে জীবতত্ত্ববিভাগে শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই। জীবগণের, বিশেষতঃ মনুষ্যের, উৎপত্তি কি প্রকারে হইল, এই বিষয়টী বর্ত্তমানকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধি-কাংশ প্রাচীন ও পুরাতন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে ঈশ্বর প্রত্যেক জাতীয় জীবের আদিপুরুষকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নব্য প্রাণিবেত্তাগণ বলেন যে ইহা বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিপ্রকরণ নহে। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি-প্রকরণ বহুকে একেতে লইয়া যাইবে এবং সেই বহুকে একেতে লইয়া যাইবার মধ্যে শৃঙ্খলা প্রদর্শন করিবে। তাই নব্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, কুকুরই বল, বানরই বল, আর মনুষ্যই বল, যত প্রকার জীবজন্তু দেখিতেছি, ইহারা সকলেই প্রথমে একই আদি প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রমে ঘটনাবশতঃ বা অবস্থা-বৈগুণ্যে, সেই আদি প্রাণের কতকগুলি বংশধর কুকুরে আসিয়া পৌছিয়াছে, কতকগুলি বা বানরে আসিয়াছে, আবার কতকগুলি বা মনুষ্যে আসিয়াও পৌছিয়াছে। এই উপপত্তির (Theory) আভাস যদিও কয়েকজন প্রাণিতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিত প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ওয়ালেস্ ও ডার্ব্বিন স্বীয় অপরিমেয় অধ্যবসায়-ফলে এই উপপত্তিকে অনেক পরিমাণে সপ্রমাণ করিয়া প্রাণিবেত্তা-দিগের শিরোভূষণ হইয়া পড়িয়াছেন। ডার্ব্বিনের নাম এবং তাঁহার পরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত অভিব্যক্তিবাদ (Theory of Evolution) পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বিশেষতঃ জর্ম্মনি প্রদেশে আজকাল নিতান্তই "ঘরের কথা" হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কয়েকজন প্রাণিবেত্তা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিবাদের পূর্ব্বাভাস দিয়াছিলেন। এখন কাহাদের নিকট এই পূর্ব্বাভাস পাওয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি প্রাণিবেত্তা লামার্ক খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে (১৮০১ খৃঃ অঃ) এই সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত এই যে, প্রত্যেক জাতীয় জীবজন্তু অপর কোন জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে অঙ্গের ব্যবহার করা যায় সেই অঙ্গ পরিপুষ্ট ও দৃঢ় হয় এবং অব্যবহৃত অঙ্গ ক্রমে শক্তিহীন ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, এই একটী সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম আছে। লামার্ক বলেন যে এই নিয়মের বলেই জীবজন্তু আহারের চেষ্টা, অবস্থাবৈগুণ্য প্রভৃতি নানা ঘটনা বশতঃ নিজেদের উন্নতি কল্পে কার্য্য করিতে করিতে এক জাতি হইতে অপর জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি প্রথম প্রচার করিয়াছেন যে অচেতন পদার্থের ন্যায় চেতন পদার্থেও পরিবর্ত্তন আকাশ হইতে পড়ে না, কিন্তু তাহা নিয়মের ফল; এই সত্যের প্রথম প্রচার বিজ্ঞানজগতে লামার্কের নাম চিরস্মরণীয় রাখিবে। উন্নতিকল্পে কার্য্য করিতে করিতে যদি প্রত্যেক জাতীয় জীবজন্তু উন্নত আকার ধারণ করিয়া অপর জাতিতেই পরিণত হয়, তবে এখনও সেই মূলজাতি জন্মে কিরূপে, এই একটী প্রশ্ন আসে। দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছি। বিড়াল জাতি উন্নত হইয়া ব্যাঘ্র হইল; কিন্তু এখনও তবে বিড়াল জন্মগ্রহণ করে কেন? মূলজাতির জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে লামার্ক তেমন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। যাই হোক্, লামার্কের যুক্তিপ্রমাণসমূহ তখনকার বৈজ্ঞানিকদিগের বধির কর্ণে প্রবেশ করিতে পারিল না। তাঁহারা সাধারণতঃ বিভিন্ন জাতির উৎপত্তিকে অপ্রমাণিত অথবা অসম্ভব সম্পাদ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপি দুই একজন করিয়া অসম্পূর্ণ প্রমাণাদির কারণে জীবতত্ত্বে অভিব্যক্তিবাদ অসম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে লাগিলেন। লামার্কের পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত অন্য কাহারও এতদ্বিষয়ক পুস্তকাদি ততদূর মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। তাহার কারণ, জিয়ফ্রে সেণ্ট হিলেয়র, ডীন হার্বার্ট, অধ্যাপক গ্রাণ্ট, ভনবুক প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ হইলেও এবং তাঁহারা কতক অংশে অভিব্যক্তিবাদ সমর্থন করিলেও, কি নিয়মে যে

জীবদেহের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রায় নীরব ছিলেন। অবশেষে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে "ভেস্‌টিজেস্ অফ্ ক্রিয়েষণ" (সৃষ্টিপরিচয়) নামক একখানি গ্রন্থ রচয়িতার নামবিরহিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এখন তাহা রবার্ট চেম্বার্স কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। সেই সময় এই পুস্তকখানির অত্যন্ত প্রচার হইয়াছিল। ইহাতেও বিশেষভাবে কিছুই উল্লিখিত হয় নাই যে কেমন করিয়া প্রত্যেক জাতি উন্নত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণভাবে বলা আছে যে কতকগুলি অজ্ঞাত নিয়মে ও অবস্থাচক্রে জীবজন্তু ও উদ্ভিদ্ সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই পুস্তকের বহুল প্রচারে সাধারণের মন হইতে অনেক কুসংস্কার দূর হইয়াছিল এবং তাহাদের মনোযোগ অভিব্যক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট হওয়াতে এই মত উত্তরকালে গৃহীত হইবার পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছিল।

ডার্বিন ও ওয়ালেসের পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদিগের অধিকাংশেরই এই মত ছিল যে প্রত্যেক জাতীয় প্রত্যেক জীবজন্তু ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়াছে। বিড়াল যতগুলি আছে, তাহাদের প্রত্যেকটী কোন্ নিয়মে সৃষ্ট হয় নাই, ঈশ্বর স্ব-ইচ্ছাক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাদের আর পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। কোন বিড়াল যে ধূসর তাহাও ঈশ্বর স্বহস্তে অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে রচনা করিয়াছেন; কোন বিড়াল যে শ্বেত, তাহাও ঈশ্বর স্বহস্তেই রচনা করিয়াছেন। এইরূপ মতকে আমরা বিসৃষ্টিবাদ (Theory of special creation) * বলিব। ডার্বিন এবং ওয়ালেসের সম্মুখে দুইটী বিষয় ছিল—এক, বিসৃষ্টিবাদ ঠিক নহে প্রমাণ করা; দ্বিতীয়, জীবজন্তুর অভিব্যক্তিই বা কি বিশেষ বিশেষ নিয়মে হইয়াছে তাহার আবিষ্কার করা। ইহাঁরা এই বিষয়ে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে মনে হয় যেন অভিব্যক্তিবাদ সপ্রমাণ করিতেই ইহাঁদের জন্মগ্রহণ। ডার্বিন এবং ওয়ালেস উভয়ে প্রায় একই সময়ে পৃথক্‌ভাবে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। অভিব্যক্তিবাদের প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তা বলিতে গেলে উভয়কেই বলিতে হয়। ইহাঁদের অনুসন্ধানের ফলে, সকল প্রকার জীবজন্তু যে পরস্পর হইতে এবং দূরত ও মূলত যে এক আদি জীব

* বিসৃষ্টি=বি+সৃষ্টি=বিশেষ বা ব্যষ্টি ভাবে সৃষ্টি এই কারণে প্রত্যেক পদার্থকে পৃথক্‌ভাবে সৃষ্টি করাকে আমরা বিসৃষ্টি বলিলাম।

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আর কেহ বড় অস্বীকার করিতে পারেন না। এখন, সংক্ষেপে ডার্বিনের অভিব্যক্তিবাদ কি তাহা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি। অভিব্যক্তিবাদ দুইটী প্রধান নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত—(১) জন্তুদিগের গুণোত্তর পরিমাণে (Geometrical Progression) * বৃদ্ধি; (২) সন্ততিগণ পিতামাতার অনেকটা অনুরূপ হইলেও কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইয়া যায়, কখনই একেবারে সমান হয় না। প্রথম নিয়মের ফলে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বংশ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনসংগ্রামও উপস্থিত হইবে। ধাড়ী জন্তু দুইটী মাত্র, মর্দা ও মাদী; কিন্তু তাহাদের ছানা সংখ্যায় ধাড়ীদের চেয়ে অনেক বেশী হয়। এইরূপ হইলেও পৃথিবীতে মোটের উপর জীবজন্তুর সংখ্যা যাহা আছে তদপেক্ষা অধিকতর হইতে পারে না—কারণ আহার সংকুলন চাই, স্থান সংকুলন চাই। জীবজন্তু বেশী হইতেছে বলিয়া পৃথিবীর স্থানও বাড়িতেছে না, উৎপাদিকাশক্তিও বৃদ্ধি হইতেছে না। মানবের চেষ্টা প্রভৃতিতে উৎপাদিকাশক্তি যেটুকু বাড়িতেছে, জীববৃদ্ধির তুলনায় তাহা অতি সামান্য বলিয়া নধর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। এই জীবনসংগ্রাম বশত গড়ে প্রতি বৎসর যত জীব জন্মগ্রহণ করে তত জীব প্রাণত্যাগ করে বা নিহত হয়। যে আহার দুইটী প্রাণীর ছিল, এখন দশ প্রাণী হওয়াতে তন্মধ্যে যে সক্ষম, সেই অপর প্রাণীগুলির আহার আপনি খাইয়া তাহাদিগকে উপবাসে রাখিল। ইহার উপর শীতগ্রীষ্ম, ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, অগ্নি বন্যা প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক উপদ্রব আছে। এইপ্রকারে জীবগণের মধ্যে কে বাঁচিবে, এই এক কঠোর জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। এই কঠোর জীবনসংগ্রামে প্রতি পাঁচটায় একটা, বা প্রতি দশটায় একটা এবং অনেক সময়ে প্রতি একশতে, এমন কি, এক সহস্রেও একটী মাত্র বাঁচিয়া যায়।

হাজার করা একটা কি দুইটা কীট-পতঙ্গ বাঁচিল ইহাতে সাধারণ মানবের চক্ষে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহার কারণানুসন্ধানে ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। তাঁহারা কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন যে জাত জীবদিগের কতকগুলি অপরাপেক্ষা বলবান্, কতকগুলি

* ২, ৪, ৮, ১৬, এইরূপ সাধারণ সংখ্যা দ্বারা গুণিত বৃদ্ধিকে গুণোত্তর বৃদ্ধি বলে। ৩, ৯, ২৭ অথবা ১, ৪, ১৬, ৬৪, ইত্যাদি অঙ্ককে গুণোত্তর অঙ্ক বলা যায়।

বা বেগবান্, কতকগুলি বা শ্রমসহিষ্ণু, কতকগুলি বা বুদ্ধিমান্। তাঁহারা দেখিলেন যে যে গুলি যোগ্যতম, সেই গুলিই বাঁচিয়া যায়, অন্যগুলি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে ও মরিয়া যায়। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে কর কোন ক্ষেত্রে ধান্য চারা রোপণ করা হইয়াছে। স্থানগুণে কতকগুলি সতেজ হইয়া অপরগুলি অপেক্ষা সমুন্নত হইয়া উঠিল। এখন যদি সহসা বন্যা আসিয়া সমুদয় ডুবাইতে চেষ্টা করে কিন্তু সতেজ ধান্যচারায় নাগাল না পায়, তবে অপরগুলি জলে ডুবিয়া পচিয়া গেল কিন্তু সেই সতেজ চারাগুলি উপযুক্ত জল পাইয়া আরও সতেজ হইয়া উঠিল। অবস্থার অন্যান্য বিভিন্নতার উপরেও জীবগণের জীবনমরণ নির্ভর করে। এই সকল হইতে আমরা জগতে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এই নিয়মেরই প্রাধান্য উপলব্ধি করি। অভিব্যক্তিবাদের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

অভিব্যক্তিবাদের দ্বিতীয় মূল ভিত্তি পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাকে পরিবৃত্তি প্রণালী বলিতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ছানাগুলি ঠিক বাপ মায়ের মত হয় না, কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হয়—কেবল আকৃতিতে নহে, গুণেও বটে। সুতরাং যদি ছানাদের মধ্যে যোগ্যতমগুলিই বাঁচিয়া গেল, তখন তাহাদের পরস্পরের সম্মিলনে আবার যে ছানা হইবে, পূর্ব্বের যোগ্যতম জীবগণ যে বিশেষ বিশেষ গুণবশতঃ যোগ্যতম হইয়াছিল সেই সকল গুণ তাহাদের ছানাদের মধ্যে আসিবার অধিক সম্ভাবনা—তবে সেই সম্ভাবনা কতকগুলি নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ। অভিব্যক্তিবাদিগণ বলেন এইরূপে যোগ্যতম হইবার আকৃতি প্রকৃতি লাভ করিতে করিতে আদিজীবের বংশধরগণ ক্রমিক উন্নতিলাভ করিয়া মনুষ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখনও যাহারা নিম্ন শ্রেণীতে আছে, তাহারাও কালে মনুষ্য হইবে এবং মানববংশধরগণ কালে দেবশরীর ও দেবপ্রকৃতি লাভ করিয়া ঈশ্বরের অসীম মহিমা অধিকতর ঘোষণা করিতে থাকিবে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায় অভিব্যক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মূলক প্রথম কথা সমাপ্ত।
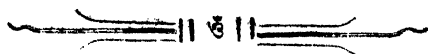
দ্বিতীয় কথা—জীবনসংগ্রাম।

সুপ্রশস্ত মাঠে বিহগগণ সুখে বিচরণ করিতেছে; আপনাপন আহার অন্বেষণ করিতেছে; আপনাদের শাবকগণের জন্যও বা কিছু লইয়া যাইতেছে; সুন্দর গান করিতেছে; আর আমরা ইহাদিগকে এমন সুখে থাকিতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি। এই চিত্র দেখিয়া কবিজনের কবিতার উৎস খুলিয়া যাইবে তাহা আর বিচিত্র কি—পাষাণেরও হৃদয়ে কবিতাস্রোত প্রবাহিত না হইয়া যায় না। দার্শনিক ইহার মধ্যে কত না দর্শনতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু জীবতত্ত্ববিৎ দেখিতে দেখিতে শান্তির রাজ্য হইতে অশান্তির রাজ্যে গিয়া পড়েন। তিনি অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিয়াছেন যে এক অতি কঠোর নিয়ম এই জীবনক্ষেত্রে কার্য্যকরিয়াই এই শান্তি আনয়ন করিয়াছে; সেই কঠোর নিয়ম—কঠোর জীবনসংগ্রাম।

জীবনসংগ্রাম কাহাকে বলে, তাহা আজকাল কাহাকেও বেশী করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। যেরূপ দিনক্ষণ পড়িয়াছে, তাহাতে জীবনসংগ্রামের তীব্র তাড়নায় সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনসংগ্রামের একটী প্রধান লক্ষণ অন্নচিন্তা। শতবর্ষ পূর্ব্বে, এমন কি পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বেও আমাদের সোনার ভারতে এতদূর অন্নচিন্তা ছিল না, এতদূর তীব্র জীবনসংগ্রামের হস্তে পড়িতে হয় নাই। আমি পূজ্যপাদ পিতামহদেবের নিকট শুনিয়াছি যে, এখন যে চাউল ৬৲ টাকায় একমণ, তখন সেই চাউল ১৲ এক টাকায় মণ পাওয়া যাইত; তখন গোদুগ্ধ টাকায় ৬৪ সের পাওয়া যাইত, এখন তাহা টাকায় সাড়ে ছয় সের মাত্র পাওয়া যায়—তাহাও সকল সময়ে খাঁটি পাওয়া যায় না। আমরা ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে দেখিয়াছি যে, পল্লীগ্রামেও দুগ্ধ টাকায় ৩২ সের হইতে এখন সাড়ে ছয় সের দাঁড়াইয়াছে। ঘৃত পূর্ব্বে টাকায় ১৬ সের পাওয়া যাইত, এখন এক সের, পাঁচ পোয়া পাওয়া যায়। ভারতবাসীর মধ্যে কিরূপ জীবনসংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্য এই দৃষ্টান্ত কয়েকটী উল্লেখ করিলাম।

ইহার ফল অতি দূরব্যাপী। মনে কর, আমার দুগ্ধের উপর জীবন নির্ভর করে এবং ধরিয়া লও যে আমি অতি প্রতিভাশালী ব্যক্তি। এখন, দুগ্ধ যদি উপযুক্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হই, তবেই আমার প্রতিভা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে। সেই প্রতিভার বলে হয়তো কত অলস ব্যক্তিকে পরিশ্রমের পথে ফিরাইতে পারিতাম; কত কুলোককে ধর্ম্মের পথে ফিরাইতে পারিতাম। কিন্তু অর্থাভাবেই হউক বা দুগ্ধাভাবেই হউক, যদি দুগ্ধ উপযুক্ত পরিমাণে প্রাপ্ত না হই, তবে আমার প্রতিভা উপযুক্তরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে না। হয়ত সেই অস্ফুট প্রতিভার বলে কাহাকেও আমার অভিলষিত পথে ফিরাইতে পারিলাম না। সুতরাং আমার প্রতিভাবলে জনসাধারণকে সুপথে ফিরাইয়া জগতের যে উপকার সাধন করিতে ও করাইতে পারিতাম, তাহা পারিলাম না। অতএব, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে জগতের প্রতি ঘটনার ফল অতি দূরব্যাপী।

মনুষ্যের মধ্যে জীবনসংগ্রাম ঘোরতরই চলিয়াছে তথাপি মনুষ্য অনেক সময়ে জীবনরক্ষণ কার্য্যেও স্ব-ইচ্ছায় নিযুক্ত হয়। একটা কর্ম্মের আমি প্রার্থী, আর একটী লোকও প্রার্থী। আমি দেখিলাম যে আমা অপেক্ষা সেই ব্যক্তি অধিকতর অভাবগ্রস্ত। এই অবস্থায় আমি তাহা পরিত্যাগ করিলাম। বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রমাত্রেই অবগত আছে যে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সহচর সৈনিক পুরুষের পিপাসা অধিকতর জানিতে পারিয়া সেই একই ক্ষেত্রে আহত বীর সেনাপতি আপনার মুখের জল তুলিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু উদ্ভিদ্ পশুপক্ষী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণীগণ এরূপ কর্ত্তব্য বোধে আপনাদিগেরই শাবকাদি ব্যতীত এবং আত্মরক্ষার্থ ব্যতীত অপর কাহারও জীবনরক্ষণে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয় না। এই কারণে কঠোর জীবনসংগ্রাম তাহাদিগের মধ্যে অত্যন্ত কঠোরভাবেই কার্য্য করিতেছে। কেহ কাহারও প্রতি সদয় দৃষ্টিনিক্ষেপ করে না অথবা করিলেও আমাদের বিশেষ বোধগম্য হয় না।

ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে অতি সুন্দর বাগান যদি কিছুদিন অযত্নরক্ষিত হয়, তবে সেই কিছুদিনের মধ্যেই তেমন বাগানেরও শ্রী নষ্ট হইয়া যায় এবং বাগানের সুগন্ধি পুষ্প ও সরস ফলবৃক্ষের নিকটে কতকগুলি আগাছা জন্ম গ্রহণ করে এবং ফলপুষ্পের বৃক্ষসকল শীঘ্রই মরিয়া যায়। ইহার মধ্যে জীবনসংগ্রাম এইরূপে কার্য্য করিতেছে—যতটা মাটীর রস পূর্ব্বে ফলপুষ্পের

বৃক্ষটী নিতে পাইতেছিল, এখন কতকগুলি আগাছাও তাহাদের সেই রসের ভাগী হইয়া পড়িল। সুতরাং রসের ভাগ মোটের উপর প্রত্যেকের ভাগ্যে কিছু কম করিয়া পড়িতে লাগিল। এই অবস্থায় ফলপুষ্পের সযত্নলালিত সৌখীন বৃক্ষগুলি উপযুক্ত আহার না পাইয়া দুর্ভিক্ষের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে কষ্টসহ আগাছাগুলি সত্বর বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। আবার সেই আগাছাগুলির আশেপাশে অপর আগাছা জন্মাইতে লাগিল। তখন পূর্ব্বজাত আগাছা নূতন দুর্ভিক্ষে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে লাগিল এবং অধিকতর কষ্টসহ ও সৌভাগ্যবান্ নবজাত আগাছাগুলি সতেজে বাড়িতে লাগিল। অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে একই স্থানে প্রথমজাত তৃণাদিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া তাহার স্থানে কত বিভিন্ন তৃণাদি জন্মগ্রহণ করে।

আমাদের দেশের একটী সামান্য দৃষ্টান্ত ধরা যাউক। একটা ক্ষেত্রে দুর্ব্বাঘাস বসাইয়া দাও এবং তাহারই নিকট কতক মুতাঘাসও বসাইয়া দাও। বৎসর দুই তিনের মধ্যেই দেখা যাইবে যে দুর্ব্বাঘাসের পরিবর্ত্তে মুতাঘাস বিস্তৃত হইয়া সমস্ত ক্ষেত্রটীকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। জীবনসংগ্রামের এই অতি সহজ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন হেতু মনে হইতে পারে যে এইরূপ আবির্ভাব তিরোভাবের কারণ অতি সহজেই স্থিরীকৃত হইতে পারে; কিন্তু ইহা যতটা সহজ মনে হয়, ততটা সহজ নহে। এমন হয় যে, একস্থানের সকল উদ্ভিজ্জই হয়তো সমান কষ্টসহ, তথাপি একটীর ধ্বংসগতি হইতেছে, অপরটীর বৃদ্ধি হইতেছে; একটীর ধ্বংস হইতেছে, আর একটী তেজে বাড়িতেছে। এইরূপে সেই স্থানে শতাব্দী পরে হয়তো প্রথম উদ্ভিজ্জের কিছুমাত্রও অবশিষ্ট দেখিতে পাইব না।

পূর্ব্বে যে সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম, তাহাতে উদ্ভিজ্জ দ্বারাই উদ্ভিজ্জ ধ্বংসের কথা বলিয়াছি। কিন্তু উদ্ভিজ্জপ্রাণ পশুপ্রাণ দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বিনষ্ট হয়। বীজকালে ও অঙ্কুরোৎপত্তিকালেই অধিকাংশস্থলে এই ধ্বংসসাধন হয়। ছোলা প্রভৃতি দ্বিদল ক্ষেত্রে রোপণ কর; যদি বাহিরে বাহিরে ছড়াইয়া দাও, তবে মুহূর্ত্তকালেরও বিলম্ব হইবে না, পশুপক্ষীরা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সমুদয় শেষ করিয়া দিবে। আর যদি মাটীর ভিতরে পুঁতিয়া দাও, তবে কীট পতঙ্গ তাহা নষ্ট করিবে। তাহার মধ্যে লুকাইয়া চুরাইয়া যদি

কোনটা বাঁচিয়া গেল তবে তাহাই বর্দ্ধিত হইল। একবার জীবতত্ত্ববিৎশ্রেষ্ঠ ডার্ব্বিন একটা ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের প্রত্যেক তৃণ গণিয়া ৩৫৭ সংখ্যা পাইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল, ২৯৫ সংখ্যা কীট পতঙ্গাদির দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ডার্ব্বিন স্কটলণ্ডের উত্তরাংশে গিয়া কোন স্থানের এক অংশ তৃণলেশহীন, অপরাংশ বৃক্ষসমন্বিত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে গবাদি পশু অনাবদ্ধ স্থানের তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া তথায় তৃণ জন্মাইতে দেয় না এবং সেই কারণে তথাকার উর্ব্বরাশক্তিও ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে বিনষ্ট হইয়াছে এবং অপর অংশ আবদ্ধ থাকাতে গবাদি পশুর অগোচর হইয়া যথাযুক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশের উর্ব্বরা শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপে উদ্ভিজ্জপ্রাণ ও পশুপ্রাণের মধ্যে জীবনসংগ্রাম চলিতে থাকে।

প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীদিগের স্বজাতির মধ্যেই জীবনসংগ্রাম কিছু কঠোর-তর হইয়া পড়ে। ইউরোপে কৃষ্ণ ইন্দুরই পূর্ব্বে সাধারণতঃ দেখা যাইত কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আশিয়া হইতে বৃহৎ ধূসর ইন্দুর ইউরোপে অগ্রসর হইয়া তাহার আদিম নিবাসী কৃষ্ণ ইন্দুরকে তাড়াইতে আরম্ভ করিল। এখন কৃষ্ণ ইন্দুর ইউরোপে পাওয়া দুর্ঘট। এই ধূসর শ্রেণীর ইন্দুর এখন বাণিজ্য ব্যবসায় সূত্রে জাহাজাদির দ্বারা পৃথিবীস্থ প্রায় সকল দেশেই নীত হইয়াছে এবং নিউজীলণ্ড প্রদেশে গিয়া তথাকার আদিম নিবাসী একজাতীয় ইন্দুরকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াতে মধুমক্ষিকার প্রতাপে তদ্দেশীয় সাধারণ মক্ষিকা অন্তর্হিত হইতেছে।

স্বজাতির মধ্যে জীবনসংগ্রাম এরূপ কঠোরতর হইবার পক্ষে কারণ এই যে, সকলেরই অবস্থা প্রায়ই এক, সকলে প্রায় একই প্রকার কষ্টসহিষ্ণু; সকলের অভাব, সকলের আহারাদি প্রায় একই; সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে উন্নতি অবনতি একটু আধটু সুবিধা অসুবিধার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। অনেক সময়ে রীতিমত সংগ্রাম হইয়া একই জাতীয় জীবের দুর্ব্বলশ্রেণী সবল শ্রেণী কর্তৃক নিহত হয়। অনেক সময়ে এমনও হয় যে, সজাতীয় জীবের এক শ্রেণী শারীরিক দুর্ব্বল হইলেও অবস্থাবিশেষে নানা সুবিধা পাওয়াতে, এক কথায়, সেই অবস্থায় যোগ্যতম হওয়াতে অপর শ্রেণী শারীরিক সবল হইলেও

নানা উপায়ে তাহার ধ্বংস সাধন করে। একক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর ধান্য রোপণ কর; সেই স্থানের ও অবস্থার উপযুক্ত যে ধান্য হইবে, তাহারাই অপরকে ধ্বংস করিয়া বর্দ্ধিত হইবে। এই কারণে তৃণাচ্ছাদিত সুন্দর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিলে এক জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর তৃণ রোপণ না করিয়া বিভিন্ন জাতীয় তৃণ রোপণ করা কর্ত্তব্য।

এখন দেখা যাউক যে এই জীবনসংগ্রামের মূল কারণ কি? সকলেই সুখে শান্তিতে থাকিবে, তাহার পরিবর্ত্তে এই কঠোর জীবনসংগ্রাম আসিল কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জীবগণের গুণোত্তর পরিমাণে বংশ বৃদ্ধি হওয়া একটী প্রধান কারণ। একটী মাঠে দুইটী গরু ছাড়িয়া দিলে তাহারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের যখন বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন সেই একই মাঠের তৃণাদিতে তাহাদের সকলের কি প্রকারে চলিতে পারে? আমাদের ভারতের বর্ত্তমান একান্নবর্ত্তী পরিবারের দৃষ্টান্ত হইতেও ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। এক গোষ্ঠীপতি কর্ত্তা লক্ষ টাকার বিষয় করিলেন। তাঁহার দশ বারটী সন্তান। আবার তাঁহাদের গড়ে প্রত্যেকের দুইটী করিয়া সন্তান ধরিলেও কর্ত্তার ২০।২৪টী পৌত্র দৌহিত্র হইয়া পড়ে। সুতরাং এইরূপে বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিলে প্রথম কর্ত্তা লক্ষ টাকার বিষয়ে যেরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়াছিলেন, তাঁহার নাতিপুতিদিগের ঠিক সেইরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিবার আশা করা বিড়ম্বনা। তবে যদি সেই পরিবারে ধর্ম্ম থাকে, মনুষ্যের যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব যদি তাহা থাকে, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, সবল ভ্রাতা দুর্ব্বল ভ্রাতার জীবন রক্ষণে অগ্রসর হয়। নচেৎ সেই পরিবার জীবনসংগ্রামের ভীষণ ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং তথা হইতে শ্রীসৌন্দর্য্য শীঘ্রই দূরে প্রস্থান করে—সেই একই পরিবারের কোন গৃহে হয়তো অন্নসংস্থান নাই, অপর গৃহে মদ্যমাংস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ভক্ষিত হইতেছে, বিক্ষিপ্ত হইতেছে, কোন গৃহে হয়তো বস্ত্রসংস্থান নাই, অপর গৃহে হয়তো আতর গোলাপ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া দরিদ্র ভ্রাতার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত করিতেছে। ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মূল মন্ত্র এই যে কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম। সুতরাং কর্ত্তা স্বার্থপর হইলে, নির্ম্মম হইলে, সমস্ত পরিবারের প্রতি মৌখিক কল্যাণকামনা করিলেও, সেই পরিবারের কখনই কল্যাণ হইতে পারে না।

ইহা দেখা গিয়াছে যে জীব যত অধিক নিম্ন জাতীয় হইবে, তত অধিক পরিমাণে সন্তানপ্রসবশীল হয়। একটী মাত্র মাংসভুক মক্ষিকা কুড়ি হাজার ডিম্ব প্রসব করে এবং সেই সকল ডিম্ব এত শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় যে পাঁচ দিনের মধ্যে তাহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহা দেখিয়া বিখ্যাত সুইডীয় প্রাণিতত্ত্ববেত্তা লিনীয়স্ বলেন যে, একটী মৃত ঘোটককে তিনটী মাংসভুক মক্ষিকা সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় শীঘ্র খাইয়া ফেলিতে পারে। যদি ধরা যায় যে, গ্রীষ্মের তিন মাস মাত্র ইহারা সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে গ্রীষ্মারম্ভে প্রতি মক্ষিকা হইতে কোটী মক্ষিকা উৎপন্ন হইতে পারে। কেবল এক শ্রেণীর মক্ষিকার কথা বলিলাম; এমন কত শ্রেণীর মক্ষিকা আছে। সকলেই যদি অবাধে নিয়মিত সন্তান উৎপন্ন করিতে পারিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে অন্যান্য জীব-জন্তু থাকা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। এই ভয়াবহ বংশবৃদ্ধি নিবারণের জন্য কীটভুক্ পশুপক্ষী দ্বারা এবং নানা প্রাকৃতিক অবস্থাবৈগুণ্যে তাহাদের বিনাশ সাধন হইতেছে।

আমাদের চড়াই পক্ষী গড়ে প্রতি বৎসরে অন্ততঃ দশটা ডিম্ব প্রসব করে। আর যদি ধরা যায় যে তাহারা অন্ততঃ দশ বৎসর সন্তান প্রসবক্ষম থাকে, তবে এক জোড়া চড়াই সেই দশ বৎসর অবাধে সন্তান প্রসব করিলে দুই কোটীর উপরে চড়াই পক্ষী উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু আমরা প্রতি বৎসরেই প্রায় সমান সংখ্যক পক্ষীই দেখিতে পাই। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে অল্প সংখ্যক জীবিত থাকে, অধিক সংখ্যক বিনষ্ট হয়।

ভাল অবস্থায় যে কিরূপ বংশবৃদ্ধি হয়, তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। আমেরিকা প্রথম আবিষ্কারের সময় তথায় গবাদি দেখা যায় নাই। কলম্বস্ তাঁহার দ্বিতীয় যাত্রাকালে সেণ্ট ডমিঙ্গো দ্বীপে কয়েকটী গরু ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখন গবাদি স্বভাবত বৎসরে একটী মাত্র সন্তান প্রসবশীল হইলেও সেণ্ট ডমিঙ্গোর সেই কয়েকটী পশুর এতদূর বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, উক্ত ঘটনার ২৭ বৎসর পরে ঐ দ্বীপে ৪০০০।৮০০০ করিয়া গরু এক একটী দলে দেখা গিয়াছিল। এই দ্বীপ হইতে মেক্সিকো প্রভৃতি আমেরিকার অন্যান্য প্রদেশে গবাদি নীত হইয়াছিল। তথায়ও তাহাদিগের অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল। মেক্সিকো জয়ের ৬৫ বৎসর পরে, ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে স্পেনবাসীগণ মেক্সিকো হইতে ৬৪০০০

সহস্রেরও অধিক এবং সেণ্ট ডমিঙ্গো হইতে ৩৫০০০ সহস্রেরও অধিক চর্ম্ম রপ্তানি করিয়াছিল। বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর শেষভাগে 'বুয়েনস আয়েরস' এর নিকটস্থ সুবিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে এক কোটী কুড়ি লক্ষ গরু এবং ৩০ লক্ষ ঘোড়া দেখা গিয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় গর্দ্দভ আমদানি করিবার পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহাদের এতদুর বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কোন স্পেনীয় পর্য্যটক গর্দভের দ্বারা উত্যক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। জীবজন্তুর গুণোত্তরবৃদ্ধি বিষয়ে যাহা বলিলাম, উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধেও সেই কথা। গাঁদাফুলের গাছ একটা রোপণ কর, এক বৎসরের মধ্যেই একটা ঝোঁপ হইয়া উঠিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মুস্তাঘাস কিরূপ ত্বরিত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রায় সকল উদ্ভিদ্ই বিশেষ বাধা প্রাপ্ত না হইলে গুণোত্তর পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। বঙ্গদেশের প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন যে, শেয়াল কাঁটার গাছ একটা থাকিলে কিছুদিনের মধ্যে কিরূপ ছড়াইয়া পড়ে। এই শেয়াল কাঁটাও আবার, অধিক কাল নহে, আমেরিকা হইতে কোন সূত্রে এদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু এখন তাহা যেন এদেশীয় গাছ হইয়া গিয়াছে। এই অতি উপকারী পেঁপে গাছ এখন এদেশীয় হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা অন্য স্থান হইতে এদেশে উপনিবেশ করিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে উদ্ভিদ্জাতিও স্থান বিশেষে নীত হইয়া কত সত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এখন জীবনসংগ্রামের ফলাফলের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পৃথিবীর উপরে জীবনসংগ্রামের ফল দুই প্রকার দৃষ্ট হইতে পারে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। এক স্থানে শাল বৃক্ষ রোপণ করিলাম, কয়েক বৎসর পরে শাল বৃক্ষের ছোট ছোট চারা হইয়া বনরূপে পরিণত হইতে চলিল। এই চারাগুলির পাতাসকল পচিয়া রোগ বিস্তার করিতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া সমস্ত চারাগুলি কাটিয়া দিলাম। চারাগুলি কাটা গেল, আমি রোগের সম্ভাবনা হইতে অনেকটা মুক্ত হইলাম; ইহাতে জীবনসংগ্রামের প্রত্যক্ষ ফলের একটী পরিচয় পাইলাম। দক্ষিণ আমেরিকার পম্পা নামক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে এই প্রত্যক্ষ ফলের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। প্রান্তরটী অধিকাংশ স্থানে লম্বা লম্বা ঘাসে আচ্ছাদিত। তথায় বড় বড় গাছ হইতে পারে না। তাহার প্রধান কারণ এই জীবনসংগ্রাম। গ্রীষ্মকালে তথায় নদনদীর অভাবে

জলের অত্যন্ত অভাব হয়। জলের অভাবে উদ্ভিদের অভাব হওয়াতে জীব-জন্তুর, প্রধানত বন্য গো, মেষ, ঘোটকাদির আহারের বড়ই ক্লেশ উপস্থিত হয়। তাহারা কেবলমাত্র বাঁচিবার চেষ্টায় তৃণগুল্মেরও চিহ্ন রাখে না। অগত্যা বড় গাছ জন্মাইতেই পারে না। তবে যেসকল তৃণগুল্মের অত্যধিক জীবনী-শক্তি, যাহাদিগের শিকড়ের অত্যল্প অংশ থাকিলেও বাঁচিয়া যায়, অথবা যেসকল তৃণগুল্ম বিষাক্ত, যাহাদিগকে পশুরা অনাহারে মরিয়া গেলেও স্পর্শ করিবে না, এইরূপ তৃণগুল্মই বাঁচিয়া গিয়া কালবিশেষে সমুদয় প্রান্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

পরোক্ষ ফলের কল্পিত দৃষ্টান্ত একটী দিই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কলম্বস যে কয়েকটী গরু আমেরিকা-সংলগ্ন সেন্ট-ডমিঙ্গো দ্বীপে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে কয়েক বৎসর পরে প্রায় লক্ষ গোচর্ম্ম আমেরিকা হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। এখন সেই গোচর্ম্ম বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহা দ্বারা আরও কত ব্যবসায় অবলম্বনে আরও কত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল! এইরূপ আলোচনা করিলে কে বলিতে পারে যে সেই অর্থ সুমেরুখণ্ডের আবি-ষ্কারে ব্যবহৃত হয় নাই? কে বলিতে পারে যে, তাহা ভারত অধিকারে প্রযুক্ত হয় নাই? জীবনসংগ্রামে প্রথম ত্যক্ত গোধনগুলি আদিম পশু ও প্রাকৃতিক অবস্থার নিকটে জয়ী হইয়াছিল বলিয়াই তাহাদের হইতে দুরন্ত কত ঘটনার কল্পনা করিলাম।

আর একটী দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। কলিকাতায় যে গোচর্ম্মের আমদানি হইতেছে, তাহা হইতে চীনে, মুচি প্রভৃতি শিল্পীরা জুতা প্রস্তুত করিতেছে। যদি গোচর্ম্মের আমদানি বন্ধ হয়, তবে তাহারা আর জুতা প্রস্তুত করিতে পারিবে না; সুতরাং আমরাও আর জুতা পরিতে পাইব না; কাজেই রোগে আক্রান্ত হইতে পারি, সুতরাং সুস্থ শরীরে যেরূপ অন্নচেষ্টা ও বুদ্ধিশক্তি পরিচালনার সম্ভাবনা ছিল, রোগাক্রান্ত শরীরে তাহার সম্ভাবনা থাকিবে না। আমার বুদ্ধিশক্তি দ্বারা অপরের যে উপকার করিতে পারিব, তাহারও সম্ভাবনা থাকিবে না। এই ফলপ্রবাহকে লইয়া চলিলে আরও অনেকদূর চলিতে পারে। এক গোচর্ম্মের আমদানি পরোক্ষভাবে কতটা আমাদের উপর কার্য্য করিতেছে! আমি কল্পিত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছি

বটে, কিন্তু প্রকৃতই জীবনসংগ্রাম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানারূপে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ ও মানবজাতির উপর কার্য্য করিয়া সকলকেই উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে।

আহারের অল্পতা হইতেই যে কেবল জীবনসংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা নহে; কীট পতঙ্গের আধিক্য হইতেও জীবন সংগ্রাম আইসে, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুও তাহা উপস্থিত করে। এইরূপে এত সামান্য ও বৃহৎ কারণে জীবনসংগ্রাম ঘটে যে অনেক সময় সকল কারণ অনুসন্ধান করিয়াও বুঝা যায় না।

এইবারে আমরা জীবন সংগ্রামের নৈতিকভাব দেখাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। জীবনসংগ্রামের কথা পড়িয়া আমাদের মনে এই একটা প্রশ্ন হইতে পারে, কেন এই সকল কষ্ট, এত মৃত্যু, এত রোগ? যাঁহাদের মনে এই প্রশ্ন উঠে, তাঁহারা স্বভাবতই মৃত্যুকেই যন্ত্রণাকষ্টের পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করেন। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের বিপরীতে এই প্রশ্ন করা যায় যে, যদি কোন জীবের মৃত্যু না ঘটিত, তাহা হইলে কি হইত? সংসারে মৃত্যু আছে অর্থাৎ শরীরের পরিবর্ত্তন আছে ইহা দেখিতেছি এবং ইহাও দেখিতেছি যে সেই মৃত্যুকে জয় করিবার জন্য, এমন কি সেই মৃত্যুর দ্বারাই, উন্নতিসেতুর নানা কার্য্য সংঘটিত হইতেছে। ফ্রাঙ্কলিন্ সুমেরুকেন্দ্র আবিষ্কারে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, পরে তাহারই অন্বেষণপথের যাত্রী হইয়া কত লোকে কত নূতন সত্য, কত নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। যুদ্ধ করিয়া, শত শত জীবহত্যা করিয়া ইংরাজজাতি যে আমাদের দেশের রাজা হইয়াছেন, ইহাতে আমরা কত উপকার পাইতেছি। সুতরাং জীবনসংগ্রামে "মৃত্যু যে, সে অমৃত-সোপান।"

মানবের জীবনসংগ্রাম করিবার অধিকার আছে; কারণ তাহারও পশু-পক্ষীর সহধর্ম্মী শরীর আছে কিন্তু জীবনরক্ষণে ততোধিক অধিকার, মানবের ইহাতেই শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব। আমাদের সহজ জ্ঞানে ইহা এত সহজে প্রতিভাত হয় যে, আমরা পশুদিগকে পরস্পর হত্যা করিতে দেখিলে পাপ বলিয়া বিবেচনা করি না। কাঁকড়াবিছা যখন শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়া ক্রোধে অভিমানে আপনার শরীরে দংশন করিয়া আত্মহত্যা করে, তখন আমরা তাহা পাপ বলিয়াই বিবেচনা করি না। কিন্তু মনুষ্য শত অপরাধী হইলেও তাহাকে

অপর মনুষ্য যদি হত্যা করে, তখন তাহাকে নিষ্ঠুরতা বলি, পাপ বিবেচনা করি; মনুষ্য যখন আত্মহত্যাও করে তখন তাহাকে অতি তীব্র পাপ বিবেচনা করি—হিন্দুদিগের মধ্যে এই ধারণা এতদূর বলবান যে তাঁহাদের বিবেচনায় আত্মঘাতিদিগের নরকেও স্থান নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জীবনসংগ্রামে "মৃত্যু যে সে অমৃত সোপান"; ইহা হইতে কি সেই অমৃতস্বরূপের পরিচয় পাই না? জীবনসংগ্রাম হইতে দেখা গিয়াছে যে, মোটের উপর উন্নতি চলিতেছে; সেই উন্নতিরূপ উদ্দেশ্য পরিচালনা করা, মৃত্যুকে অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া অমৃতে পরিণত করা যে অমৃতস্বরূপ এক মহান্ পুরুষের কার্য্য, এই জ্ঞান এত সহজ যে, ইহার বিষয় তর্ক করাই আশ্চর্য্যের বিষয় বিবেচনা করি। এক অমৃতস্বরূপ মহান্ পুরুষের ইচ্ছাতেই যে এই জগৎ চলিতেছে, পার্থিব জীবনসংগ্রাম ত্যাগ করিয়া অপার্থিব আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রাম-কালেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাই। এক ব্যক্তি তোমার প্রতি অত্যাচার করিল, তুমি প্রতিহিংসার ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহার প্রতি সাধু ব্যবহার করিলে, তখন সেই সাধুতার ভিতরে কি অমৃত পুরুষের অমৃতভাব প্রাপ্ত হও না? পার্থিব জীবনসংগ্রামের বাহ্য লক্ষণ মৃত্যু, আধ্যাত্মিক জীবন-সংগ্রামের বাহ্য লক্ষণ জীবন। আমাদের সকলেরই অন্তরের ভিতর, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত, এই ভাবটীই বর্ত্তমান যে, কিসে মৃত্যুকে জয় করিতে পারি। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য যে, যতটা পারি, পার্থিব জীবনসংগ্রাম যাহার অন্তত বাহ্য লক্ষণ মৃত্যু, পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রাম, যাহার বাহ্য লক্ষণ জীবন, অবলম্বন করি। এই আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রামের উপকরণ প্রেম, দয়া, সরলতা প্রভৃতি—এক কথায় ধর্ম্ম। এই কারণেই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।" তবে এস, সকলে মৃত্যুর মাঝেও উন্নতির পথে অমৃতের পথে দণ্ডায়মান হইয়া সেই অমৃতস্বরূপ ভূমা পুরুষের জয় জয়কার করি, তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলি, ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার করি।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায়
জীবনসংগ্রাম মুলক দ্বিতীয় কথা সমাপ্ত।

—:০:ওঁ:০:—

তৃতীয় কথা—পরিবৃত্তি।

সংসারে সকলই অনিত্য, সকলই পরিবর্ত্তনশীল। প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন-স্রোত একই ধ্রুব নিত্য সত্যসনাতন পুরুষের পরিধিস্বরূপে আবর্ত্তিত হই-তেছে। সেই ধ্রুব সত্য কেন্দ্র স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়াই কি জড়রাজ্যে, কি প্রাণরাজ্যে, কি অধ্যাত্মরাজ্যে, জগতের সর্ব্বত্র অচলপ্রতিষ্ঠ মঙ্গলনিয়ম সকল প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। সেই আশ্চর্য্য নিয়মসমূহের কার্য্যফলেই এই সুশোভন জগতসংসার আদিম বাষ্পরাশির অন্ধকার গর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। পরমাণু সমূহের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণরূপ একটী মঙ্গলনিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারই ফলে সুপক্ক ফলরাশি বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া প্রাণীগণের প্রাণধারণের সহায় হইতেছে; নদনদী সকল সমুন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গে জন্মলাভ করিয়া শতসহস্রক্রোশ দূরবর্ত্তী নগরপল্লী ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিয়া ভগবানের বিজয়সঙ্গীতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। অধ্যাত্মরাজ্যেও আত্মার স্বাধীনবিচরণ প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মঙ্গলনিয়মের বলে সত্যেরই জয়, মঙ্গলেরই জয় সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। আবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রাণরাজ্যেও কতকগুলি মঙ্গলনিয়ম প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। আমরা এই শেষোক্ত নিয়ম সমূহের মধ্যে একটীর বিষয় আলোচনা করিব—তাহার নাম পরিবৃত্তি।

জড়জগতের ন্যায় প্রাণরাজ্যেও নিয়ত পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। কিন্তু জড়-পদার্থের পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য একটা বহিঃশক্তির প্রয়োজন হয়, প্রাণ-রাজ্যের পরিবর্ত্তনসাধনে পরোক্ষভাবে সহায় হইলেও প্রত্যক্ষভাবে বহিঃ-শক্তির প্রয়োজন হয় না—প্রাণীদিগের অন্তর্হিত শক্তিপ্রভাবেই তাহাদের অজ্ঞাতসারে মূলপরির্ত্তনগুলি সাধিত হয়। যে নিয়মের বলে প্রাণরাজ্যের এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহারই নাম আমরা পরিবৃত্তি দিতেছি। অনেক দূরবর্ত্তী নক্ষত্র কিরণবিস্তার করিলেও সেই কিরণজাল আমাদের নয়নে

প্রতিভাত না হইলে যেমন তাহার অস্তিত্ব আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিতে পারি না, সেইরূপ পরিবৃত্তি চিরকাল কার্য্য করিতে থাকিলেও ডার্বিনের পূর্ব্বে অপর কাহারো বুদ্ধিতে তাহা সম্যক্ প্রতিভাত হয় নাই। এই পরিবৃত্তিই ডার্বিনপ্রচারিত অভিব্যক্তিবাদের অন্যতর মূলভিত্তি। পরিবৃত্তির অভাবে জীবনসংগ্রাম জনিত অথবা কাম্য (Sexual), কোন প্রকারই নির্ব্বাচন সম্ভব হইত না এবং সুতরাং অভিব্যক্তির কথাই উঠিতে পারিত না। এই পৃথিবীতে তুমি, আমি, সে, সকলেরই অবস্থা এক হইলে, শরীরমনের বল সর্ব্বতোভাবে সমান হইলে, ঘটনাচক্র সমান অনুকূল হইলে জীবনসংগ্রাম তো দূরের কথা, কার্য্যমাত্রই সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত—এক কথায়, সে প্রকার অবস্থার অস্তিত্ব অন্তত আমাদের কল্পনার নিতান্তই অগোচর।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম যে পরিবৃত্তি একটী নিয়ম মাত্র, যে নিয়মের ফলে প্রাণরাজ্যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া উভয়বিধ নির্ব্বাচনের সহায়তা করে। কিন্তু এই সম্বন্ধে প্রধানত দুই সম্প্রদায়ের মতামত দৃষ্ট হয়—এক সম্প্রদায় পরিবৃত্তি নিয়মের কার্য্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন, অপর সম্প্রদায় পরিবৃত্তি নিয়মে ভগবানের হস্ত প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অস্বীকার করেন। প্রথম সম্প্রদায় বলেন যে প্রত্যেক প্রাণীকে ভগবান পৃথক্‌ভাবে সংসৃষ্টি করেন, একটা বিশেষ নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইয়া যে জীবাদি অবধি মনুষ্য পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না—ইঁহারা বিসৃষ্টিবাদী; ইঁহারা আশঙ্কা করেন যে অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত মতের সহিত বিরোধ আসিয়া পড়ে এবং সুতরাং সেরূপ শাস্ত্রবিরোধী মতের সমর্থন অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কোন প্রকার শাস্ত্রীয় মতের সহিত অভিব্যক্তিবাদের বিরোধ ঘটে কিনা, তাহা বিচার করিবার ইহা উপযুক্ত স্থান নহে। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে প্রমাণদৃষ্টে প্রাণরাজ্যের পরিবর্ত্তন সকল পরিবৃত্তি নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বীকার করিলে অধর্ম্মের কোনই আশঙ্কা নাই, বরঞ্চ ইহাতে ঈশ্বরের মহিমাই উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পায়।

অপর সম্প্রদায় সকল পরিবর্ত্তনই পরিবৃত্তি নিয়মের কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু তাহাতে ভগবানের হস্ত অস্বীকার করেন। "নিয়ম" কথাটী

আমি বড়ই সঙ্কোচের সহিত ব্যবহার করিতেছি, কারণ বর্ত্তমানের সংশয়বাদী সম্প্রদায় "নিয়ম" কথাটীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইচ্ছাময় মঙ্গলময় ভগবানের অস্তিত্বের লোপাপত্তি করিতে সচেষ্ট। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে "নিয়ম" কথাটী কথামাত্র। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে যেমন ইহার মূল্য বলিয়া শেষ করা যায় না, অপর দিক্ দিয়া ধরিলে তেমনি ইহার মূল্য নাই বলিলেও চলে। একটু অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলেই বুঝা যাইবে যে দৈবাৎ বলিয়া জগৎসংসারে কোন কিছুই নাই, সকলেই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছে। যাঁহারা কোন কার্য্যকে দৈবাৎ হইল বলিয়া উল্লেখ করেন, সেটা কেবল তাঁহাদের তদ্বিষয়ক নিয়মের অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। এইখানেই নিয়মের মূল্য। "নিয়ম" কথাটীর দ্বারা অনেকগুলি ঘটনার কার্য্যপ্রণালী সংক্ষেপে বুঝান যায়—এক কথায়, প্রকৃতির ব্যাকরণ হিসাবে নিয়মের যথেষ্ট মূল্য আছে, কিন্তু তদতিরিক্ত মূল্য কোথায়? অগ্নিতে সকলেই দগ্ধ হয়, অর্থাৎ অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে, এই হইল একটী নিয়ম। আগুনে হাত দাও, যাহাই দিবে, তাহাই পুড়িয়া ছাই হইবে, এই ভাবটী এক কথায় ব্যক্ত করিতে গেলে অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে, এই সংক্ষেপ নিয়মের উল্লেখ করিতে হইবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে অগ্নিতে ইহা দগ্ধ হয়, উহা দগ্ধ হয় বলিবার পরিবর্ত্তে সংক্ষেপে ঐ নিয়মের উল্লেখ করিলেই বুঝিবারও সুবিধা হয়, বুঝাইবারও সুবিধা হয়। এই সুবিধা টুকুর জন্যই নিয়ম কথাটী বহুমূল্য। অগ্নিতে হাত পোড়ে, কাপড় পোড়ে, সকল পদার্থই দগ্ধ হয়, ইহাই হইল ঠিক কথা, আমরা মাত্র ব্যক্ত করিবার সুবিধার জন্য সাধারণভাবে উল্লেখ করি যে অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে। এতক্ষণে যাহা বলিলাম তাহা হইতেই অনায়াসে বুঝা যাইবে যে একটা "নিয়মের" শক্তি ও কার্য্য উৎপাদন করিবার কোনই ক্ষমতা নাই। তবেই প্রশ্ন আসে এই যে, যে পদার্থে যে শক্তি আছে, সে পদার্থ সে শক্তি পাইল কোথা হ'তে? উত্তর এই—জ্ঞানময় মঙ্গলময় ভগবান প্রত্যেক পদার্থে নিজ নিজ শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন। ভগবান মঙ্গলময়—প্রমাণ এই সুশোভন বিচিত্র জগৎ, যেখানে ক্ষুধার আহার আছে, তৃষ্ণার জল আছে, এবং যেখানে মঙ্গলভাবেরই সমাদর দিন দিন অধিকতর হইতেছে। ভগবান জ্ঞানময়—প্রমাণ এই জগত সংসারের সকল ঘটনারই

গণিতসাধ্য সূক্ষ্মতা সহকারে নিষ্পাদন, যাহার ফলে গ্রহনক্ষত্র ধূমকেতু সমূহের পুনরাবর্ত্তন, সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতির পুনরাবর্ত্তন শত শত বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতির্বেত্তারা অভ্রান্তরূপে বলিতে পারেন; বুদ্ধি বিশিষ্ট জ্ঞানবান মানবই জ্ঞানময় ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান। তবেই দাঁড়াইতেছে এই যে পরিবৃত্তি নিয়ম কোনই কার্য্য করিতেছে না, ভগবান পরিবৃত্তি নিয়মে কার্য্য করাইতেছেন।

এখন প্রশ্ন এই যে পরিবৃত্তি নিয়মটী কি? জীবরাজ্যে এই একটী আশ্চর্য্য নিয়ম দৃষ্ট হয় যে একই পিতামাতার সন্তানেরা পিতামাতার সহিত অথবা পরস্পরের সহিত ঠিক এক সমান হয় না এবং কোন প্রকারেই অবিকল অনুরূপ অবস্থায়ও পতিত হয় না—পরস্পর এতটুকু, কিছু না কিছু, কোন না কোন বিষয়ে বিভিন্ন হইবেই, কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেই। যে নিয়মের বলে এই বিভিন্নতার সৃষ্টি হয় তাহারই নাম পরিবৃত্তি। এই নিয়মের দূরব্যাপী ফল ডার্বিনের পূর্ব্বে কাহারই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই; ডার্বিন এবং ওয়ালেসই সর্ব্বপ্রথমে ইহার গুরুত্ব জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের অন্তরে মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদীগণের বক্তব্য এই যে এই পরিবৃত্তির ফলে যখন একই পিতামাতার সন্তানেরা প্রথমত পিতামাতার সহিত সমান হয় না এবং সমান অবস্থায়ও পতিত হয় না, তখন পিতামাতার সহিত সন্তানদিগের জীবনসংগ্রাম উপস্থিত হয়। এখানে ধরিয়া লওয়া যাক যে বয়োধিক্য জনিত অপটুতা প্রভৃতি কারণে পিতামাতাই জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন আবার সন্তানগণ পরস্পরের সহিত অসমান হওয়ায় তাহাদের আপনাদের মধ্যে জীবনসংগ্রাম ঘটে। এই জীবনসংগ্রামে জয়ী, সর্ব্বাংশে যোগ্যতম সন্তানেরাই আবার সময়ে পিতামাতা হইবে, আবার তাহাদেরও সন্তানদিগের মধ্যে যোগ্যতম সন্তানেরাই জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে হইতে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং উন্নতির সোপানাবলী সংরচিত হয়। তবেই দেখিতেছি যে জীবনসংগ্রামের ও সুতরাং অভিব্যক্তিবাদেরও মূল অবলম্বন পরিবৃত্তি। সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত না হইলেও এই পরিবৃত্তি কোন্ অবস্থায় কতটুকু

কার্য্য করিবে, তাহারও আবার বিশেষ বিশেষ নিয়মপ্রণালী আছে—কেবল পরিবৃত্তি কেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে কোন শক্তিই, কোন নিয়মই অনিয়মে স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারে না। এক জোড়া পক্ষীর দুইটী শাবক বিভিন্ন প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিল—কেন এরূপ হইল? ইহার কারণ সমূহ আমাদিগের সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত না হইলেও কারণের সমবায়ে ও নিয়মের ফলেই যে এরূপ ঘটিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

এইবারে পরিবৃত্তি নিয়মের নিয়মত্ব পরীক্ষা করিতে হইবে; দেখিতে হইবে যে ইহার প্রসার কতদূর। মাধ্যাকর্ষণ একটী নিয়ম আবিষ্কৃত হইল কিন্তু তাহার নিয়মত্ব জগতের অসংখ্য ঘটনায় অসংখ্য অবস্থায় পরীক্ষিত হইয়া দেখা গিয়াছে যে জড়জগতের সর্ব্বত্র তাহার প্রসার। অবস্থাভেদে ইহার কার্য্যের বিভিন্ন আকার দেখা যায়—গ্রহনক্ষত্রের পরিভ্রমণে এক আকার, নদী প্রবাহে এক আকার, আবার হিমানীযুগের বরফপাতে পৃথিবীর ধ্বংসে অন্য আকার। সেইরূপ পরিবৃত্তি নিয়মের প্রসার জগতের সর্ব্বত্র—কোন জীব, কোন পদার্থ এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহা থাকিবে, এক মুহূর্ত্ত পরে তাহা কোন প্রকারেই অপরিবর্ত্তিত আকারে থাকিতে পারিবে না। কেবল অবস্থাভেদে ইহার কার্য্যের বিভিন্ন আকার প্রকার দৃষ্ট হয়। বাষ্প হইতে জল, জল হইতে বরফ এবং পুনরায় বরফ হইতে জল ও জল হইতে বাষ্প, এই এক প্রকার সহজ পরিবর্ত্তন হইল। আবার বিভিন্ন পদার্থসংযোগে যে পৃথক্ পদার্থের উদ্ভব হয়, তাহার প্রণালী বিভিন্ন এবং সেই পরিবর্ত্তনের নাম রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। আবার এই পরিবর্ত্তন যখন প্রাণরাজ্যে কার্য্য করে, তখন তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার ধারণ করে এবং তাহার প্রণালীও স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। প্রাণরাজ্যের এই পরিবর্ত্তন প্রণালীর নামই আমরা পরিবৃত্তি দিয়াছি। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পরিবৃত্তির প্রসার প্রাণরাজ্যের উপরে।

জীবতত্ত্ববিদেরা এক প্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রাণরাজ্যের অভিব্যক্তির আদি জীবাদি বা প্রাণপঙ্ক এবং অন্ত মানব। আমাদিগের দেখিতে হইবে যে প্রাণপঙ্ক অবধি মানব পর্যান্ত সকল প্রাণীর উপরেই পরিবৃত্তি কার্য্য

করে কিনা। প্রাণপঙ্কের প্রকৃত স্বরূপ এখনও স্থিরীকৃত না হওয়াতে, বলা বাহুল্য যে. তাহাতে পরিবৃত্তির কার্য্যও বিশেষভাবে বিজ্ঞানের আয়ত্ত হইতে পারে নাই। প্রাণপঙ্ক ছাড়িয়া পুরুভুজ শ্রেণীতে আসিয়া পৌঁছিলে পরিবৃত্তির কার্য্য উপলব্ধ হইতে পারে। অধিকাংশ পুরুভুজ মুখের পরিবর্ত্তে গাত্রের অবনতির দ্বারা সাময়িক একটা মুখাকৃতি গর্ত্ত করিয়া আহার গ্রহণ করিয়া থাকে—কতকটা কীটভুক বৃক্ষের ন্যায়। * স্পঞ্জ, প্রবাল প্রভৃতি পুরুভুজ শ্রেণীরই বর্ণবিভাগ (variety) মাত্র। দোকানে গিয়া কতকগুলি স্পঞ্জখণ্ড দেখিলেই বুঝা যাইবে যে সকলগুলি এক শ্রেণীর স্পঞ্জ. নহে। এক শ্রেণীর স্পঞ্জ এক আকারে গঠিত, অপর শ্রেণীর স্পঞ্জ সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকারে। সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার কার্পেণ্টার বলেন যে "স্পঞ্জ শ্রেণীর পুরুভুজের (Foran.inifera) মধ্যে পরিবৃত্তির প্রসার এত বিস্তৃত যে বিশেষ বিশেষ অংশের পরিবর্ত্তন বশতঃ ইহাদের কেবল শ্রেণীবিভাগ নহে, জাতিবিভাগ (genus) এবং বর্গবিভাগও (order) করিতে হইয়াছে।"† প্রবালসমূহে পরিবৃত্তির কার্য্য বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইতে পারে। এই কলিকাতার যাদুঘরে (museum) রক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবাল দেখিলেই এই বিষয় সহজে বুঝা যাইবে। এক শ্রেণীর প্রবাল জ্বালামুখীর গর্ত্তের (Valcanic crater) ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হয়—আমরা তাহার নাম 'জ্বালাগর্ত্ত' প্রবাল দিলাম। এক শ্রেণী "প্রশাখ" প্রবাল অবিকল বিস্তৃতশাখ বৃক্ষের ন্যায়

---

* Protozoans generally have no mouth or only such as may be formed by a depression of the surface at the time when a particle of food is to be received and digested. They include * * sponges and many of the so called animalule ; the sponges * * being compound groups of protozoans * * *. Dana quoted by Webster.

† "the range of variation is so great among the Foraminifera as to include not merely those different characters wich have been usually accounted *specific*, but also those upon which the greater part of the *genera* of this group have been founded, and even in some instances those of its *orders*."

Dr. Carpenter quoted by Wallace.

দণ্ডায়মান থাকে। পরিবৃত্তির ফলে এই প্রকার নানা শ্রেণীর প্রবালের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। বিভিন্নভাবে অবস্থিতি দ্বারাই যে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবাল চিহ্নিত হয় তাহা নহে,তাহাদের শুঁয়া, মুখের আকার প্রভৃতি বিষয়েও বিস্তর বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। শম্বূক প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিহীন জীবসমূহেরও মধ্যে বিভিন্নতা এবং সুতরাং পরিবৃত্তির কার্য্য দৃষ্ট হয়। গুগ্‌লিও শম্বূক জাতীয়, আর দ্বিদল মুক্তাশম্বূকও শম্বূক জাতীয় অথচ উভয়ের প্রভেদ কত।

ধীর পদক্ষেপে কীটপতঙ্গের দিকে অগ্রসর হইলে এখানেও এক এক জাতির ভিতরে কত শ্রেণী, কত বর্ণবিভাগ, সুতরাং পরিবৃত্তির কার্য্য দেখা যাইতে পারে। প্রজাপতির বিষয় আলোচনা কর, দেখিবে যে এক শ্রেণীর প্রজাপতি পক্ষসমেত দৈর্ঘ্যে ৩ ইঞ্চি প্রস্থে ২ বা ২৷৷০ ইঞ্চি এবং দেখিতে ঘোর নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ; অপর শ্রেণীর প্রজাপতি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ১ ইঞ্চি হয় কিনা সন্দেহ এবং দেখিতে ঈষৎ বেগুনে মেঘের ন্যায়, দু'একটী দাগ আছে, চক্ষু দুইটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, চারিধারে সবুজ রঙ্গের পরিধি। আমাদের দেশে এমনি একটা বিজ্ঞানবিরোধী ভাব বিদ্যমান যে সচরাচর যে সকল কীট সন্ধ্যাপ্রদীপের নিকটে প্রতিদিন উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত উত্যক্ত করে, তাহাদেরও নাম, প্রকৃতি, আকৃতি কোন বিষয়েই কোন লক্ষ্য রাখি না। ধেপ্‌সো পোকা, ইংরাজীতে যাহাকে মথ (moth) বলে, তাহার প্রচলিত নামের অনুসন্ধান করিয়া হতাশ হইয়াছি। এই ধেপ্‌সো পোকারই বিভিন্নতা কত। আবার পিপীলিকা জাতি ধরিলে দেখি, (১) লাল পিঁপড়ে, ইহারা অত্যন্ত কামড়ায়, (২) কাল ছোট পিঁপড়ে—মোটেই কামড়ায় না, (৩) কাল ডেঁয়ে পিঁপড়ে—ইহাদের পুরুষগুলো অত্যন্ত হিংস্রাক্ত এবং মাংসপ্রিয়; শুনিয়াছি একটী এক মাসের ছেলেকে রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল, গৃহকর্ম্ম সারিয়া আসিয়া তাহার জননী ছেলের পরিবর্ত্তে এক রাশ ডেঁয়ে পিঁপড়ে দেখিতে পাইল। ইহা আশ্চর্য্য নহে, ডেঁয়ে পিঁপড়ের বাসার কাছে একটী মাংসখণ্ড রাখিলেই এই ঘটনার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। (৪) কাঠ পিঁপড়ে—ইহারা সচরাচর গাছে মাকড়-সার বাসার ন্যায় বাসা প্রস্তুত করে। ইহাদের ক্ষমতা এত যে ভীমরুল

ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হয়, ইহারা ভীমরুলের কটিদেশ কাটিয়া বিখণ্ড করিয়া ফেলে, পশ্চিমে ভীমরুলের উপদ্রব অতিমাত্রায় হইলে এই পিপড়ের বাসা গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া আনিয়া তাহাদের চাকের কাছে রাখিয়া দেওয়া হয়। (৪) গন্ধী (গোঁদো) পিপড়ে—এই পিপড়ে অতি ক্ষুদ্র, কামড়ায় না, কিন্তু ইহাদের এক প্রকার গন্ধ আছে, দৈবাৎ মারিয়া ফেলিলে এক প্রকার গন্ধ নির্গত হয়—তাহা আঘ্রাণ করিতে নিতান্ত ভাল লাগে না। ইহা ব্যতীত আরও কত বিভিন্ন শ্রেণীর পিপড়ে দৃষ্ট হয়, তাহার সকল গুলি এখানে উল্লিখিত হইল না।

কীটপতঙ্গের উর্দ্ধে সরীসৃপ—এখানেও পরিবৃত্তির কার্য্যকারিতার অভাব নাই। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি জীবতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক মিলনে এডোয়ার্ডস্ টিকটিকি জাতির বিভিন্নতা দেখাইয়াছেন। * আমরাও কোন শ্রেণীর নাম দিয়াছি গিরগিটি, কোনটার বা টিকটিকি, কোনটার বা বামুন টিকটিকি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে গোধা টীকটীকিরই অভিব্যক্তি। যে অর্থে আমরা বাঘের মাসী বিড়াল বলি, সেই অর্থে গোধার মাসী টিকটিকি বলিতে পারি।

কীটপতঙ্গ সরীসৃপের পর আমরা পক্ষীরাজ্যে উপস্থিত হই। আমরা কালো কাক সচরাচর দেখিতে পাই, কিন্তু সাদা কাক অতি অল্প লোকেই দেখিয়াছেন, আমরা দেখিয়াছি,—বোধ হয় একটী মৃত সাদা কাক কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থে পরিবৃত্তির একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। নিউজীলণ্ডের কীয়া নামক তোতাপাখী ইউরোপীয়দিগের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মধু, মধুপায়ী কীট ও ফল প্রভৃতি আহার করিত;

* ওয়ালেস এই সম্বন্ধে ডার্বিনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"M. Milne Edwards (Annales des Sci. Nat. I ser. Tom XVI P.50) has given a curious table or measurement of fourteen species of Lacerta Muralis, and taking the length of the head as a standard, he finds the neck, trunk, tail, front and hind legs, colour, and femoral pores, all varying wonderfully, and so it is more or less with other species. So apparently trifling a character as the scales on the head affording almost the only constant characters".

ইউরোপীয় বসতি হইবার পরে মাংস খাইতে সূত্রপাত করে; মেষচর্ম্ম কিম্বা মাংস শুকাইবার জন্য ঝুলাইয়া রাখা হইত, তাহাই খাইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এরূপ ঘোর মেষমাংসপ্রিয় হইয়া উঠিল যে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জীবন্ত মেষ আক্রমণ করিতে দৃষ্ট হয়। ক্রমে এখন জীবন্ত মেষের পৃষ্ঠে বসিয়া যকৃত পর্য্যন্ত কুরিয়া না খাইলে তাহার তৃপ্তিসাধন হয় না। ইহার ফলে তাহার ধ্বংসসাধনের উপায় অবলম্বিত হইতেছে। এই দৃষ্টান্তে এক পরিবৃত্তির ফলে বৃদ্ধি ও ধ্বংস কেমন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। চড়ুই, শালিক প্রভৃতি পক্ষীগণের মধ্যে পরিবৃত্তির কার্য্য সকল সময়ে প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও নিশ্চয়ই যে ঘটিতেছে তাহা স্বীকার্য্য কারণ তাহা না হইলে তাহারা আপনাপন শাবক নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিত না এবং যে সকল পক্ষী অনেকগুলি ডিম্ব এক সময়ে প্রসব করে, তাহারা সেই সকল ডিম্বপ্রসূত শাবকগণের মধ্যে প্রভেদ করিয়া যথাক্রমে প্রয়োজনমত আহার যোগাইতে সক্ষম হইত না। এই কথাটী পশুরাজ্যেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত কয়েকটী দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে। আমরা সচরাচর ধূসরবর্ণের শৃগাল দেখিয়া থাকি, কিন্তু সুমেরু কেন্দ্রে শ্বেত শৃগাল দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমরাও বারাকপুরের পশুশালায় একটী দেখিয়াছিলাম। সেইরূপ ধূসর, কৃষ্ণ, শ্বেত প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের ভল্লুকও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছি, সে গুলির মধ্যে পরিবৃত্তির কার্য্য অনেকটাই স্বীকার করিয়া লইয়াছি, স্বীকার করিয়া লইলেও তাহা অনুমান। কিন্তু সেই অনুমান অবলম্বন করিবার হেতু আছে—যখন গৃহপালিত পশুপক্ষীর মধ্যে পরিবৃত্তিকে প্রত্যক্ষভাবে কার্য্য করিতে দেখি, তখন বন্য জীবজন্তুর মধ্যে বর্ণবিভাগ প্রভৃতি দেখিলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে এই বিভাগ পরিবৃত্তির কার্য্যকারিতায় ঘটিয়াছে।

এইবারে গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে পরিবৃত্তির কার্য্য কিরূপ প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহারই কয়েকটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। উদ্ভিদ প্রভৃতিও যে প্রাণরাজ্যের অন্তর্গত তাহা বলা বাহুল্য। ইতিহাসে দেখা যায় যে গোলআলু দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বন্য অবস্থায় সার ওয়াল্টার র‍্যালে কর্ত্তৃক সভ্য জগতে আনীত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহার দীর্ঘ আকার

এবং বিষাক্তভাব ছিল, ক্রমে চাষ আবাদের গুণে ইহা পরম উপাদেয়, খাদ্য-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। যে টোপাকুল আমরা পরম আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করি এবং যাহার ব্যাস আধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখা যায় তাহারই অরণ্য-জাত স্বজাতির ব্যাস আধ ইঞ্চিও হইবে কি না সন্দেহ। যে বঁইচি কলিকাতা সহরে কাঠিতে গাঁথিয়া আনা হয় তাহা খাও পান্সা লাগিবে, কিন্তু বোল-পুর অঞ্চলের ভুবনডাঙ্গার মাঠে স্বভাবজাত বঁইচি খাইয়াছি, অতি সুমিষ্ট। কিন্তু এই ভুবনডাঙ্গার স্বভাবজাত খেজুর খাইয়াছি, তাহা খাইতে সর্ব্বাংশে যত্নবর্দ্ধিত খেজুরের ন্যায় মিষ্ট হইলেও আকারে ছোট এবং সুপক্ক অবস্থায় দেখিতে অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ হয়। স্বভাবজাত কালো জামও সযত্নজাত জাম অপেক্ষা ছোট হইতে দেখিয়াছি।

যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা পরিবৃত্তি অবলম্বনে প্রাণরাজ্যে যে কিরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি সংখ্যার পিয়ার্সন ম্যাগজিন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহার দু'একটী চিত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। দ্বিকোণ (bigonia) পুষ্প ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কত ক্ষুদ্র ছিল (১ চিত্র); বর্ত্তমান কালে ইহা কত বর্দ্ধিত আকারে দেখা দিয়াছে (চিত্র ২)। ৩ সংখ্যক চিত্রে ব্যক্ত আদিম আকারের বৃহৎ দ্বিকোণ (Double bigonia) হইতে বর্ত্তমানের বৃহৎ দ্বিকোণ (চিত্র ৪) কত ভিন্ন। উক্ত পত্রিকায় গ্নক্সিনিয়া নামক পুষ্পের কৃত্রিম উপায়ে অভি-ব্যক্তি পাঁচটী চিত্রে অতি সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে—পাঠকগণ একবার ৫ম চিত্রের সহিত ৯ম চিত্রের তুলনা করুন।

পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও কৃত্রিম উপায়ে পরিবৃত্তির নানা কার্য্য সাধিত হয়। কীটপতঙ্গের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ের ফল এ পর্য্যন্ত ভাল রকম প্রত্যক্ষ-গোচর হয় নাই। কিন্তু গৃহপালিত পশুপক্ষীর মধ্যে কৃত্রিম পরিবর্ত্তন সকল আমাদের বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। কপোত, কুক্কুট, হংস প্রভৃতি পক্ষীদের মধ্যে পালকেরা কত না পরিবর্ত্তন সাধিত করে। কপোত সম্বন্ধে সর্ব্বদেশের অধিকাংশ লোকেরই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে এই কারণে এবং ইহাদের লইয়া অনেক পরিবৃত্তি সাধিত হইয়াছে বলিয়া ডার্বিন এবং ওয়ালেস উভয়েই কিছু বিস্তৃতভাবে ইহাদের বর্ণবিভাগ বর্ণনা করিয়াছেন।

১ম চিত্র।
দ্বিকোণ পুষ্প।
১৮৬৪ পৃঃ।

২য় চিত্র।
দ্বিকোণ পুষ্প বর্ত্তমান আকার।
অঃ বাঃ পৃঃ ২৬।

৩য় চিত্র।
বৃহৎ দ্বিকোণ।
আদিম আকার।

৪র্থ চিত্র।
বৃহৎ দ্বিকোণ বর্ত্তমান আকার।
অং বাং পৃঃ—২৬।

৫ম চিত্র
গ্লক্সিনিয়া।
আদিম আকার।

৬ষ্ঠ চিত্র।

৭ম চিত্র।

অঃ বাঃ পৃঃ—২৬।

৮ম চিত্র।

৯ম চিত্র।
গ্লক্সি'নয়া বর্দ্ধমান আকার।

আমিও যতটুকু অনুসন্ধানে জানিয়াছি, তাহা এইখানে লিপিবদ্ধ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না;—

(১) গোলা—যে সকল পায়রা সচরাচর দেখা যায় তাহাদিগকে গোলা পায়রা বলে, বোধ হয় গোলা প্রভৃতি নিরাপদ্ স্থানে বাসা করে বলিয়া; ইহাদের মধ্যে সাদা ও কালো উভয় প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়।

(২) গলাফুলা—ইহারা গলাফুলাইয়া থাকে; সময়ে সময়ে সেই ফোলা গলার মধ্যে ঠোঁট পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া পড়ে। ইচ্ছা করিলে ক্রমে ক্রমে এই বিষয়ের এত ঔৎকর্ষ সাধিত হয় যে ভাল জাতির গলাফুলা গলা ফুলাইতে ফুলাইতে দম ফাটীয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে শুনা হয়। এই গলা ফুলাইবার ফলে ইহাদের পঞ্জরাস্থি অন্যান্য কপোত অপেক্ষা কিছু বেশী চওড়া হয়।

(৩) চিলে পর্প্পণ— ইহাদের বর্ণ কতকটা শঙ্কচিলের মত এবং মাথায় ছোট রকমের একটা পর্প্পণ অর্থাৎ ঝুঁটি থাকে। ইহাদের অতি অল্প সংখ্যকের সাদা রং হয়। কেহ কেহ বলেন ইহাদের পায়ে ঝুঁটি থাকে বলিয়া "পরপাঁও" নাম হইয়াছে।

(৪) সেরাজু—ইহাদের অন্য কোন বিশেষত্ব নাই, কেবল খাঁটি সেরাজু হইলে লেজ সাদা, বুক সাদা এবং ডানা কাল হইবে। সেরাজুর আবার তিন প্রকার-ভেদ আছে।

(৫) মুখ্খী—ইহাদের মুখটুকু সাদা এবং ইহারা অনুক্ষণ ঘাড় কাঁপাইতে থাকে; ভাল জাতীয় মুখ্খী হইলে ঘাড় কাঁপাইতে কাঁপাইতে উল্টাইয়া পড়িবে। ইহারও প্রকার-ভেদ আছে।

(৬) গুলি—ইহা বিলাতী পায়রা; ইহারা সাদা, কেবল বুকে দুই চারিটি কাল বিন্দু দেখা যায়। জানিনা, ইংরাজীতে (The Spots) যাহাকে বলে তাহার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা।

(৭) লক্কা (Fantails) কপোতের সচরাচর ১২টি পালকের লেজ থাকে, কিন্তু লক্কার লেজে ১৪ হইতে ৪০টি পর্য্যন্ত পালক থাকে। লক্কা ঠিক সরল ভাবে দাঁড়াইয়া সেই লেজটির পেকম তুলিয়া এবং ঘাড়টিকে পশ্চাতে লেজের দিকে হেলাইয়া ধনীলোকের গৃহিণীদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকে; ভাল জাতীয় হইলে লক্কার মাথা তাহার লেজ স্পর্শ করিতে

পারে। তাহাদের পা ছোট হয় এবং তাহারা দুইটি কাঠির মত করিয়া পদক্ষেপ করে। লক্কা আবার নানা রং অনুসারে নানা নাম প্রাপ্ত হয়—(ক) অপরাজিতা ফুলের মত রং হইলে অপরাজিতা, (খ) সাদা হইলে রেশমী এবং (গ) কাল।

(৮) কড়িয়া (Barb)—ইহার অন্য কোন গুণ নাই, কেবল চোখের চারিধারে পালকের চিহ্নশূন্য এক প্রকার চর্ম্মপরিধি হওয়াতে চোখ দুটি একটু বৃহৎ দেখায়। ইহা বিলাতী।

(৯) গেরোবাজ (Tumbler) ইহারা উড়িবার কালে ডিগবাজি খায়; ভাল জাতীয় গেরোবাজ মিনিটে প্রায় ২০।৩০ বার ডিগবাজি খাইতে খাইতে কেবল ক্লান্তিবশত বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয় এবং সময়ে সময়ে অজ্ঞানভাবে পড়িয়া মরিয়াও যায়। প্রবাদ আছে যে এইরূপ ডিগবাজি খাইতে খাইতে বাড়ীতে পড়িলে সেই বাড়ীর বিপদ হয়। চোখে পুঁথির মত দাগ থাকিলেই ভাল জাতি বুঝিতে হইবে।

(১০) লোটন (Ground tumbler)—ইহারা গেরোবাজেরই ভেদ মাত্র। ইহাদিগকে একটু নাড়াইয়া ভূমিতে ছাড়িয়া দিলে ডিগবাজি খায় এবং ভালজাতীয় হইলে ডিগবাজি খাইতে খাইতে সময়মত না ধরিলে মারা যায়। ধরিয়া মুখে ফুঁ দিলে তবে দম ফিরিয়া পায়।

(১১) জেকোবিন (Jacobin)—ইহাদের মাথার চারিধারে উল্টা পালকের একটা বেড় থাকে এবং মাথায় একটা সিঁতির মত রেখা দেখা যায়।

(১২) পেচক (Owl)—গলা ও বুকের মাঝে কতক গুলো পালক থেকে কতকটা পেচার মত দেখায় বলিয়া ইহার নাম পেচক পায়রা।

(১৩) বোগ্দাদ—ইহাদের ঠোঁটের উপরে ও নিম্নে, এবং পায়ে কতকটা মাংসের ঢিবি হয়ে অনেকটা পেরুর মত দেখায়। ইহার নাম হইতে বোধ হয় যে প্রথমে বোগ্দাদ প্রদেশ হইতে ইহার আমদানী হইয়াছিল।

হংসের পরিবৃত্তিও বিশেষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে ইচ্ছা মত সাদা ছানা অথবা কাল ছানার উপায় করা যাইতে পারে। কুক্কুটের ছানা যে কত রকমের হয়, তাহা বলা যায় না।

গৃহপালিত পক্ষীর ন্যায় কুক্কুর, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর মধ্যেও

পরিবৃত্তির কার্য্য বিশেষ লক্ষিত হয়। শূকর সম্বন্ধে ডার্বিন একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত ভার্জিনীয়া প্রদেশে কেবলই কাল শূকর দেখা যায়। তথায় এক প্রকার বর্ণক মূল পাওয়া যায়; তাহা খাইলে শূকরগুলোর সমস্ত হাড় বেগুণে রং লাভ করে এবং কাল ছাড়া অন্য বর্ণের শূকরের ক্ষুর খসিয়া যায়। এই কারণে তথাকার শূকরপালকগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক কাল শূকরেরই বংশবৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা পাইয়া থাকে এবং তাহারই ফলে তথায় কেবলই কালশূকর দৃষ্ট হয়। এইরূপে গরু ঘোড়া প্রভৃতি পশুরও যে পরিবৃত্তি পালকগণ কর্ত্তৃক সাধিত হয়, তাহা সকলেই অবগত আছে। আমরা দেখিয়াছি যে লম্বকর্ণ ছাগের দ্বারা লম্বকর্ণী ছাগীর শাবক হইলে কর্ণ ক্রমশই অধিকতর লম্বা হইতে থাকে। কুক্কুর, বিড়ালের পরিবৃত্তির কথা বলা বাহুল্য।

এই অবধি অতি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী হইতে অতি উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী পর্য্যন্ত সকলেতেই পরিবৃত্তির প্রভাব বিস্তৃত দেখিতে পাইলাম। আর অতি উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী মনুষ্য জাতির মধ্যেও পরিবৃত্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। নেপোলিয়নের পিতামাতার অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে বীর নেপোলিয়ন একজনই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহামতি গ্লাডষ্টোনের সন্তানগণের মধ্যে কয়জন তাঁহার মত সর্ব্বগুণে গুণী হইয়াছেন? সকলেই তাঁহার কোন না কোন গুণ পাইয়াছেন স্বীকার করি; কেহ বা ধর্ম্ম প্রচারক, কেহ বা ব্যবসায়নিপুণ হইয়াছেন বটে, কিন্তু পরিবৃত্তির ফলে তাঁহারা কেহই পিতা গ্লাডষ্টোনের সহিত অথবা পরস্পরের সহিত অভিন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং পরিবৃত্তি নিয়মের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন প্রশ্ন এই যে পরিবৃত্তির ফলে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হইয়া নিম্নতম প্রাণী হইতে উচ্চতম প্রাণীর অভিব্যক্তি হইতে পারে কিনা—এক কথায়, প্রাণপঙ্ক হইতে মনুষ্যের উদ্ভব সম্ভব কি না। এই বিষয়টী এত গুরুতর যে ডার্বিনকে ইহারই জন্য মানবের অভিব্যক্তি (Descent of man) নামক একখানি বৃহৎ পুস্তক লিখিতে হইয়াছে। আমরাও সংক্ষেপে এই বিষয়ের সময়ান্তরে আলোচনা করিব। তবে এইখানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে প্রাণপঙ্ক হইতে মানবের অভিব্যক্তি নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

পরিবৃত্তি নিয়মের ফলে দেখিতে পাই যে অবস্থা বিশেষে সাধারণত সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত মনুষ্য দুই হস্ত পরিমিত বামনের আকারও ধারণ করে। সেইরূপ আবার অবস্থাবিশেষে পড়িয়া তিনফুট আকারের আফ্রিকাবাসী বুশম্যান (গুল্মবাসী) ক্রমশ উন্নত আকার ধারণ করিতে করিতে যে বর্ত্তমানের সভ্যমানবের আকার ধারণ করিতে পারে এরূপ অনুমান কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে। আবার সেই গুল্মবাসী যে নিগ্রোকল্প (Negretta) নরবানর হইতে; সেইনরবানর বন মানুষ হইতে; বনমানুষ বানর হইতে; এইরূপে সকল প্রাণী মূলে প্রাণপঙ্ক হইতে যে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এরূপ অনুমান কিছুতেই একেবারে অসম্ভব নহে। এই বিষয়ে যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচিত হইবে কিন্তু এখানে এইটুকু জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে পরিবৃত্তির ফলে জীবনসংগ্রাম প্রভৃতির সহায়তায় মানবের অভিব্যক্তির ন্যায় একটা অতি বৃহৎ ব্যাপারও সময়ে সাধিত হইতে পারে। ইহা একটী অসম্ভব ব্যাপার নহে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায় পরিবৃত্তি মূলক তৃতীয় কথা সমাপ্ত।

চতুর্থ কথা—অভিব্যক্তিবাদের আপত্তি খণ্ডন।

মঙ্গলময় ভগবান এক, তাঁহার শক্তি অনেক। তাই উপনিষদ্‌কার ঋষি বলিয়াছেন "য একো বর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি" যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্যবস্তুসকল বিধান করিতেছেন। তাঁহারই ইচ্ছাতে এই সকল কাম্যবস্তু বিধানের উপায়স্বরূপে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত নিয়মদ্বয়, জীবনসংগ্রাম ও পরিবৃত্তি প্রাণরাজ্যে কার্য্য করিতেছে। পাছে এই সকল নিয়মের অপ্রতিহত প্রভাব স্বীকার করিলে ঈশ্বর অস্বীকৃত হইয়া পড়েন, এই ভয়ে অনেক ধর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তি উক্ত নিয়মমূল অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছাতেই এইসকল নিয়ম স্ব স্ব কার্য্যে ধাবমান হইতেছে, এই ভাবটী দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিলে তাঁহাদের এই ভয় থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া একটী নিয়মও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; একটী ঘটনাও ঘটিতে পারে না। তিনি যে কি উপায়ে জগতসংসার নিয়মিত করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা সেই উপায় সমূহেরই বিষয় আলোচনা করিয়া, তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া অনুধাবন করিয়া নিজেরাই জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হই এবং আনন্দ লাভ করি।

জীবাদি (প্রাণপঙ্ক) হইতে উন্নতি হইতে হইতে বানরের অভিব্যক্তি হইয়াছে এবং বানর হইতে মানবের অভিব্যক্তি সম্ভব, এই কথাটী এত নূতন ও বিস্ময়োৎপাদক যে উপরোক্ত ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত জনসাধারণেও ইহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক এবং অনেক বৈজ্ঞানিকও ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি দর্শাইয়া অনেকাংশে অস্বীকার করিতে প্রস্তুত। পৃথিবীতে যখন এমন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি দৃষ্ট হয়েন, যাঁহারা ভগবানের অস্তিত্বও অস্বীকার করেন, তখন তাঁহার দু-একটি নিয়মের মর্ম্মানভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি যে দৃষ্ট হইবে তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে "সাধারণের বাণী ঈশ্বরের বাণী।" বিজ্ঞানরাজ্যে সকল সময়ে একথা খাটে না। সাধারণের কথা

হইল যে সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; দেখিতে বলিতে ইহা অতি সহজ কথা, সহজেই জনসাধারণের বিশ্বাস হইবার কথা। বিজ্ঞানে সপ্রমাণ হইল যে সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে না, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহা প্রথম আবিষ্কার কালে সপ্রমাণ হইলেও জনসাধারণ এবং অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কর্ত্তৃক ভ্রান্তবোধে অস্বীকৃত হইয়াছিল। এই যেমন সাধারণের বাণীকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না, অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধেও সেইরূপ সাধারণ মতামত ঈশ্বরের বাণী বা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা অপারগ। এই সকল বিষয় বহির্বিষয় সম্বন্ধীয়, সুতরাং বাহিরের পরীক্ষাসাপেক্ষ—অন্তর্বিষয় সম্বন্ধীয় নহে যে অন্তর্গ্রাহ্য মতামতের উপর সত্যতা নির্ভর করিবে।

অভিব্যক্তিবাদের প্রসার আজকাল বড়ই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। জগতে আদি সৃষ্টি অবধি মানবের সৃষ্টি পর্য্যন্ত সকলই আজকাল অভিব্যক্তি-বাদের অবলম্বনীয় বিষয় বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। এক সময়ে এই পৃথিবী সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাষ্পাকারে অবস্থিত ছিল, ক্রমে তৃণাচ্ছাদিত এই শ্যামলসুন্দর আকার ধারণ করিয়াছে—ইহাও অভিব্যক্তিবাদের অন্তর্গত; ইহা বিজ্ঞানে স্থিরসিদ্ধান্ত হইলেও সাধারণ লোকে কি সহজে বিশ্বাস করিবে? বিশ্বাস করিবে না। জীবাদি হইতে মানবের অভিব্যক্তিকেই বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষভাবে অভিব্যক্তিবাদের বিষয় বলিয়া ধরিয়াছেন, আমরাও তাহাই স্বীকার করিয়াছি এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে অভিব্যক্তিবাদ বলিলেই জীবের এবং মানবের অভিব্যক্তিবিষয়ক আলোচনাই বুঝিতে হইবে। ডার্বিন, ওয়ালেস প্রভৃতি মনীষীগণ এই অভিব্যক্তিবাদকে এক প্রকার সিদ্ধান্তরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। একটী আপত্তি উঠিবে না, পৃথিবীতে এমন কোনো কিছু মত আছে কি? সুতরাং অভিব্যক্তিবাদেরও বিরুদ্ধে যে একটাও আপত্তি উত্থাপিত হইবে না, তাহা বিবেচনা করা ভ্রান্তি। মানবের অভি-ব্যক্তি জনসাধারণের নিকট উপহাসের কথা; কিন্তু যাঁহারা এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেও কতকগুলি আপত্তি উঠিতে দেখা যায়। আমাদিগের দেখিতে হইবে যে সেই সকল আপত্তি দ্বারা অভি-ব্যক্তিবাদকে নিরাস করা যায় কি না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকলগুলি আলো-

চিত হওয়া অসম্ভব, কেবল প্রধান প্রধান আপত্তিগুলিরই আলোচনা হইবে।

অভিব্যক্তিবাদীরা বলেন যে যদি বা বানর বা অন্য নিম্নপ্রাণী হইতে মানবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহা একবারে সম্পন্ন হয় নাই—মধ্যে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত অনেক প্রাণী হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বশেষ পরিবর্ত্তিত জীব মানবের আদি এবং সেই আদিম মানব ক্রমশ পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান উন্নত আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিরোধী পক্ষ বলেন যে তাহাই যদি হইবে, তবে আমরা আজ পর্য্যন্ত সেই সকল মধ্যবর্ত্তী জীব কি জীবিত কি ভূগর্ভে প্রোথিত, কোন অবস্থায়ই দৃষ্টিগোচর পাই না কেন? জীবনসংগ্রামকে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের একটী প্রধান উপকরণ স্বীকার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে মধ্যবর্ত্তী জীবসকল জীবিতাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হওয়া দুরূহ। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এবং অযোগ্যের বিনাশসাধন পরস্পরের অনুবর্ত্তী। মধ্যবর্ত্তী জীবগণ ভূগর্ভে প্রোথিত অবস্থায়ও দৃষ্টিগোচর না হইবার কারণ এই যে ভূগর্ভস্থ সাক্ষ্যসমূহ এখনও ভালরূপে সংগৃহীত হইতে পারে নাই, অনেকস্থলে সংগ্রহ করাও অসম্ভব। বর্ত্তমানের অনেক দ্বীপ বহুপূর্ব্বে মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল এবং পূর্ব্বে যে সকল স্থান মহাদেশের সহিত বিচ্ছিন্ন ছিল, বর্ত্তমানে সেগুলি মিলিত হইয়াছে, কতস্থান সমুদ্রের গর্ভরূপে পরিণত হইয়াছে, কতস্থান সমুদ্রের গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তী জীবের কত কঙ্কাল রাসায়নিক কারণে পঞ্চভূতে মিশাইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় সমস্ত মধ্যবর্ত্তী যোগগুলি সম্পূর্ণ সংগৃহীত হওয়া কি অসম্ভব নহে? সমুদ্রের গর্ভে যেগুলি প্রোথিত আছে, সে গুলি বর্ত্তমানে কি নিঃশেষে পাওয়া যাইতে পারে? আমরা বাল্যকাল অবধি দেখিয়া আসিতেছি যে, তখনও আমাদের বাগানের নারিকেল গাছে যতগুলি চিল কাক বসিত, আজও প্রায় সেই সংখ্যকই চিল কাক বসিয়া থাকে। এই বিশত্রিশ বৎসর যে চিলকাকদিগের শাবক হয় নাই তাহা নহে—তবে সেই সকলেরই কি অবস্থা হইল? অভিব্যক্তিবাদীরা বলেন যে প্রত্যেক বৎসরেই রাশি রাশি পক্ষী সমুদ্রের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তথায় প্রাণত্যাগ করে। এইরূপে মধ্যবর্ত্তী কত পশু পক্ষী যে সমুদ্রগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে কে তাহার

ইয়ত্তা করিবে? এই সকল সাক্ষ্য সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে হইলে সমগ্র মহাসাগর ছেঁচিয়া ফেলিতে হয়, তাহা হইলেও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যাই হৌক, ভূগর্ভে অভিব্যক্তিবাদের যে সকল সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

এখন কথা এই যে, ইহাও যদিবা স্বীকার করা যায় যে উন্নত জীবের অভিব্যক্তির ফলে নিম্নবর্ত্তী জীবের বিনাশসাধন হওয়াতে তাহাদের চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি সেই মধ্যবর্ত্তী জীব শৃঙ্খলস্বরূপে যে দুই উন্নত ও অনুন্নত জীবের সংযোগ সাধন করিয়াছিল, তন্মধ্যে অনুন্নত জীবেরও অস্তিত্ব দেখিতে পাই কিরূপে—অনুন্নত জীবের বিলোপসাধন কি উচিত ছিল না? দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাউক। বানর হইতে যদি মানব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, প্রশ্ন এই যে উহাদের মধ্যবর্ত্তী জীবগুলির অস্তিত্ব দেখি না কেন? যদি বল যে তাহাদের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, তবে তাহাদেরও নিম্নস্থ জীব বানরের বিলোপসাধন না হইল কেন? বানর হয়তো অনুকূল অবস্থা পাইয়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের কতক অংশ হয়তো অনুকূল দেশ কালের গুণে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে মানবাকারে উপস্থিত হইয়াছিল। মধ্যবর্ত্তী জীবগণ স্বভাবতঃই অল্প সংখ্যক হইয়া থাকে। মানবাকৃতি আদিম মানবও হয়তো অনুকূল দেশকাল পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন সীমাদ্বয়বর্ত্তী বানর ও মানবের আধিক্যবশত অল্পসংখ্যক জীবদিগের বিনাশ সাধনই অধিকতর সম্ভব। এখানেও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। মনে কর, একস্থানে ঘাসতৃণ যথেষ্ট আছে, চার হাত লম্বা বৃক্ষাদি যথেষ্ট আছে, আবার দশবারো হাত লম্বা বৃক্ষাদিও বহুল আছে। আরও মনে কর যে এইস্থানে তৃণভক্ষণের উপযুক্ত ছাগল, ১২ হাত উচ্চ বৃক্ষ খাইবার উপযুক্ত জিরাফ এবং ৪ হাত উচ্চ বৃক্ষের উপযুক্ত গরু আছে। তৃণ ঘাস খুবই পাওয়া যায়, ছাগলগুলি তাহাই খাইয়া বাড়িয়া যাইবে; জিরাফের আহার্য্যেও অপর দুই প্রাণী দন্তস্পর্শ করিতে অক্ষম, সুতরাং তাহাদেরও বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা। এইরূপে উভয় সীমাবর্ত্তী জীবদিগের বংশবৃদ্ধিবশত আহার বিষয়ক কষ্ট হইলেই, মধ্যবর্ত্তী জীবের আহার্য্যের প্রতিই সকলে আকৃষ্ট হইবে। সুতরাং মরিতে গেলে মধ্যবর্ত্তী জীবদিগেরই সম্ভাবনা অধিক,। তবে, তাহারা

যদি সীমাবর্ত্তী জীব অপেক্ষা যোগ্যতর হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারাই বাঁচিয়া যাইবে এবং যে প্রান্তবর্ত্তী জীবের বিনাশে তাহারা বাঁচিবে, সেই প্রান্তবর্ত্তী জীব বলিয়াই তাহারা অগত্যা পরিণত হইবে। মোটের উপর কথা এই যে অযোগ্যতানিবন্ধন বানর ও মানবের এবং অন্যান্য বর্ত্তমান বিচরণশীল প্রাণীগণের মধ্যবর্ত্তী জীবদিগের বিনাশ সাধন ঘটিয়াছে।

মধ্যবর্ত্তী প্রাণীদিগের উৎপত্তির সম্ভাবনাই আছে কিনা? অবশ্যই আছে। কপোত-পালকেরা এক গোলা পায়রা হইতেই কত রকমের পায়রা প্রস্তুত করে। কুকুর পালকেরা এক জোড়া কুকুর হইতে কত প্রকারই কুকুর প্রস্তুত করে। আমরা দেখিয়াছি যে দুই তিন পুরুষ চাষের ফলে ভূম্যবলুণ্ঠিতকর্ণ ছাগল প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল গৃহ পালিত পশুদিগের পরিবর্ত্তন মনুষ্যকর্ত্তৃক বিশেষ বিশেষ অংশে সাধিত হয়। কিন্তু প্রকৃতি সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, এই কারণে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে যখন কোন প্রাণী প্রস্তুত হয়, তখন তাহাকে তাহার আদি পুরুষ হইতে পৃথক বলিয়া সহজেই উপলব্ধ করা যায়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের বিষয় পরিবৃত্তি প্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে বলিয়া আসিয়াছি, সুতরাং এখানে তদ্বিষয়ে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এইবারে দ্বিতীয় আপত্তির বিষয় আলোচনা করিব। সেই আপত্তি যদিও বিশেষ গুরুতর নহে, তথাপি তাহা অবান্তরভাবে সুপ্রসিদ্ধ হার্ব্বাট স্পেন্সরের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া তদ্বিষয়ে দুইচারি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। আপত্তিটা এই যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে যেন স্বীকার করা গেল যে পশ্চিমে ছাগলগুলি লম্বা হইয়াছে, বঙ্গদেশের ঘোড়াগুলি খর্ব্বকায় হইয়াছে, কিন্তু সেই নির্ব্বাচনের ফলে কি চক্ষুর ন্যায় জটিল ও স্পর্শাসহ বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে? ডার্বিনের সম্প্রদায় বলেন, নিশ্চয়ই পারে। চক্ষুর সর্ব্ব আদিম অবস্থা ছাড়িয়া দিলেও আমরা তারামাছে (starfish) চক্ষের উৎপত্তির আদিম অবস্থা অনুভব করিতে পারি। অপেক্ষাকৃত উন্নত চক্ষে যে স্তরে বর্ণপুটিকা (pigment cell) থাকে তারামাছের সেই স্তরে জিলেটিনের ন্যায় তরল পদার্থে পূর্ণ কতকগুলি গর্ত্ত-প্রধান শিরাকে ঘিরিয়া অবস্থিত, আর সম্মুখে একখানি ন্যুব্জ দর্শন (lens)। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ইহা দ্বারা

উক্ত মাছ কেবল সম্মুখস্থ জিনিষের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে, আকার প্রকার জানিতে পারে না। এই আদিম চক্ষু হইতে ক্রমে যে এই জটিল চক্ষুর অভিব্যক্তি হইতে পারে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ কেণ্টকি গুহাস্থিত হ্রদের মৎস্য প্রভৃতি জীবগুলির চক্ষুর ঠাট বজায় আছে মাত্র, কিন্তু তাহাতে চক্ষুর কার্য্য হয় না—ঘন অন্ধকার বশতঃ কারণের অভাবে অব্যবহার হেতু চক্ষের বিলোপসাধনের সূত্রপাত হইয়াছে। ঊর্দ্ধচক্ষু নামে একপ্রকার মৎস্য আছে, তাহার দুইটী চক্ষুই ঊর্দ্ধগতি। এই মৎস্য একপেশে হইয়া কাদায় বিচরণ করে, কাজেই কাদার দিকের চক্ষু অব্যবহৃত থাকিয়া যায়। দেখা গিয়াছে যে, এই মৎস্যের ছানাদের প্রথম অবস্থায় দুই দিকেই চক্ষু থাকে, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই নিম্নদিকের চক্ষু আবর্ত্তন সহকারে ঊর্দ্ধদিকে আনীত হয়। মাছের ফুসফুস প্রথমে ভাসিবার জন্য চর্ম্ম-পুটিকা মাত্র আকারে বর্ত্তমান ছিল, এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য "কানকা" ছিল; ক্রমে ব্যবহারের বলে সেই চর্ম্মপুটিকাই ফুসফুসের স্থান গ্রহণ করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে লাগিল এবং "কানকা" ক্রমে কর্ণে পরিণত হইল। স্তনেরও আদি অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে একপ্রকার আদিম জীবের স্তনের পরিবর্ত্তে বক্ষের নিম্নে একপ্রকার থলী আছে, তাহাতে দুগ্ধের ন্যায় তরল পদার্থ বিদ্যমান থাকে, প্রয়োজন হইলেই শাবকগণ তাহা হইতে অন্য আকারে স্তনপানই করিয়া থাকে। এই প্রকারে যখন দেখি-তেছি যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গের বিকাশ, বিলোপ, গতিপরিবর্ত্তনাদি সাধিত হইতেছে, তখন চক্ষুর ন্যায় স্পর্শাসহ বস্তুরও উন্নত আকার ও জটিলতাসাধনও যে হওয়া সম্ভব, তাহা অস্বীকার করিব কি প্রকারে?

এইখানে হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অপেক্ষা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার এবং পরিপার্শ্বের (environment) উপর এই সকল পরিবর্ত্তন অধিক পরিমাণে নির্ভর করে এবং এবিষয়ে নাকি ডার্বিন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। কথাটা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয়ে যতটুকু বলিবার প্রয়োজন, ডার্বিন তাহা বলিয়াছেন। ডার্বিন তাঁহার "জীবশ্রেণীর মূল" (Origin of species) গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে লিখিতে-ছেন—"যে সকল ঘটনা ও বিতর্কের ফলে সুদীর্ঘ অবরোহকালে প্রাণীগণের

পরিবর্ত্তনের বিষয়ে আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, সেই সকল পুনরুল্লেখ করিলাম। উপর্য্যুপরি নানা স্বল্প, অনুকূল ও বংশানুগত পরিবর্ত্তন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনদ্বারা সংগৃহীত হইয়া (এই অভিব্যক্তি) সংসাধিত হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে প্রত্যঙ্গ সমূহের ব্যবহার ও অব্যবহার গুরুতর সহায়তা করিয়াছে এবং পরিপার্শ্ব শারীরিক গঠনাদির উপযোগিতা সম্পর্কে সহায়তা করিলেও তত বিশেষভাবে করে না।"* স্পেন্সারের বুঝিবার ভুল যে ডার্বিন অঙ্গ সমূহের ব্যবহার ও অব্যবহারের উপর ঝোঁক দেন নাই। ব্যবহার ও অব্যবহার এবং অন্যান্য নানা কারণের সমবায়ে যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, সেই সকল পরিবর্ত্তনরূপ উপকরণ না পাইলে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কি করিতে পারে ? শূন্যে শূন্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্য চলিতে পারে না। আবার, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে গেলে এই সকল পরিবর্ত্তন একপুরুষে হইলে চলিবেনা, পরিবর্ত্তন বংশানুগত হওয়া আবশ্যক। অধ্যাপক বেইসম্যান (Prof. Weisman) বলেন যে নবার্জ্জিত অভ্যাসগুলি বংশানুক্রমিত হয় না, যে সকল অভ্যাসের ফলে শরীরের আভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্ত্তন হয়, সেই গুলিই বংশগত হয়। চীনবাসীগণ পা ছোট করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু তাহাদের সন্তানেরা ছোট পা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না; যদি এইরূপ ক্ষুদ্রপদ হওয়ায় কোন বিশেষ উপকার হইত তাহা হইলে হয়তো প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে চীনবাসীগণ ক্ষুদ্রপদ হইয়া জন্মাইতে পারিত। এই অবস্থায় ডার্বিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারের উপর এবং পরিপার্শ্বের উপর যতটুকু ঝোঁক দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে, স্পেন্সর যতটা দিতে চাহেন ততটা সঙ্গত কিনা বলা সুকঠিন।

* "I have now re-capitulated the facts and considerations which have thoroughly convinced me that species have been modified during a long course of descent. This has been effected chiefly through the natural selection of numerous successive, slight, favourable variations; aided in an important manner by the inherited effects of the use and disuse of parts; and in an unimportant manner—that is, in relation to adaptive structures whether past or present, by the direct action of external conditions and by variations which seem to us, in our ignorance, to arise spontaneously."

অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় আপত্তি এই যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে নিম্নজীব সমূহের স্বাভাবিক সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেন, পারে। আমরা যাহাকে সহজ সংস্কার বলিয়া মনে করি, তাহা যে অর্জিত সংস্কার নহে কে বলিতে পারে? আমরা উপর উপর দেখিয়া মনে করি বটে যে মধুমক্ষিকারা নিখুঁত ভাবে তাহাদের চাক নির্ম্মাণ করে—অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে যে মধুমক্ষিকারা সমানভাবে আবাসগর্ত্ত সমূহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। * আমরা মনে করি বটে যে পাখীরা স্বাভাবিক সংস্কার বশে নিখুঁত বাসা প্রস্তুত করে—ইহা ভ্রান্তি। সুপ্রসিদ্ধ বিহগতত্ত্ববিৎ উইলসন এবং লেরয় (Wilson and Leroy) বলেন যে অল্প বয়স্ক পক্ষীগণ অধিক বয়স্ক পক্ষী অপেক্ষা বাসা মন্দ প্রস্তুত করে। পিঞ্জরাবদ্ধ গৃহপালিত পক্ষীগণ বাসার উপকরণ পাইলেও নীড় নির্ম্মাণ করিতে পারে না, তাহার কারণ তাহারা বাসা প্রস্তুত করিবার প্রণালী দেখে নাই, সুতরাং অবগত নহে। কাক পক্ষী যখন আহার চুরি করিতে উদ্যত হয়, তখন স্বাভাবিক সংস্কার অপেক্ষা বুদ্ধিপ্রয়োগ কি অধিক দৃষ্ট হয় না? অনেক কাক টিনের লম্বা ফালি সংগ্রহ করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে দেখা গিয়াছে, কিন্তু যদি ইহা স্বাভাবিক সংস্কার বশে হইত, তাহা হইলে তাহারা চকচকে জিনিষ দেখিলেই তাহা লইয়া গিয়া টিনের ফালির সহিত ভেজাল দিবার চেষ্টা করে কেন? এমনও দেখা গিয়াছে যে তাহারা বাসা নির্ম্মাণের জন্য একটা ডাল লইয়া গিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারে না; কিম্বা একটা কোন পদার্থ লইয়া গিয়া, তাহা অনুপযোগী বোধ হওয়াতে অন্য পদার্থ লইয়া গিয়াছে। এ সকল অভ্রান্ত সহজ সংস্কারের ফল বলিয়া স্বীকার করা বড়ই কঠিন। আমরা ভাবিতাম বটে যে প্রব্রজনশীল পক্ষীগণ স্বীয় অভ্রান্ত সংস্কারবলে দেশদেশান্তরে গমন করে। এখন সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে তাহারা দৃষ্টিবলেই এইরূপ গমন করে, এই কারণে চাঁদিনী যামিনীতে তাহারা খুব উচ্চে উঠিয়া গমন করে, মেঘলা রাত্রে অনেক নীচে উড়িয়া থাকে। সহস্র সহস্র পক্ষী যে সমুদ্রে উড়িয়া গিয়া দেশান্তর পাইবার পরিবর্ত্তে প্রাণত্যাগ করে, সংস্কারের অভ্রান্ততার বিরুদ্ধে তাহাই কি যথেষ্ট

* Darwin's Origin of species দেখ।

প্রমাণ নহে? যাহাদের সংস্কার তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিপ্রয়োগ দৃঢ় দাঁড়াইয়াছে, তাহারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে বাঁচিয়া যায় এবং এইরূপে সংস্কারেরও উন্নত আকারের অভিব্যক্তি কি কিছু আশ্চর্য্য? আবার, শারীরিক পরিবর্ত্তন, সংস্কার এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন পরস্পর-সাপেক্ষ। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে বুদ্ধিপ্রয়োগ হেতু মস্তিষ্ক যতই আবর্ত্তিত হইবে, সংস্কারেরও যে ততই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে তাহা অতি সহজেই অনুমতি হইতে পারে। অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে এইরূপ নানা আপত্তি উত্থাপন করা সহজ, এবং আমরা প্রত্যেক জীবের অবস্থা, বাসপ্রণালী, খাদ্যসংগ্রহপ্রণালী সম্যক্ জানিতে পারি নাই বলিয়া অনেকস্থলে সেই সকল আপত্তি খণ্ডন করা কঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু সচরাচর যেরূপ প্রমাণ অবলম্বনে অপরাপর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস করি, আমাদের বিশ্বাস যে অভিব্যক্তিবাদের সত্যতা বিষয়ে ততটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আর একটী আপত্তির বিষয় দুই চারিটী কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আপত্তিটী এই—একই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর (species) প্রাণীদ্বয়ের সঙ্গমে হয় শাবক হয় না, অথবা শাবক হইলেও তাহারা ঊষর হয়, কিন্তু একই জাতির বিভিন্ন বর্ণের (variety) সঙ্গমে এরূপ ঊষরতা উপস্থিত হইতে দৃষ্ট হয় না। কেন? এই আপত্তিটী সত্য বরিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না যে ইহা দ্বারা অভিব্যক্তিবাদ সম্পূর্ণ নিরাস হইতেছে কি প্রকারে? যাই হোক্, আপত্তিও যুক্তিতে দাঁড়ায় না। শ্রেণীর সংযোগে ঊষরতা সার্ব্বভৌমিক নহে। আসল কথা এই যে খুব কাছাকাছি অথচ গভীর বিভিন্নতার সংযোগেই ঊষরতা আইসে। আবার দেখা গিয়াছে যে বন্য অবস্থায় যাহারা ঊষর ছিল, তাহাদের পোষ মানাইলে ঊষরতা চলিয়া যায়। কেবল বিভিন্ন শ্রেণীর সংযোগে কেন— এমনও দেখা গিয়াছে যে গরম দেশের হাঁস শীতপ্রধান দেশে আনীত হওয়ায় ঊষর হইয়া গিয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে, যে সকল শ্রেণীর প্রাণীগণের পরস্পরের শারীরিক গঠন ও অবস্থায় সাদৃশ্য আছে, সেই সকল প্রাণী সহজে সঙ্গত হয় এবং অনুর্ব্বর হয় না। কিন্তু যে সকল শ্রেণীর পরস্পরের গঠন ও অবস্থা অনেকটা বিসদৃশ, তাহারা দূর সম্পর্কীয় হইলেও সহজে সঙ্গত

হয় না এবং হইলে উষর হইবার সম্ভাবনা আছে। ডার্বিন বলেন যে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সহিত উষরতার কোনই সম্পর্ক নাই। নানা কারণে যখন উর্ব্বরতা রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা, তখন উর্ব্বরতা বা অনুর্ব্বরতার কারণে ইহা বিবেচনা করিবার কোনই হেতু দেখিতেছি না যে বর্ণবিভাগ হইতে ক্রমশ শ্রেণীবিভাগ আসিতে পারেই না। উষরতার আপত্তি যুক্তিযুক্ত হউক বা না হউক, এখন দেখিতেছি যে তাহা অভিব্যক্তিবাদকে নিরাস করিতে পারে না।

পরিশেষে আর একবার বলি যে অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে রাশীকৃত আপত্তি প্রদর্শনের কোনই প্রয়োজন নাই, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকৃত হইলেও ভগবানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না, অস্বীকৃত হইলেও তাঁহার অস্তিত্ব দৃঢ়-প্রমাণিত হইবে না। অভিব্যক্তি একটী প্রণালীমাত্র—মূলে সেই ভগবানের ইচ্ছা। কেন জীবনসংগ্রাম কার্য্য করিতেছে, কেন পরিবৃত্তি কার্য্য করিয়া প্রাণরাজ্যে বিচিত্রতা আনয়ন করিতেছে? এ সকলই সেই ভগবানের ইচ্ছার বিকাশ ব্যতীত আর কি বলিব? একটী ঘটনা, একটী রেণু যখন তাঁহার অগোচরে উঠিতে পড়িতে পারে না, তখন আমরা এত ভয় পাইব কেন? যে প্রকার প্রণালী সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হউক না কেন, সর্ব্বোপরি তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা। আমি দর্শকমাত্র—দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি যে কি অভিব্যক্তিবাদী, কি বিসৃষ্টিবাদী, সকলেই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কেবল সেই ভগবানেরই বিজয় ঘোষণা করিতেছে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায় অভিব্যক্তিবাদের আপত্তি খণ্ডন মূলক চতুর্থ কথা সমাপ্ত।

পঞ্চম কথা—ভূগর্ভে অভিব্যক্তির সাক্ষ্য।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা সর্ব্বত্র। দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র তাঁহারই মহিমা জলন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত অচলপ্রতিষ্ঠ নিয়ম সকল ত্রিকালে কার্য্য করিয়া কি এক অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা রচনা করিতেছে। দ্যুলোকে অসীম বাষ্প রাশির গর্ভ হইতে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র ধূমকেতু সকল উত্থিত হইয়া নিত্য যে নূতন নূতন জগত রচনার সূচনা করিয়া দিতেছে, ইহাতেও যে বিশ্বকর্ম্মার হস্ত উপলব্ধ হয়; বিশ্বচরাচরে যে ব্যোমসাগর পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, অন্তরীক্ষে যে প্রাণরাশি থুক্‌বুক করিতেছে, ইহাতেও সেই একই বিশ্বকর্ম্মার হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিভুবন তাঁহারই আদেশে তাঁহারই নিয়মে ভ্রাম্যমাণ। নিউটনের আবিষ্কৃত পরমাণবিক আকর্ষণ, কেপ্লারের আবিষ্কৃত গ্রহগণের গতিপ্রণালী প্রভৃতি জ্যোতিষিক নিয়ম সমূহও যেমন নিয়ন্তা ঈশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, সেইরূপ রাসায়ন প্রভৃতি অন্যান্য নিয়মসমূহও, যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হইবে অথবা হওয়া সম্ভব, সকলই সেই বিশ্বনিয়ন্তা ত্রিভুবনপালকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইঙ্গিতমাত্র।

জীবরাজ্যে আমরা অভিব্যক্তি প্রণালীতে এই ইঙ্গিত অনুভব করি। ঈশ্বরের কতকগুলি ইঙ্গিত আমরা অতি সহজে অনুভব করিতে পারি। আমি সত্য বলিতেছি অথবা মিথ্যা বলিতেছি, তাহা যে স্বভাবতই জানিতে পারি, এই জানিবার সক্ষমতাও ভগবানের একটী ইঙ্গিত, কিন্তু ইহা বুঝিবার জন্য আমরা অপর কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখি না। আসল কথা এই যে ভগবানের যে সকল ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিলে সংসার ছারখার হইবার সম্ভাবনা আসে, সেইগুলিমাত্র ঈশ্বর আমাদিগের সহজজ্ঞানবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যের চারিধারে যে গ্রহগণ পরিভ্রমণ করিতেছে, এইরূপ ইঙ্গিত বা সত্য সকল আমাদের অন্তরে সহজজ্ঞানবোধ্যরূপে নিহিত হয় নাই, কারণ এগুলি না জানিলেও সংসারচক্র অচল হইবার

সম্ভাবনা নাই। এই শেষোক্ত সত্য সকল প্রথমোক্ত সহজজ্ঞানবোধ্য সত্য-সমূহের বিপরীতে বহিঃসাক্ষ্যের উপর অনেক পরিমাণে প্রমাণের জন্য নির্ভর করে। আমি জানিতেছি যে আমি ভাবিতেছি, ইহার প্রমাণের জন্য আমাকে রাশীকৃত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতে হইবে না। কিন্তু শেষোক্ত জড়সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক সত্যসকলের সম্বন্ধে সে সকল কথা খাটিবে না—যখন কোনও প্রতিভাশালী ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞানেতে এইরূপ কোন সত্য প্রতিভাসিত দেখেন, তখন তিনি সাধারণের নিকটে তাহা ব্যক্ত করিতে গেলেই সকলেই তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ ও সাক্ষ্য প্রার্থনা করিবেই এবং তিনি দৃষ্টান্তাদি দ্বারা উপযুক্তরূপে সপ্রমাণ করিতে অক্ষম হইলে লোকের বিশ্বাসে তাহা স্থান পাইবে না। জীবের অভিব্যক্তিতত্ত্বও এই শেষোক্ত প্রকারের সত্য এবং সুতরাং বিশেষ প্রমাণাদির অভাব ঘটিলে লোকে ইহা স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ভূগর্ভ হইতে কিরূপ প্রমাণ ও সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অভিব্যক্তি প্রধানত দুইটী মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—পরিবৃত্তি ও জীবনসংগ্রাম। কিন্তু এই দুই মূলভিত্তির সপক্ষে যে সকল প্রমাণ উল্লিখিত হয়, সেগুলি অভিব্যক্তির অবান্তর প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, প্রত্যক্ষ বলিয়া নহে। যদি আমি সপ্রমাণ করিতে পারি যে জগতে পরিবৃত্তি অথবা জীবনসংগ্রাম কার্য্য করিতেছে, তবে এইটুকু বুঝিতে পারিলাম যে জীব সকল পরস্পর হইতে পরিবর্দ্ধিত আকারে জন্মগ্রহণ করিতেছে অথবা এক শ্রেণী মৃত্যুরূপ সোপান অবলম্বনে অপর শ্রেণীর স্থান অধিকার করিতেছে; কিন্তু পরিবৃত্তি ও জীবনসংগ্রামের অনুকূল শতপ্রমাণ এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিবে না যে জীবের অভিব্যক্তি বা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ঘটিতেছে; অবান্তর ভাবে কেবল বলিতে পারিবে যে জীবের অভিব্যক্তি সম্ভব, একেবারে অসম্ভব নহে। ভূগর্ভে চিরপ্রোথিত অস্থিপঞ্জরাদিই, বলিতে গেলে, অভিব্যক্তির অন্যতর জীবন্ত প্রমাণ। এক শ্রেণী হইতে অপর এক উন্নত শ্রেণীর উৎপত্তি অথবা প্রকারভেদ হইতে শ্রেণীতে এবং শ্রেণী হইতে বর্গে পরিণতি, এই সকল প্রত্যক্ষ করিতে ও করাইতে

২৮শ চিত্র।

গিবন, ওরাং, সিম্পাঞ্জি, গরিলা, মানব কঙ্কাল।

(Huxley)

অঃ বাঃ পৃঃ ৪৩।

পারিলেই অভিব্যক্তির একেবারে চূড়ান্ত প্রমাণ হইয়া গেল। কিন্তু একটা মনুষ্যের শতবর্ষ পরমায়ুর মধ্যে এরূপ প্রমাণের দর্শনলাভ নিতান্তই অসম্ভব। এখন যদি আমরা অভিব্যক্ত প্রাণী সমূহের কঙ্কাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারি, তবে তাহা কি অভিব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না? অন্তত হওয়া কর্তব্য বলিয়া আমরা জোর করিতে পারি। আমরা যদি একটা শিশু, একটা বালক, একটা যুবা ও একটি বৃদ্ধ, মনুষ্যের এই চার অবস্থার চারটি কঙ্কাল কোথাও প্রোথিত দেখিতে পাই তবে এই প্রকার শিশু হইতে যে ঐ প্রকার বৃদ্ধের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা কি এক প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইল বলা যায় না? সেইরূপ আবার যদি হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, ইংরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ককেসীয় মনুষ্যের অস্থি পঞ্জর দেখি, তাহা হইলে আমার বোধ হয় বিনা দ্বিধা বলিতে পারি যে এই কয়টি অস্থি পঞ্জরের পূর্ব্বাধিকারীগণ একই জাতীয়, সুতরাং ইহাদের মূল এক। সেইরূপ মোগল, অষ্ট্রেলীয়, ককেসীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্যের অস্থি পঞ্জর দেখিলে বিনা সন্দেহে বলিতে পারি যে এই অস্থিগুলি মনুষ্যের, সুতরাং মূলে এক না হইয়া যায় না। আবার যখন অসভ্য মনুষ্যের অস্থির সহিত সিম্পাঞ্জি, গোরিলা প্রভৃতি বনমানুষের অস্থি পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিবার অবসর পাই, তখন তাহাদের উভয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া বলিতে বাধ্য হই যে ইহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য বড়ই বেশী, ইহাদের মূল হয়তো এক। বালক, যুবা ও বৃদ্ধের অস্থি দেখিয়া যে প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের বলে বলিতে পারি যে তাহাদের মূল সম্ভবতঃ এক, মনুষ্য ও বনমানুষের মূলের ঐক্যও সেই একই প্রত্যক্ষমূলক অনুমানবলেই স্বীকার করিতে পারি। এই প্রত্যক্ষমূলক অনুমান যুক্তিবিচারসম্মত, নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। আবার বনমানুষ হইতে বানর এইরূপ ক্রমশঃ পশ্চাদ্দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে যেন বলপূর্ব্বক বুদ্ধিকে সায় দিতে হয় যে সকল জীবেরই মূল এক। জীবেরও পশ্চাতে যাইয়া দেখি যে কতকগুলি জীব উদ্ভিদের সহিত রূপে এক এবং মাংসাশিকা প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদ প্রকৃতপক্ষে জীবধর্ম্ম সমন্বিত—ইহাদের মূল যে এক এরূপ অনুমান করা কি এতই আশ্চর্য্য? এইরূপে আমরা অনুমান করিতে

বাধ্য হই বলিলেও চলে যে, মনুষ্য অবধি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণ পর্য্যন্ত, সকলেরই মূলে সেই মহাপ্রাণপ্রেরিত আদিম প্রাণ জীবাদি এবং সুতরাং অন্য কথায় বলা যায় যে জীবাদি হইতেই এই যাবতীয় প্রাণরাজ্যের অভিব্যক্তি হইয়াছে।

মনুষ্য অবধি জীবাদি পর্য্যন্ত প্রাণীসমূহের বর্ত্তমান অথবা অতীত অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়া আমরা অনুমান করিয়া আসিলাম যে সকল প্রাণীর মূলে জীবাদি অর্থাৎ জীবাদি হইতেই সকল প্রাণীর অভিব্যক্তি। এখন এ বিষয়ে প্রথম একটী বক্তব্য এই যে জীবাদি হইতে উৎপন্ন সেই আদিম কালের অনেক প্রাণীতো বর্ত্তমানে বিদ্যমান দেখি না, তবে তাহার উপর নির্ভর করিয়া অভিব্যক্তি কিরূপে অনুমান করা যাইতে পারে। এইখানেই ভূতত্ত্ব আমাদিগকে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিবে ও করিয়া থাকে। ভূতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা ভূগর্ভের নানাস্থান খনন করিয়া এই বিষয়ে কত শত আশ্চর্য্য ঘটনা আবিষ্কৃত করিয়াছেন। কোথাও বা আদিম কালের শম্বুকাদি অন্যান্য দ্রব্যের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়াফলে প্রস্তরকল্প আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত থাকিতে দৃষ্ট হইয়াছে, কোথাও বা অতি আদিম কালের বৃক্ষলতা নিজে বিলুপ্ত হইয়া গেলেও প্রস্তরাদিতে নিজমূর্ত্তি অঙ্কিত রাখিতে ভুলে নাই; আর কোথাও বা জীবজন্তুর অস্থিকঙ্কালসমূহ কর্দ্দমাদিপ্রস্তুত প্রাকৃতিক পেটকে যুগযুগান্তরের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে, এবং হিমালয়ের ন্যায় উচ্চতম পর্ব্বতের অনেক উচ্চ অংশ হইতে সাগর গর্ভজাত আদিমকালীন শম্বুকাদি সংগৃহীত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই সকল সংগ্রহ করিয়া অভিব্যক্তিতত্ত্ব স্থিরীকৃত করিবার পক্ষে যথেষ্টই সহায়তা করিয়াছেন।

ভূগর্ভ উৎখাত করিয়া যে সকল প্রশীল (fossil) কঙ্কালাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য অভিব্যক্তিবাদ সমর্থন পক্ষে যথেষ্ট হইলেও নিতান্ত যে অসম্পূর্ণ তাহা বলা বাহুল্য। অসম্পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা জীবিত অবস্থায়ই আমাদের সকল দ্রব্য সমস্ত ঠিক রাখিতে পারি না, কত কীটদষ্ট হয়, কত অগ্নিদগ্ধ হয়, তখন কোটী কোটী বৎসর যুগযুগান্তর পূর্ব্বের কঙ্কালাদি অক্ষত ও সম্পূর্ণ দেখিবার প্রত্যাশা করিতে পারি কি?

জীবাণু অবধি মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রাণশৃঙ্খলের প্রত্যেক সংযোগ না দেখিলে অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিব না, এ কথা বলিলে নাচার। এই পৃথিবী যে বাষ্পাকার অবস্থা হইতে ক্রমশ শীতল হইতে হইতে এই সুন্দর আকার লাভ করিয়াছে, এ কথা আজকাল বিদ্যালয়ের ছাত্রমাত্রেরই জ্ঞাত আছে। কিন্তু এই আকার লাভ করিবার কালে পৃথিবীর কত যে বিশাল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কতশত পর্ব্বতের ধ্বংসসাধন, কতশত নিম্নভূমির উচ্চতালাভ, কতশত নগরগ্রামের অরণ্যে পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা ভূতত্ত্ব একটু বিশেষভাবে আলোচনা না করিলে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। এখনও রৌদ্র বাতাস ও জল যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। পর্ব্বতের গাত্রে বৃষ্টি পড়িল, রাসায়নিক প্রক্রিয়াফলে পর্ব্বতের প্রস্তরগুলি আংশিক ক্ষয় হইয়া গেল অর্থাৎ প্রস্তরের অংশ, পরিমাণে যাহাই হউক, ধূলির আকারে পরিণত হইল এবং পরিশেষে বায়ু তাহা প্রবাহিত করিয়া দিগদিগন্তে বাহিয়া চলিল। এইরূপ কার্য্যের ফলে রাজপুতানা, তিব্বত ও আরবদেশের মরুভূমি সকল প্রস্তুত হইয়াছে। অনেকেই জানেন যে "আঁধি" নামক বাতাসে এত ধূলি ও বালুকা উড়াইয়া স্থানান্তরিত করে যে, সময়ে সময়ে তাহা বর্ষার মেঘান্ধকার উপস্থিত করে। এই প্রকার আঁধির ফলে স্কটলাণ্ডের অন্তবর্ত্তী মরে moray নামক অত্যুর্ব্বর স্থান, বড় অধিক দিন নয়, ১০০ ফুট বালুকার নিম্নে প্রোথিত হইয়া এক্ষণে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই বায়ুই ঢাকার নবাবের বাটীর অংশ ধূলিরাশিতে পরিণত করিয়াছিল। এই সেদিন সংবাদপত্রে দেখা গেল যে বায়ুবলে আসামের প্রদেশবিশেষে জীবন্ত পশুমনুষ্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

বায়ু ও জল ছাড়িয়া দিয়া এক ভূমিকম্পের দ্বারা যে কিরূপ সহসা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে, তাহা গত ভূমিকম্পের সময় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্ব্বাঞ্চলে ইহার কার্য্য বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল। অসংখ্য স্থলে পৃথিবী ফাটিয়া গিয়া কোথাওবা কর্দ্দমমিশ্রিত জল, কোথাওবা উষ্ণপ্রস্রবণ, কোথাওবা বালুকাপ্রস্রবণ উদ্গত হইল। গত ভূমিকম্পে পূর্ব্বাঞ্চলের বৃহৎ ব্রহ্মপুত্রনদেরই গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আমরা স্থানীয় বৃদ্ধলোকের নিকট শুনিয়াছি যে বোলপুরস্থ ভুবনডাঙ্গা

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে শালবন ছিল, কিন্তু আজ তাহা মরুভূমিসদৃশ ডাঙ্গা—শালবনের চিহ্নও দেখি না। দেড়শত বৎসরেই অরণ্যচিহ্ন যখন খুঁজিয়া পাই না, তখন যুগযুগান্তরের এই প্রকার বিশাল পরিবর্ত্তন সমূহের মধ্যে ভূগর্ভস্থ সাক্ষ্যসকল অবিকৃত অবস্থায় প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া কি সম্ভব? জীবাদি অবধি মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রাণশৃঙ্খলের প্রত্যেক সংযোগ প্রাপ্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য স্বীকার করি যে পৃথিবীর স্থানে স্থানে অস্থিককঙ্কাল প্রভৃতি সাক্ষ্যসমূহ সঞ্চিত রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন ভূপৃষ্ঠ হইতে ভূকেন্দ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল অংশ উৎখাত করিয়া পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তখন যদিবা প্রত্যেক সংযোগ ভূগর্ভে সঞ্চিত থাকে, তাহা আবিষ্কার করাও আমাদের ক্ষমতার বাহিরে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ সাক্ষ্যসঞ্চয় দেখা যায় বা কখন্?—আগ্নেয়গিরি সমুদ্ভূত লাভা বা পাংশুরাশির দ্বারা যদি নগরগ্রাম পম্পীনগরের ন্যায় সহসা আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, জীবজন্তুর পলায়নের অবকাশ না থাকে, অথবা পর্ব্বতোপরিস্থ বরফ রাশি যদি সহসা অবতরণ করিয়া নগরগ্রাম আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। এইরূপ সহসা বিপদপাত না হইলে বিস্তৃতরূপ সাক্ষ্যভাণ্ডার দৃষ্ট হইবার উপায় নাই। এই সকল কঙ্কালাদি আবার যদি দৈবক্রমে উপযুক্ত আধারে রক্ষিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অস্পৃষ্ট অবস্থায় আমাদের নয়নগোচরে উপস্থিত হয় তবেই বলিতে পারি যে যথার্থরূপ সাক্ষ্যসঞ্চয় লাভ করিয়াছি। খটিক যুগের (chalk age) শম্বুকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়াফলে স্তূপাকার খটিক পর্ব্বতে পরিণত হইয়া সাক্ষ্যসংগ্রহের অনেকটা বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে। এই একটী দৃষ্টান্ত দিলাম—ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে এমন রাশি রাশি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এখন বোধ হয় বুঝা গেল যে অভিব্যক্তিবাদে ভূগর্ভের সাক্ষ্য কেন অসম্পূর্ণ। তবে যে সকল সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা অবলম্বনেই অভিব্যক্তিবাদ অনেকটা পরীক্ষিত হইয়াছে এবং নানা তর্কবিতর্কের পর তাহা সত্য বলিয়াই এক প্রকার পরিগণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া গোঁড়ামী ও আংশিক মূর্খতার পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হয়।

ভাল, না হয় স্বীকার করাই গেল যে এইস্থানে কতকগুলি জীবকঙ্কাল

পাওয়া গেল, ঐস্থানেও কতকগুলি পাওয়া গেল। কিন্তু ইহা হইতে যে জীবের অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহার প্রমাণ কি? যে প্রণালীতে অন্যান্য বিজ্ঞানবিভাগে সত্য আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়া থাকে, সেই প্রণালীতেই অভিব্যক্তিতত্ত্বও পরীক্ষিত হইয়া সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্তমূলক অনুমানের সহিত দৃষ্ট ঘটনাসমূহের মিল দেখেন, তবেই সেই সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। দু'একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করি। জ্যোতির্বিদগণ গ্রহগণের গতিপ্রণালী অনুসরণ করিয়া হয়তো কোন গ্রহের কক্ষনির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তমূলক অনুমান হইল যে এই গ্রহের এই কক্ষে চলাই সম্ভব। কিন্তু এই গ্রহ যদি উক্ত কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন কক্ষে পরিভ্রমণ করে, জ্যোতির্বিদগণ তখনই পুনরায় সিদ্ধান্তমূলক অনুমানবলে স্থির করেন যে সম্ভবত এই নূতন কক্ষ অপর কোন বৃহত্তর জ্যোতিষ্কের আকর্ষণবলে সংরচিত হইয়াছে এবং তখন হইতে তাঁহারা সেই নূতন জ্যোতিষ্কের অনুসন্ধানে তৎপর হয়েন। পরে এই জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার ঘটিলে তাঁহাদের অনুমানের সহিত প্রত্যক্ষ ঘটনার মিল হইল, সুতরাং তাঁহাদের অনুমানও সত্যে পরিণত হইল। আর একটী দৃষ্টান্ত দিই। জলকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল যে তাহা দুইটী বাষ্পের সংমিশ্রণে উৎপাদিত সুতরাং সিদ্ধান্তমূলক অনুমানে স্থির করা গেল যে এই দুই বাষ্পের সংমিশ্রণে জল উৎপাদিত হইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে বৈদ্যুতিক সংযোগে উক্ত দুই বাষ্প মিশ্রিত হইলে জল উৎপন্ন হয়—এতক্ষণে অনুমান সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইল। কি জ্যোতিষ, কি রসায়ন, কি চিকিৎসা, বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই এই প্রণালীতেই সত্য আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়া থাকে। অভিব্যক্তিবাদীগণও এই প্রণালী অবলম্বনে অভিব্যক্তিতত্ত্ব আবিষ্কারপূর্ব্বক সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যে সকল সাক্ষ্যভাণ্ডার (Deposits) আবিষ্কার করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি সাক্ষ্য উপরোক্ত প্রণালী অনুসারে একেবারে অকাট্যরূপে অভিব্যক্তিবাদের সত্যতা সমর্থন করে। অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেন যে যতই আদিম যুগের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই প্রাণী-

দিগের আকার প্রকার অজটিল হওয়া সম্ভব। কয়েকটী ভাণ্ডারে সেই-রূপই পাওয়া গেল। উদ্ভিদজাতির বিষয় আলোচনা করিলে অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। পাথুরে কয়লার যে সকল খনি দেখা যায়, সেগুলি যে আদিম যুগের অরণ্য ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াবশতঃ ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। এখন যে সকল খনি যত আদিম যুগের, সেই সকল খনিস্থিত কয়লা-সূচিত তৃণ বৃক্ষ সকল তত্তই সরল অজটিল আকার প্রকারের দৃষ্ট হয়; আদিম যুগে বর্ত্তমানের ন্যায় ফলপুষ্পে অবনত বৃক্ষ সকল দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বপ্রথম যুগের তৃণ ঘাসের ন্যায় একপত্র মাত্র; তাহার পরে শৈবাল জাতীয় (Fern) তৃণ—ইহা অঙ্গার যুগে (Coal age) সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে পাইন (Pine) জাতীয় কোণিক বৃক্ষ সকল দেখা যায় এবং সর্ব্বশেষে পুষ্পিত বৃক্ষের আবির্ভাব। এই সকল প্রমাণের উপর উদ্ভিদের অভিব্যক্তি সাহসের সহিত স্বীকার করা যাইতে পারে। জীবজন্তুর সম্বন্ধেও দেখা যায় যে অভিব্যক্তিবাদীগণের সিদ্ধান্তমূলক অনুমানের অনুকূল সাক্ষ্যভাণ্ডার দু'একটী পাওয়া গিয়াছে। ইউরোপের হাঙ্গেরী প্রদেশে হ্রদজাত শম্বূকাদির কতকগুলি ভাণ্ডার পাওয়া গিয়াছে এবং সেইগুলি সম্বন্ধে বিশেষ পর্য্যালোচনাও হইয়া গিয়াছে। এই ভাণ্ডারগুলি ভূপৃষ্ঠের ২০০০ ফুট নিম্নে পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ছয় হাজার বৎসরে একফুট স্তর গঠিত হয় ধরিলে এই সকল কঙ্কালাবশেষ জীবগুলি এক কোটী কুড়ি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল ধরা যাইতে পারে। এই শম্বূক সমস্ত একশ্রেণীর নহে—তাহাদিগকে আট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে একটা বিশেষ সংযোগ আছে—সকল শ্রেণীর মধ্যে উদ্বর্ত্তন সূচক একটা আকার-পরিবৃত্তি দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে আধুনিকতর শম্বূক গুলি আদিম শম্বূক হইতে এত ভিন্ন যে তাহাদিগকে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পরিগণিত করিতে হইয়াছে। আরও একটী দৃষ্টান্ত দিই। কুম্ভীর ও টিক-টিকী পরস্পর কত ভিন্ন, কিন্তু অধ্যাপক হক্‌স্‌লি ভূগর্ভ হইতে ইহাদের মধ্যবর্ত্তী সংযোগ কতকগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল মধ্যবর্ত্তী প্রাণীর শারীরিক অস্থিসংস্থানও মূল ও অভিব্যক্ত উভয় প্রাণীর মধ্যবর্ত্তী। আবার আরও আশ্চর্য্য এই যে অধ্যাপক হক্‌সলি আরও পুরাকালে পৌছিয়া

১১শ চিত্র।

অঙ্গার স্তরের সমুদ্ভূত অবস্থা।

ভূ. বা: পৃ:—৪৮।
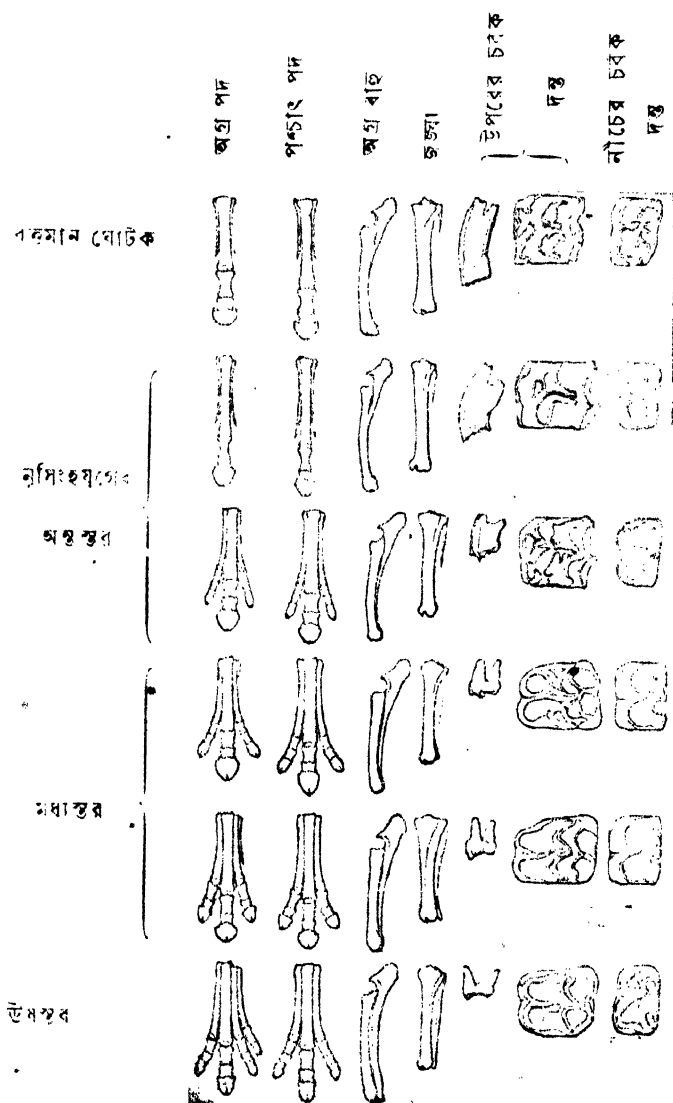
১২শ চিত্র।

অশ্ব জাতির অভিব্যক্তি।

অঃ বাঃ পৃঃ—৪৯।

ঘোটকের আদিমতম পূর্ব্ব পুরুষ
১ম অভিব্যক্তি—শৃগালাকৃতি।

৩য় অভিব্যক্তি—মেষাকৃতি।
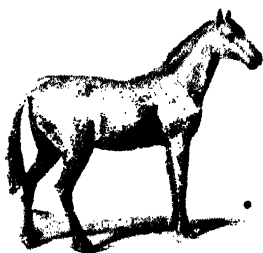
৬ষ্ঠ অভিব্যক্তি—পূর্ণকল্প ঘোটক।
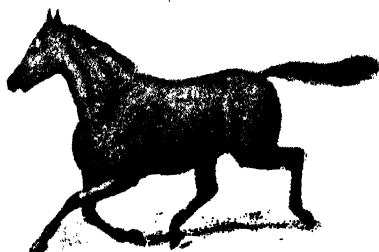
বন্য ঘোটক।
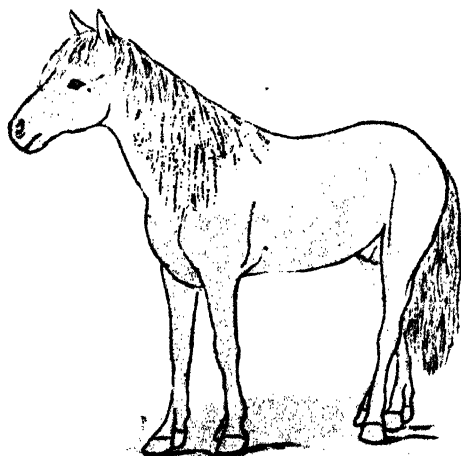
কিউবা দেশীয় একটী ঘোটকে বিহত ক্ষুরাংশের পুনঃ প্রকাশ।

১২শ—২য় চিত্র।

ঘোটকের অভিব্যক্তি।

টিকিটুকিরও মূলে কতকগুলি প্রাণী আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাদের আকৃতি অনেকটা পক্ষীজাতির অনুসরণ করিয়াছে।

অশ্বজাতির মূল অনুসন্ধানে অভিব্যক্তিবাদের সপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তম সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে—অর্থাৎ সিদ্ধান্তমূলক অনুমানের অনুরূপ অশ্বজাতীয় প্রাণীকঙ্কাল ধারাবাহিকরূপে পাওয়া গিয়াছে। অশ্ব, গর্দ্দভ, জেব্রা এক জাতীয় বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের মধ্যে সাধারণ কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন আছে। উরু, পা, ক্ষুর এবং দন্ত, এই চারিটী বিষয়ে অশ্বজাতি অন্যান্য জন্তু হইতে পৃথক ভাবাপন্ন। সচরাচর চতুষ্পদ জন্তুর অগ্রবাহুর (fore-arm) দুইটী করিয়া হাড় থাকে; কিন্তু ঘোড়ার সহসা দেখিলে একটা হাড়ই দেখা যায়—তবে একটু বিশেষভাবে দেখিলে দ্বিতীয় হাড়ের চিহ্ন দেখা যায়। ঘোড়ার পা যেন হাঁটু হইতে একটা আঙ্গুল বাহির হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহারই অগ্রবর্ত্তী নখ যেন ক্ষুরের আকার ধারণ করিয়াছে। অন্যান্য অঙ্গুলি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া নিতান্ত অপরিস্ফুট আদিম অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। পশ্চাতের পায়েও প্রায় ঐরূপ কার্য্য দৃষ্ট হয়। অশ্বজাতির দাঁত দানা প্রভৃতি কঠিন-কোমল পদার্থের চিবাইবার উপযুক্তরূপে সংগঠিত। ইহাদের দাঁত অন্যান্য জাবজন্তুর দাঁতের সঙ্গে মেলে না। এই সকল বিশেষ বিশেষ প্রত্যঙ্গের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইহাদের কঙ্কাল অন্যান্য জীবের কঙ্কালের সহিত পৃথকভাবে অনায়াসেই আলোচনা করা যাইতে পারিবে—ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ইউরোপীয়গণ যখন প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন সেখানে একটীও ঘোড়া দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু সেখানে অশ্ববংশের দেহাবশেষ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সেখানে অশ্বজাতীয় যে সকল কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, সর্ব্বপশ্চাতে এমন এক জীবে পৌঁছিতে হয়, যাহা বর্ত্তমান অশ্ব হইতে অনেক ভিন্ন, এমন কি, মধ্যবর্ত্তী সংযোগগুলি না পাইলে বুঝিবার উপায় ছিল না যে উভয়ে এক জাতীয়। বর্ত্তমান যুগের প্রত্যুষভাগে (Eocene period) শৃগালের ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতি একপ্রকার জীবের কতকগুলি শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই জন্তুর পায়ের হাড়গুলি সম্পূর্ণই দেখা যায়, চারটা সুপরিস্ফুট অঙ্গুলিও আছে। ইহা ব্যতীত সম্মুখ পদে অপরিস্ফুট একটী অঙ্গুলি ও পশ্চাৎ পদে তিনটী অঙ্গুলি আছে। এই

জীবের পায়ের ও দাঁতের গঠনের সাদৃশ্যেই ইহাকে অশ্বের সহিত একজাতীয় বলিয়া বুঝা গিয়াছে। কিছুকাল পরে এই জন্তুর কঙ্কাল অদৃশ্য—তৎপরিবর্ত্তে আকৃতিতে সমান খর্ব্বাকার আর এক জীবের আবির্ভাব; ইহার আকার সাধারণত প্রায়ই পূর্ব্বের অনুরূপ, তবে সামনের পায়ের অপরিস্ফুট অঙ্গুলিটী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য কতক বিষয়ে ঘোড়ার দিকে একটু অগ্রসর। আবার এ জন্তুও অদৃশ্য হইল, তৎপরিবর্ত্তে মেষের ন্যায় বৃহত্তর আকারের জীব উপস্থিত হইল; ইহার সামনের পায়ের তিনটী অঙ্গুলি এবং পায়ের হাড় ও দাঁত ঘোড়ার অভিমুখে অধিকতর উদ্বর্ত্তিত। ইহার পরে চতুর্থ জন্তুর আবির্ভাব; তাহার প্রত্যেক পায়ে তিনটী করিয়া অঙ্গুলি, কিন্তু তৃতীয় অপেক্ষা বৃহত্তর এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর। পঞ্চম জন্তু প্রায় গর্দ্দভের ন্যায় বৃহৎকায় এবং অনেকটা আধুনিক ঘোড়ার কাছাকাছি যায়, ইহারও প্রত্যেক পায়ে তিনটী করিয়া অঙ্গুলি, কিন্তু মাঝের অঙ্গুলি থেকে একটা অস্ফুট ক্ষুর বাহির হইয়া ভূমি স্পর্শ করে এবং অন্য দুইটী বিশেষ প্রয়োজনে আসে না। ষষ্ঠ জন্তু আধুনিক ঘোড়া হইতে অতি অল্পই ভিন্ন। ইহার দুইটি পার্শ্বস্থ অঙ্গুলি প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং মাঝেরটী ক্ষুরের আকারে অনেকটা পরিস্ফুট; ইহার পায়ের হাড় বর্ত্তমান ঘোড়ার সহিত প্রায় নিখুঁত সমান, দাঁতও অতি অল্প ভিন্ন। সর্ব্বশেষে আমরা বর্ত্তমান ঘোড়ার কঙ্কালাবশেষ প্রাপ্ত হই—এই অশ্ববংশ আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বেই কোন কারণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই যে ঘোটকের ইতিবৃত্ত বলিয়া আসিলাম, অভিব্যক্তিবাদীগণ প্রত্যেক অবস্থার জীবের কিরূপ হওয়া উচিত অনুমান করিয়াছিলেন, পরে সেইরূপ জীবের অস্থি পাইয়া বুঝিলেন যে তাঁহাদের অনুমান সত্যমূলক।

উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্ত সমূহ আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকিতেই পারে না যে জীবের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। ভগবানের আদেশ ব্যতীত, তাঁহার নিয়ম অতিক্রম করিয়া কিছুই সংঘটিত হইতেছে না। কিন্তু আমরা বলি যে অভিব্যক্তি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত অচলপ্রতিষ্ঠ একটি নিয়ম, একটি প্রণালী। পিতামাতার সন্তান যে তাঁহাদের আকৃতি ন্যূনাধিক পরিমাণে লাভ করিয়া

জন্মগ্রহণ করে, আমরা তখন কি একথা বলি যে ভগবান এই সন্তানটিকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন? একদিক দিয়া একথা ঠিক—কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দিক দিয়া ইহা ঠিক নহে। আমরা বলিব যে বিশ্ববিধাতার নিয়ম অনুসরণ করিয়া সন্তান পিতামাতার আকৃতি ন্যূনাধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছে। সেইরূপ, যেমন অশ্বজাতির মধ্যে দেখিলাম, তেমনি যখন সকল প্রাণীর মধ্যেই বিভিন্নতার মাত্রা ক্রমশ বর্দ্ধিত দেখা যায়, তখন ঈশ্বর প্রত্যেকটিকে বিসৃষ্টি করিয়াছেন বলিবার পরিবর্ত্তে তাঁহারই নিয়মে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও আমাদের বুদ্ধিতে অধিকতর সায় পায়। অভিব্যক্তিবাদের শাখাপ্রশাখায় অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু ইহা অস্বীকার করিতে পারিব না যে ইহার মূল অবিকৃত থাকিবে এবং এই অভিব্যক্তিবাদই আমাদের নয়নগোচর জীবন্ত প্রাণীসমূহের সৃষ্টি-সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে এবং আমাদেরও হৃদয়ে উন্নততর দেবজন্মধারী মানব-সৃষ্টির আশা আনয়ন করিয়া আনন্দময় সংসারের এক অভিনব চিত্র নয়নসম্মুখে উপস্থিত করিতে পারে। অভিব্যক্তিবাদও ভগবানেরই মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায় ভূগর্ভে অভিব্যক্তির সাক্ষ্য মূলক পঞ্চম কথা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ কথা—বর্ণভেদে জীবরক্ষা।

হংসা শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেবস্ত্বাং প্রসীদতু॥

যিনি হংসকে পবিত্র শুভ্রবসনে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, যাঁহার আদেশে শুকপক্ষী হরিৎবসন লাভ করিয়াছে এবং যিনি ময়ূরকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন, সেই পরমদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বর্ণভেদে যে জীবরক্ষা হয়, তাহা আর ভারতবাসীকে বিস্তৃত ভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ভারতবাসী প্রত্যেক পদে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতেছেন। বেদে দেখা যায় যে শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়ের প্রভেদ করা হইয়াছে—শ্বেতকায় আর্য্য এবং কৃষ্ণকায় অনার্য্য। আর্য্যদিগের প্রাণপণ চেষ্টা অনার্য্যদিগের সমূলে বিনাশ, আবার অনার্য্যদিগের প্রাণপণ চেষ্টা আর্য্যদিগের বিনাশ সাধন। বলা বাহুল্য যে উন্নত আর্য্যগণ অনার্য্যদিগেরই বিনাশ সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তবে, উহারই মধ্যে যে সকল অনার্য্য হয় তো আর্য্যদিগের মত শ্বেতকায় অথবা আর্য্যদিগের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল, কতকস্থলে বা আর্য্য ভ্রম করিয়া, এবং অধিকাংশ স্থলে অনার্য্যদিগকে অধীনে রাখিলে নিজেদেরই উপকারের সম্ভাবনা বলিয়া আর্য্যেরা সেই সকল অনার্য্যদিগকে বিনাশ হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে "History repeats itself" অর্থাৎ ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন হয়—এক সময়ে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে বহুকাল পরে আবার সেই প্রকার ঘটনা সমূহের পুনরভিনয় দৃষ্ট হয়। বৈদিক কালে আর্য্য ও অনার্য্যের, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের যে জীবনসংগ্রাম ঘটিয়াছিল, আজ তাহার সহস্র সহস্র বৎসর পরেও সেই জেতা ও বিজিতের জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। আমাদিগের জেতা ইংরাজদিগের অধিকাংশই শ্বেতকায় এবং বিজিত ভারতবাসীর অধিকাংশই কৃষ্ণচর্ম্ম। কাজেই সেই আবার শ্বেতচর্ম্ম ও কৃষ্ণচর্ম্মে সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। তবে যে সকল ভারতবাসী ইংরাজের

স্যার শ্বেতচর্ম্ম ও ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও ভাষা প্রভৃতি অনুকরণ করেন, তাঁহারা স্বভাবতই অনেক স্থলেই জীবনসংগ্রামের হাত এড়াইয়া জেতার প্রাপ্যের টুক্‌রোটাক্‌রা পাইয়া থাকেন। অনুকরণ যত সম্পূর্ণ হইবে, ভারতবাসী জেতা ও বিজিতের মধ্যে জীবনসংগ্রামের হাত ততই এড়াইতে সক্ষম হইবে। আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ ভাষা, নাম ধর্ম্ম এবং সর্ব্বাগ্রে চর্ম্ম, এই সকলে যিনি ইংরাজের যত অনুকরণ করিতে পারিবেন, তিনি তত জীবনসংগ্রামের অতীত হইয়া সংসারের সুখ সকল উপভোগ করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই—ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের সম্মুখে ঘটিতেছে। এই দুইটী দৃষ্টান্ত হইতে বর্ণমাহাত্ম্য সুন্দর উপলব্ধ হইবে আশা করি।

এই বর্ণবৈষম্য আমরা অবশ্য পছন্দ করি না, কারণ ইহার ফলে আমাদিগকে অনেক স্থলে বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু বলিলে কি হইবে—প্রকৃতিতে যে বর্ণভেদ ওতপ্রোত আছে। ইংরাজদিগের এক প্রকার রং, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের অন্য প্রকার রং। অবশ্য এই বর্ণের তারতম্যবশতই বলিতে গেলে আদিম অধিবাসীদিগের সমূলে বিনাশ সাধন হইয়াছে, কিন্তু তাহার উপায় কি? কাঁচা জিনিষের রং এক প্রকার, পাকা জিনিষের রং আর এক প্রকার। বর্ণবৈষম্য না থাকিলে আমরা কাঁচা ও পাকা জিনিষের প্রভেদ বুঝিতে পারিতাম না এবং সুতরাং জগতের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইত। সামাজিক বর্ণবৈষম্য ভাল কি মন্দ তাহা এস্থলে বিচার করিতেছি না, তবে প্রকৃতিতে যে বর্ণবৈষম্য আছে এবং বর্ণবৈষম্য জন্যই যে অনেকস্থলে সামাজিক বৈষম্য, সেইটুকুই বলিতে চাহি। তবে মোটের উপর এইটুকু বলিলে দোষ হইবে না বোধ হয়, যে বৈষম্যের ফলেই জগতের এই বিচিত্রতা ও উন্নতি। বৈষম্য না থাকিলে সকলই একাকার হইয়া যাইত, এবং সুতরাং জগতসংসারের অস্তিত্বেরই অভাব ঘটিত।

যাইহোক্, আমরা সামাজিক বর্ণভেদ বিষয়ে বর্ত্তমানে হস্তক্ষেপ করিব না; প্রকৃতিতে সত্য সত্য যে বর্ণপ্রভেদ দেখিতে পাই, রংয়ের পার্থক্য দেখি, এবং তাহাতে যে প্রকারে জীবরক্ষা হয় তদ্বিষয়েই আলোচনা করিব। জীবনসংগ্রাম বল, পরিবৃত্তিই বল আর বর্ণভেদই বল, মূলে ভগবানের ইচ্ছা। তাঁহার

ইচ্ছার অতীত হইয়া এক নিমিষও পড়িতে পারে না। সেই ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছাতে প্রলয়ের অন্ধকার ভেদ করিয়া এই সূর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল—"না-ছিল এসব কিছু আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি, ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল জয় জয় মহিমা তোমারি।" আবার সেই ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছাতে সূর্য্যকিরণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবৈচিত্র্যও আবির্ভূত হইল। ভগবান যে এক ইঙ্গিতে কত কার্য্য সাধিত করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে? যে মাধ্যা-কর্ষণের বলে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি অসংখ্য জগতের পরিভ্রমণ নিয়মিত হইতেছে, তাহারই ফলে ওজনেরও কার্য্য নিয়মিত হইতেছে, আবার ঔষধ বল, যন্ত্রাদি বল, সকলই ওজনের দ্বারা নিয়মিত হইয়া মানবের রক্ষাসাধনে নিরত রহিয়াছে। সেইরূপ ভগবানের বর্ণভেদের এক ইঙ্গিতে কত কার্য্য সাধিত হইতেছে! আমরা তো প্রত্যক্ষই করিতেছি যে পুষ্প কীট, পশুপক্ষী প্রভৃতিকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ঈশ্বর সংসারের কীট মর্ত্ত্য মানবের চক্ষুকে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য সংসার হইতে ফিরাইবার উপায় করিয়া দিয়া-ছেন। কিন্তু ডার্বিন, ওয়ালেস প্রভৃতি মহাপুরুষ প্রমাণাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন যে এই বর্ণভেদ জীবসমূহের জীবন রক্ষারও হেতু বটে।

জড় পদার্থেও আমরা বর্ণভেদের বিশেষ পরিচয় পাই। বলা যায় না যে, সূক্ষ্মভাবে ইহাদের মধ্যে প্রাণ বিরাজমান কি না। কয়লার পরিণতিতে যে হীরকের উৎপত্তি তাহা সিদ্ধান্ত—ইহা হইতে কি বলা যায় না যে কোন অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য ভগবানের ইচ্ছায় কয়লা নিজের সুবিখ্যাত কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্বেত পরিচ্ছদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা অবশ্য সামাজিক বর্ণভেদের ন্যায় জড়পদার্থেরও বর্ণভেদ আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিলাম। প্রাণন কার্য্যের ফলে যে বর্ণবৈচিত্র্য উৎপাদিত হয় তদ্বিষয়েরই আলোচনা করিব—এক কথায়, বর্ণবৈচিত্র্যের ফলে জীবের অভিব্যক্তি কিরূপে সাধিত হইতেছে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য।

ধরিতে গেলে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের জীব প্রাণপঙ্ক জীবাদি। তাহার মধ্যে যে বর্ণভেদ কতদূর কার্য্য করিতেছে, সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। জীব যতই উন্নতির পথে অভিব্যক্ত হইবে, ততই স্বভাবত তাহা-

দের বর্ণপ্রভেদও বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইবে এবং সুতরাং আমাদেরও চক্ষুগোচর হইবে ও আমাদের তদ্বিষয়ে আলোচনা ও পরীক্ষার সুবিধা হইবে। জীবাদি অভিব্যক্তিকালে দুইটী পথ অবলম্বন করিয়াছে দেখা যায়—এক, জীবাদি হইতে চিংড়ী, কাঁকড়া, কচ্ছপ প্রভৃতি সাগরিক জীবের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান মানবের অভিব্যক্তি; দ্বিতীয়, জীবাদি হইতে পত্র পুষ্প প্রভৃতির মধ্য দিয়া মানবের অভিব্যক্তি। এই উভয়ের সন্ধিস্থল সিদ্ধান্তরূপে এখনও নির্ণীত হইতে পারে নাই। পুষ্প পত্র হইতেই আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। এই দুর্ব্বাঘাস ও মুতা ঘাসের যে বর্ণপ্রভেদ আছে তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়। মুতাঘাসের বর্ণ দুর্ব্বা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হরিৎ। আমরা ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে গরু ছাগল প্রভৃতি সহজে মুতা খাইতে চায় না, তবে অবশ্য নেহাৎ দুর্ব্বাতৃণ না পাইলে খাইতে বাধ্য হয় অথবা দুর্ব্বাঘাসের সঙ্গে মিশাইয়া দিলেও খাইতে যে বিশেষ আপত্তি করে তাহা নয়। মুতার শিকড়ের রস কবিরাজী মতে ধারক, বোধ হয় সেই কারণে তৃণভোজী পশু দুর্ব্বার কাছে ইহা পছন্দ করে না। ইহাও বোধ হয় অনেকেরই লক্ষ্য-স্থলে আসিয়াছে যে বিড়াল কুকুর প্রভৃতি মাংসভোজী পশুগণ উদরাময় হইলেই তাড়াতাড়ি মুতার ঘাস চিবাইয়া খায়। আমরা বুঝিতেছি যে, যে কারণেই হউক ভগবানের ইচ্ছা মুতা ঘাসের রক্ষা সাধন; তাহার উপায় হইল বর্ণ-প্রভেদ। মুতা যদি তৃণভোজী পশুদের সম্মুখে আপনার পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার রক্ষা সাধন নিশ্চিত। এখন দুর্ব্বাঘাস ও মুতাঘাস দেখিতে প্রায়ই একপ্রকার, মুতাঘাস একটু লম্বা চওড়া ও অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর হরিদ্বর্ণ। দুর্ব্বাঘাসের মধ্যে মুতা রোপণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে অল্পদিনের ভিতর মুতা খুব বড় হইয়া উঠে ও দুর্ব্বা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পরিচয়যোগ্য বর্ণ ধারণ করে। ফলে এই দাঁড়ায় যে একদিকে গরু ও ছাগলে দুর্ব্বাঘাস খাইয়া তাহাকে হীনবীর্য্য এবং জীবনসংগ্রামে অক্ষম করিয়া তুলে, অপর দিকে মুতাঘাস সেই অবসর পাইয়া দুর্ব্বাঘাসের প্রাপ্য রসে পরিপুষ্ট হইয়া যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই তৃণচারী পশুদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করত নিজের রক্ষা ও বংশবিস্তৃতি সাধন করে। আমি দেখিয়াছি যে এই উপায়ে আমাদিগের বাটীর একটী মাঠে দুর্ব্বাঘাস সমুদয় মরিয়া গিয়া মুতাঘাসের মাঠ হইয়া গিয়াছে।

সচরাচর ঘাস পাতা প্রভৃতির বর্ণ অনেকটা এক প্রকার হওয়াতে বর্ণ-বৈষম্য ও তাহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ হয় না এবং তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিতেও তত সুবিধা হয় না। কিন্তু ফুলের বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়া কে না মুগ্ধ হইয়াছে? বসন্তকালে যখন পর্বতের গায়ে ফুলেরা কার্পেট বিছাইয়া খেলা করে, তখন কাহার প্রাণ না তাহা দেখিয়া উদাস হয়, কে না তখন তুচ্ছ ধূলিময় সংসারের বন্ধন মুহূর্তের মধ্যে কাটিয়া মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে চাহে? কিন্তু মনের অপূর্ব আহ্লাদপ্রদ এই বর্ণবৈচিত্র্যও সাধিত হইয়াছে এক বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে—সেই প্রণালী মূলত জীবনসংগ্রাম। ইহা সকলেই জানেন যে ফুল হইতে ফল হয়, ফলের বীজ হইতে গাছ হয়। সুতরাং ফুলগুলি প্রকৃত পক্ষে বংশরক্ষার প্রথম উপায়, সন্তান-উৎপাদক ইন্দ্রিয় মাত্র। ফুলের ভিতর হইতে শুঁড়ের মত কতকগুলি শুঁয়া দেখা দেয়, সেই শুঁয়ার উপরে পরাগের থলি থাকে। আর, সেই শুঁয়ার সমষ্টির ভিতরে বীজ-যোনি এবং সেই বীজযোনির মূলে বীজগর্ভ থাকিতে দেখা যায়। যে সকল ফুলে শুঁয়া-রূপ লিঙ্গ ও বীজযোনি পাশাপাশি থাকে, তাহাদের বিষয়ে বিশেষ ভাবিবার থাকে না, শুঁয়ার পরাগ একটু নাড়া পাইলেই যোনিতে পড়িয়া বীজের জন্মদান করে। কিন্তু কয়েকজাতীয় ফুলের লিঙ্গ ও যোনি পৃথক্ পৃথক্ সময়ে যৌবনোপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন একই জাতীয় এক ফুলের পরাগ অপর ফুলের যোনিতে প্রজাপতি প্রভৃতি কীট পতঙ্গ দ্বারা নীত হওয়া আবশ্যক হয়। আর যে জাতীয় ফুলের স্ত্রী ও পুরুষ-ভেদ পৃথক ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, বলা বাহুল্য যে সে ফুলের সন্তানোৎপাদন জন্য পতঙ্গাদির সাহায্য একান্ত আবশ্যক। পতঙ্গাদি মধুর লোভে যাইয়া বীজনিষেক করিয়া থাকে।

এখন দরকার হইল পুরুষ ফুলের পরাগ-বীর্য্য স্ত্রীপুষ্পের যোনিতে নিষেক—ইহারই জন্য জীবনসংগ্রাম প্রণালীর সাহায্যে এই বর্ণবৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি। রজনীগন্ধা, কামিনী প্রভৃতি শ্বেতপুষ্প সকল অধিকাংশই রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয়। ইহারা যে কেন সাদা হইল, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই বটে, কিন্তু আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে কোন কারণ বশত জীবন-সংগ্রামের ফলে সাদা হইয়াছে। এখন এই সাদা ফুলের স্থায়িত্ব ইচ্ছা করিলে

ইহার বংশবৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। রাত্রিতে আঁধারের ছায়ার ভিতর সাদা রঙ্গের ফুলগুলি নীল আকাশের মধ্যে তারকারাজির ন্যায় পরিদৃষ্ট হয় এবং রাত্রিচর ধেপ্‌সো তসরে পোকার (moth) দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তসরে পোকা সাদা ফুল সমূহের বংশ বৃদ্ধির সহায়তা করে। যদি সেই শ্বেতকায় পুষ্প সমূহের কোনটী কোন কারণে অন্য বর্ণ লাভ করে, তাহা হইলে হয়তো তসরে পোকাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না এবং সুতরাং সেই বিভিন্ন বর্ণের পুষ্পের বংশ বৃদ্ধির অভাবে বিলোপসাধনেরই সমূহ সম্ভাবনা। আবার যদি সেই পুষ্পটীর বর্ণ এরূপ হয় যে তসরে পোকা ব্যতীত অপর কোন জাতীয় পোকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইলে বংশবৃদ্ধি হইবার এবং সুতরাং সেই বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট বিশেষ শ্রেণীর আবির্ভাব হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। গোলাপ ফুলের ন্যায় টুকটুকে লাল ফুলগুলি প্রজাপতিদের প্রিয় এবং হল্‌দে রঙ্গের ফুলগুলি মক্ষিকাদেরই প্রিয় হইতে দেখা গিয়াছে। লাল ফুলগুলির গর্ভ-নিষেক পক্ষে তসরে পোকার ক্ষুদ্র শুঁড়ে সুবিধা হয় না, প্রজাপতিদের লম্বা শুঁড় কাজে লাগে। ভগবানের নিয়মে কাজেরও ব্যবস্থা চমৎকার—তসরে পোকাদের লালফুলের উপর বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না, আবার প্রজাপতিদেরও সাদা ফুলে বসিয়া তসরে পোকার উপযুক্ত কার্য্যে বৃথা সময় নষ্ট করিতে হয় না—প্রত্যেক কীট বর্ণের বিভিন্নতা অনুসারে নিজেদের উপযুক্ত পুষ্প বাছিয়া লয়। এমন অনেক ফুল আছে যাহাদের গর্ভ ধারণ হইলেই বর্ণ বদলাইয়া যায়—গর্ভনিষেকে সাহায্যকারী কীটগুলি আর সেই গর্ভিণী পুষ্পে না বসিয়া অন্য পুষ্পে চলিয়া যায়—প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য চেষ্টা যে এক বিন্দু সময় ও পরিশ্রম কাহারও ব্যর্থ না যায়! তবেই দাঁড়াইতেছে যে জীবনসংগ্রামে যে পুষ্পের যে বর্ণ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমরা অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।

কীট পতঙ্গের বর্ণবৈচিত্র্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা—জীবনসংগ্রামে যে কীট সমূহের বর্ণ বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে, তাহাতেই আমরা কত না আশ্চর্য্য হই। কিন্তু ডার্বিন, ওয়ালেস প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক প্রচারের পূর্ব্বে এই অপূর্ব্ব বিজ্ঞানকথা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল বলিলেও চলে। আমাদের বেশ মনে পড়ে যে ছেলে বেলায় আমরা যখন ভোরে বাগানে ফুল তুলিতে

যাইতাম, তখন পাতার নীচে, ফুলের ভিতরে সবুজ, লাল, সাদা প্রভৃতি মাকড়সা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম এবং পাঁচজনকে ডাকিয়া দেখাইতাম। তখন এই রকম বুঝিয়াছিলাম যে বিভিন্ন বর্ণের মাকড়সা ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কারণ অথবা প্রণালী আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। অভিব্যক্তিবাদ তখন এতটা প্রচলিত হয় নাই যে তাহা আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিবে। এখন পাশ্চাত্য মহাত্মাদিগের কৃপায় সে প্রণালী অবগত হওয়াতে বুকের উপর হইতে যেন শত মণ ভারী পাথর খসিয়া গিয়াছে। মাকড়সাদিগের এইরূপ বিভিন্ন বর্ণের আচ্ছাদন পাইবার মূল কারণ জীবন-সংগ্রাম। জীবনসংগ্রামে যে কোন উপায়ে বাঁচা দরকার। বাঁচিতে গেলেই দুর্ব্বলের পক্ষে সবলের অনুকরণ আবশ্যক; বলপূর্ব্বক শীকার করিয়া অথবা কৌশল দ্বারা স্বীয় বাসায় শীকার আনয়ন করিয়া আহারের বন্দোবস্ত আবশ্যক। মকমলে ফুলের পাতার পেট ও পিট লাল, কিন্তু পাতার ধারে একটী সাদা রেখা। তাহার ঠিক ধারে ছোট মাকড়সা বসিতে দেখিয়াছি, তাহার দুই পিট সাদাটে (দুধের মত সাদা নয়), ফুলের ধারের সঙ্গে একই রেখা দেখায় এবং পেট রক্তাভ, ফুলের পাতার পিঠের লালের সঙ্গে একেবারে মিশাইয়া যায়। আমি সহজে দেখিতে পাই নাই, জোরে পাখার বাতাস দেওয়াতে যখন একটু নড়ে উঠ্‌ল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে এটা একটী মাকড়সা। এই যে ফুলের পাতার অনুকরণ, ইহাতে দুইটী পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সফল হইতেছে—এক, পাখীতে ফুলের পাতা ভাবিয়া সহজে ধরিতে যাইবে না, দ্বিতীয়ত মাছি প্রভৃতি মাকড়সার শীকার সকল ফুলের পাতা ভ্রমে নিজে আসিয়া ধরা দিবে। এইখানে একটী সমস্যা আমার মনে উদিত হইতেছে তাহা বলিয়া রাখি। অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেন যে অনুকরণের অথবা অন্য কোন কারণে এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধন এক আধ বৎসরের কর্ম্ম নহে, কোটী কোটী বৎসরের, অন্তত সহস্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে এই মকমলে ফুল প্রতি শীত ঋতুতে নূতন করিয়া রোপিত হয়, তখন এই মাকড়সার অথবা তাহার পূর্ব্বপুরুষের পরিবর্ত্তন সঞ্চয় করিবার অবকাশ কোথায়? যখন সেই ফুল গাছসমেত তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় সেই গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুকালে সেই প্রকার মাকড়সার অস্তিত্ব দেখা যায়

না কেন? আমার বোধ হয় যে এইরূপ অনুকরণজনিত পরিবর্ত্তন লাভ করিতে খুব বেশী সময় দরকার হয় না—বহুরূপীর ন্যায় অন্যান্য কীটপতঙ্গেরও বোধ হয় কতকটা নিজের বর্ণপরিবর্ত্তনের ক্ষমতা আছে।

অনেক মাকড়সার শরীরের গঠন পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত দেখিয়াছি। এইরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্য অস্থিপরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে এবং অস্থিপরিবর্ত্তন যুগ-যুগান্তরের ক্রমে স্থায়ী হইতে দেখা যায় নাই। কাল ছোট পিঁপড়ের শ্রেণীতে একটী মাকড়সাকেও যাইতে দেখিয়াছি—কিছুতেই চেনা যায় না, চলনে একটু পার্থক্য দেখিয়া ধরিলাম। বাঙ্গালী সাহেবী শ্বেতচর্ম্ম হইলেও এবং সাহেবী পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও চলনচালনেও একটু যেমন খোঁচ থাকিয়া যায়, পিপড়ার মাঝে মাকড়সারও তদ্রূপ। অনুকরণে এতদূর সাদৃশ্য প্রাপ্ত যে সন্দেহ দূর করিবার জন্য মাকড়সাকে একটা কাঠির আগায় তুলিয়া ধরিতে হইয়াছিল, যখন তিনি স্বরচিত জালের সিঁড়ি অবলম্বনে অবতরণ করিলেন, তখন সন্দেহ দূর হইল। আমরা যে দেশবিদেশে গিয়া কীটতত্ত্বের অনুসন্ধান করিব, সে আশা করা বৃথা—এদেশে এমন সভা আজও হয় নাই যাহা হইতে সাহায্য পাইতে পারি, আর গবর্ণমেণ্টের নিকটেও সাহায্য প্রত্যাশা করা বৃথা, কারণ কীটতত্ত্ব শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা এদেশে নাই। কাজেই আমাদিগকে বাগান, পুকুর, মাঠ এই সকলে অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ করিতে হয় এবং এই সকল স্থানে মাকড়সা প্রভৃতি ধরিয়া অনুসন্ধানের কিছু সুবিধা দেখা যায়। মাকড়সার জাল প্রস্তুত করিবার আবার চমৎকারিত্ব কত—জাল এমন স্থানে করিয়া অনেক মাকড়সাকে তাহার মধ্যস্থলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি যে প্রথমে হঠাৎ বোধ হয় যে এরূপ ভাবে নিজেকে প্রকাশ করিয়া লাভ কি। পরে বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, যে গাছের অথবা যে বস্তুর উপর তন্তু রচনা করিয়াছে, সূর্য্যকিরণের প্রতিফলনে ঠিক সেই গাছের ফুলের কুঁড়ি অথবা সেই বস্তুর ন্যায় মাকড়সাকে দেখায়, ঠিক এরূপ স্থানে বুঝিয়া তাহারা তন্তু রচনা করিয়া মধ্যস্থলে বসিয়া থাকে। মাকড়সা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের বর্ণবৈচিত্র্য যে আত্মরক্ষার জন্য অনুকরণপ্রিয়তা হইতে উৎপন্ন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কীট পতঙ্গের অনুকরণপ্রিয়তা ও তজ্জন্য বর্ণবৈচিত্র্য বুঝিতে গেলে এক-

বার কলিকাতার যাদুঘর দেখিয়া আসিতে বলি। অনেক দিন অবধি ভাবিতাম যে যাদুঘরের পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবসমূহকে অভিব্যক্তিবাদের প্রমাণ স্বরূপে সজ্জিত করিয়া রাখা উচিত। সেদিন গিয়া দেখি যে ঠিক আমার মনের মত করিয়া সাজান হইয়াছে, তজ্জন্য কর্তৃপক্ষগণকে যথেষ্ট ধন্যবাদ। এখন যাদুঘরে গেলে অভিব্যক্তিবাদ অতি সহজে বুঝা যায়, কেবল পুঁথিগত বিদ্যামাত্রে পর্য্যবসিত হয় না। যাদুঘরে যেখানে প্রজাপতি আছে, সেইখানে একরকম পোকা রাখা হইয়াছে, তাহারা ঠিক পাতার মত এবং শুষ্ক কাঠির অনুকরণ করে—অনুকরণ এতদূর যায় যে অনেক সময়ে পাতা কিম্বা শুষ্ক ডাল থেকে তাহাদিগকে বাছিয়া লওয়া যায় না। এই অনুকরণের কারণ কেবল ভক্ষক পক্ষীদিগের হইতে আত্মরক্ষা এবং তাহার ফলে বর্ণবৈচিত্র্য। পত্রক কীট (leaf-insect) আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় একপ্রকার গঙ্গা ফড়িং (আমি বলি দুর্ব্বাফড়িং বলাই ভাল—ইংরাজীতে Grasshopper বলে) আছে তাহার ডানা ঠিক সবুজ পাতার মত এবং একটা শুঁড়ের মত আছে, তাহা দেখিতে শুষ্ক পাতার ডাঁটার মত—তাহার নাম শুষ্কশাখ। এঁকপ্রকার শলভ দেখা যায়, তাহা দেখিতে ঠিক পাতার আকৃতিবিশিষ্ট। একপ্রকার প্রজাপতি আছে, তাহার পৃষ্ঠভাগ পক্ষীদিগের অভক্ষ্য প্রজাপতির ডানার অনুকৃতি, আবার ডানার নিম্নভাগ ঠিক মৃত পত্রের ন্যায় দেখিতে হয়। তাহার নাম দিলাম মৃতপত্রক। কলিকাতার যাদুঘরে একজোড়া মৃতপত্রক প্রজাপতি রক্ষিত হইয়াছে। যে পাতায় সচরাচর এই প্রজাপতি মধ্যাহ্নকালে যে ভাবে ডানা উলটাইয়া বিশ্রাম করে, ঠিক সেই ভাবে সেই গাছের ডালে বসাইয়া কাচের বাক্সে রাখা হইয়াছে এবং সেই ডালের গায়ে একটা কাগজে চিহ্নিত করা আছে যে কোন্‌টা প্রজাপতি। আশ্চর্য্য এই যে আকৃতি-সাদৃশ্য এত অধিক যে সেই লেখা না থাকিলে কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না যে কোন্‌টী প্রজাপতি। বিশ্রাম কালে পাছে পাখীতে খাইয়া ফেলে, এই কারণে জীবনসংগ্রাম ও পরিবৃত্তি প্রণালী অবলম্বনে এই বর্ণবৈচিত্র্য ও তজ্জন্য জীবরক্ষা। অধিকাংশ স্থলে দেখি প্রাণের ভয়ে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় এবং তাহাও অভক্ষ্য নিরীহ কীটের অনুকরণে। আবার কোন কোন স্থলে নিরীহ কীট তীক্ষ্ণবিষ কীট সকলের অনুকরণ করিয়া ভক্ষকদিগকে ভয় দেখাইতে প্রবৃত্ত হয়।

মানুষেরা দেখিয়াছি একপ্রকার নিরীহ কীট মৌমাছির অনুকারী; একপ্রকার নিরীহ কীট কাল বোল্‌তার অনুকারী। এই সকল অনুকরণ যে প্রাণভয়ে ও জীবরক্ষার কারণে হয়, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। এই মনে কর যে প্রজাপতি পাখীরা খায় না, তাহার শুয়াঁপোকা হয়তো ভক্ষ্য, সে অবস্থায় শুঁয়াপোকা যদি গাছের পাতার অনুকরণ করিতে পারে, তবে প্রাণরক্ষার অনেকটা সম্ভাবনা—আর দেখিতেও পাই যে সেই সকল শুঁয়াপোকা সবুজ বর্ণের। আবার যে পত্রক ও শুষ্কশাখ কীটদ্বয়ের কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাদের পুরুষগুলো ছোট ও অবিকাশিত, কিন্তু স্ত্রীগুলো বড় ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত, কারণ শাবকের রক্ষার জন্ত তাহাদের এরূপ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

জলচর কীট সকলের মধ্যেও এইরূপ অনুকৃতির প্রাবল্য দেখা যায়। সমুদ্রের নিম্নতম স্তরে তারকামৎস্য পাওয়া যায়—ইহারা নামে মৎস্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাগরিক কীট। এই তারকামৎস্য স্বভাবতই সাদা, কারণ সাদা না হইলে, জলের রঙের সহিত এক না হইলে নিজের ভক্ষ্য পাওয়া দুর্লভ এবং অপরের ভক্ষ্য হওয়া সম্ভব। ইহাদের উপকারিতা অবশ্য আমরা আজও বিশেষ জানিতে পারি নাই, তবে উপকারিতা আছে বলিতে বাধ্য, নচেৎ ভগবান বাঁচাইবার উপায় করিয়া দিতেন না। মেডুসা নামীয় সাগরিক কীট স্বচ্ছ কাচের ন্তায়, বলা বাহুল্য ইহাও আত্মরক্ষার উপায়। কাঁকড়া গুলোর রং কাদার মত। আমরা সুন্দরবন অঞ্চলে দেখিয়াছি যে কাদার ভিতরে কাঁকড়া থাকিলে কিছুতেই সহজে দেখা যায় না।

কীট পতঙ্গ হইতে উন্নত জীব সরীসৃপ প্রভৃতির মধ্যেও যথেষ্ট বর্ণবৈচিত্র্য দেখা যায় এবং সুতরাং তাহার কারণ ও প্রণালীও কীটাদির সহিত একই হইবে—ভগবানের রাজ্যে একই নিয়ম একই শ্রেণীতে কার্য্যকর হইবে—সমগ্র চেতন রাজ্যে বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ জীবরক্ষা এবং প্রণালী জীবনসংগ্রাম ও পরিবৃত্তি বলিয়া বোধ হয়। গোক্ষুরা সাপের ফণায় যে গরুর ক্ষুরের দাগ, ওয়ালেস বলেন যে তাহা শত্রুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্ত। তাহা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তদুপরি আমার বোধ হয় যে তাহা আত্মরক্ষার উপযোগী অনুকরণ। বোলপুরের ভুবনডাঙ্গায় বুনো খেজুর গাছের ঝোপ বিস্তর আছে, সেই সকল ঝোঁপের গর্ত্তের ভিতরে অনেকস্থলেই প্রায় গোক্ষুরা সাপ বাস করে। সেই

খেজুর গাছের ফল আধপাকা অবস্থায় গৃহজাত আধপাকা খেজুরের মত বর্ণ-বিশিষ্ট কিন্তু পাকিলে একেবারে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। একবার মধ্যাহ্নকালে ঐরূপ আধপাকা খেজুর তুলিতে যাওয়া গিয়াছিল। যে ঝোঁপের কাছে যাওয়া হইয়াছিল, তাহারই নিম্নে গর্ত্তের ভিতর একটী প্রকাণ্ড গোখরো সাপ ফণা তুলিয়া ফোঁস ফোঁস করিতেছে। শব্দের কারণে আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে গিয়াছিল, নচেৎ আধপাকা ও কৃষ্ণবর্ণ পাকা ফলের সহিত এমনই মিলাইয়া গিয়াছিল যে আমরা প্রথমে সাপের অস্তিত্বই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। নাউডগা সাপ অনেকে দেখিয়াছেন কি না জানি না—দেখিতে ঠিক নাউয়ের ডগার মত। আমরা একবার শীতকালে সুন্দরবন অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, মাঝিরা নৌকা গুণ টানিয়া লইয়া চলিতেছে, আমরাও পদব্রজে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি। পথের মধ্যে দূরে দেখি যে প্রকাণ্ডকায় একটা কুমীর রৌদ পোহাইতেছে, দেখিয়া কিছু পশ্চাৎপদ হইলাম। আমাদের পাশে আটদশ হাত দূরে একটা গাছ লতার ডাল পাতায় আচ্ছাদিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমরাও পশ্চাৎপদ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছি, আর সম্মুখে ছিপের মত বেগে একটা নাউডগা সাপ মাটিতে পড়িয়া নদীগর্ভে চলিয়া গেল। তাহাকে আমরা ঝুলিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নাউ-ডগা সাপ দেখি নাই বলিয়া তাহাকে সাপ বলিয়া বুঝিতে পারি নাই, লতার অংশ বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলাম। গিরগিটি, টিকটিকি গুলো দেখিয়াছি—যে যে স্থানের অধিবাসী, প্রায় সেই স্থানেরই বর্ণের অনুকরণ করে। বহুরূপীর সম্বন্ধে তো কথাই নাই—স্থানের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের তারতম্য দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে বহুরূপীর শরীর এরূপ ভাবে গঠিত যে তাহাতে স্থানের প্রতি-বিম্ব পড়ে এবং প্রতিবিম্ব পড়িলেই বর্ণতারতম্য হয়। হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত যে আত্মরক্ষার অথবা জীবনসংগ্রামের কোন সম্বন্ধ নাই তাহা বলিতে পারি না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জীবজন্তু যতই উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহাদের বর্ণ প্রভৃতি চিহ্ন সকল পরিস্ফুট হইতে থাকে। সরীসৃপ হইতে পক্ষীতে পৌছিলেই এই বিষয় বিশেষ বুঝা যাইবে। পক্ষীদিগেরই বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ উপভোগ করি, প্রবন্ধের শিরোদেশে আশীর্ব্বচনও তাহা

ব্যক্ত করিতেছে। বালহাঁস প্রভৃতি বালুচর পক্ষীর রং ঠিক বালুকার বর্ণের সহিত মিশিয়া যাইবার উপযোগী। পদ্মার চরে শীতকালে বড় বড় বিল দেখা যায়। তাহার ধারে সন্ধ্যাবেলায় বালহাঁস আসিয়া বাস করে। এমন শত শত বালহাঁস একটা বিলের চারি পাশে বসিয়া নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিয়াছিল, অথচ আমরা তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে পারি নাই; অবশেষে আমরা তাহাদের নিকটে অনেকটা অগ্রসর হইলে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া দিল। যে দেশে গাছপালা বেশী, সেই দেশের অনেক পাখীর রং সবুজ, যেমন তোতাপাখী। আবার চড়ুই পাখীদের পুরুষের রং এক প্রকার, স্ত্রীর রং অন্য প্রকার। পুরুষ চড়ুইয়ের রং অনেকটা গাছের ছালের সঙ্গে এবং স্ত্রী চড়ুইয়ের রং অনেকটা মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপযোগী। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে পুরুষ চড়ুই গুলো অধিকাংশ সময় দলে দলে গাছের ডালে ডালে বেড়ায়, তারি মধ্যে দুই একটী স্ত্রীচড়ুই দেখা যায়, কিন্তু স্ত্রী চড়ুইদিগকে অধিকাংশ সময়ে দলে দলে মাটিতে ধূলায় ও শুষ্ক ঘাসের মধ্যে খেলা করিতে দেখা যায়, তারি মধ্যে দুই একটী পুরুষ চড়ুই দেখা যায়। চড়ুই পাখীদের বাসা প্রায় শুষ্ক ঘাসে নির্ম্মিত হয়, ডিমে তা দিবার কালে বোধ হয় অলক্ষ্য থাকিবার উপায়স্বরূপেও স্ত্রী চড়ুইয়ের রং মাটি অথবা শুষ্ক ঘাসের সহিত মিশিয়া যায়। পেচক, চামচিকা প্রভৃতি নিশাচর পক্ষীর বর্ণ রাত্রের অন্ধকারে মিশাইয়া যাইবার উপযোগী, তাহাতে তাহাদের আহার যোগাইবার সুবিধা হয়। লক্ষ্মী-পেচার সাদা রং চাঁদিনী যামিনীর উপযোগী। কাদাখোঁচা, টিট্টিভ প্রভৃতি পক্ষীগণ প্রায়ই পচা তৃণ পরিপূর্ণ কর্দ্দমক্ষেত্রের মধ্যে বিচরণ করে, তাহাদের বর্ণও তদুপযোগী। ইংরাজদিগের স্নাইপ শীকার করা একটা মস্ত বাতিক, ঐই শীকারের প্রধান সমস্যা শুনিয়াছি যে অনেক সময়ে বালির মধ্যে তাহা-দিগকে দৃষ্টিগোচর করা যায় না। স্নাইপ-শীকার এরূপ কঠিন না হইলে বোধ হয় এতদিনে স্নাইপবংশ ধ্বংস হইয়া যাইত। অষ্ট্রিচের (উট পাখী) গলার রং ঠিক বালির রং কিন্তু তাহার গায়ের পালকের রং অপেক্ষাকৃত ছায়াটে ও কালো। অষ্ট্রিচ যখন বালির ভিতর বসে, তখন সেই গর্ত্তের ছায়ার রংয়ের সহিত মিশিবার জন্য গায়ের রং একটু ছায়াটে হওয়া দরকার; গলাটা যেমন

বাহির হইয়া থাকে, তাই গলা বালির রং ধরিয়াছে। অহি পক্ষীর (Snake Bird) ঠোঁট, গলা এবং পাশের ডানার রং সর্পের অনুকরণে রচিত—তাহা না হইলে সর্প শীকার অনেকটা অসম্ভব হইত। যাদুঘরে সজ্জিত পক্ষীকুল আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে 'জলচর পক্ষীর পেটের দিকে সর্ব্বদাই সাদা ও জলের সবর্ণ হয়, যাহাতে মাছ প্রভৃতি খাদ্যজীব ভয় পাইয়া না পলায়ন করে। বক পেঙ্গুইন প্রভৃতি পক্ষী সকলও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। রাত্রিচর খকের রং অনাবশ্যক বলিয়া সাদা হয় নাই,' কিন্তু তাহার প্রয়োজন অনুসারে অন্ধকারের উপযোগী বর্ণলাভ হইয়াছে। হলদে চূড়া বিশিষ্ট কাঁকাতুয়ার চূড়ার কারণ সম্বন্ধে কেহ কিছু বলেন নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় যে এই চূড়াতে ঐ কাকাতুয়ার আবাসবৃক্ষের পত্র বা ফলের সাদৃশ্য আছে। সময়ে সময়ে প্রতিযোগী বর্ণেও জীবরক্ষা হয়। দলবদ্ধ জীবজন্তুর জীবন রক্ষার পক্ষে প্রতি-যোগী বর্ণ সহায়তা করে। কাক দিবাচর হইলেও কাল হইয়া সকলেরই এবং তাহাদের পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তাহাতে শত্রুর আবির্ভাব দেখিলেই পরস্পরকে সহায়তা করে। আমি দেখিয়াছি যে এক মালী একটা গাছ হইতে একটা কাকের বাসা ভাঙ্গিয়াছিল, পরে তাহার বাগানে কাজ করা দুরূহ হইয়াছিল। মালী বাহির হইলেই বাগানের ও তন্নিকটবর্ত্তীস্থানের সকল কাক একত্র হইয়া কা কা রবে গগন ফাটাইয়া দিত এবং মালীর মাথায় ঠোকরাইয়া রক্তপাত পর্য্যন্ত করিতে ক্ষান্ত থাকিত না। প্রতিযোগী বর্ণের ঠিক দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও তাহার একান্ত অভাব নাই। চিলের রং পাটকিলে হইবার আমি অন্য কারণ দেখি না—বোধ হয় হিমালয়ের বরফের সাদা রংয়ের প্রতিযোগী অথচ তথাকার মাটির উপযোগী রং এই পাটকিলে। চিলগুলো ঈগল পক্ষীর অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। ঈগল, পেঁচা ও চিল একই জাতীয়, যেমন বাঘ ও বেড়াল। সময়ে ঈগল হৈমবান পর্ব্বত ছাড়িয়া নীচে গরমদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল, তাহারই ফলে বোধ হয় চিল হইয়াছে। কাকের কাল রং যে কেবলই স্বদলকে সাবধান করিবার জন্য তাহা নহে; বোধ হয় তাহাতে আত্মগুপ্তিও হয়—কোকিল গাছের ভিতর থাকিলে কে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে? ইহাও বর্ণ প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত বলিয়া বোধ হয়। পেচার চক্ষু অন্ধকার সহ্য করিতে পারে না। তাহার অবস্থাবিশেষ

জীবনসংগ্রামের ফলে হইয়াছে বোধ হয়। আমি চুয়াডাঙ্গায় এক রকম ছোট জাতীয় পেচা দেখিয়াছি, তাহারা লম্বাচওড়ায় সালিখ পাখীর মত। তাহারা খুব ঘনপত্র গাছের ডালে বসিয়া দিনের বেলায় মানুষকেও ঠোকরাইতে ভীত হয় না। তাহাদের চক্ষু পেচকাকৃতি অনেকটা ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু গায়ের রং সমানই আছে। বোধ হয় এই রং পূর্ব্বে হিমালয়েও যেমন কাজ দিয়াছিল, তেমনি নিম্নদেশেও কাজ দিতেছে। হিমালয়ের কৃষ্ণভল্লুকও বোধ হয় বর্ণ-প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত। সুমেরুবৃত্তের সিন্ধু ঘোটকও বর্ণপ্রতিযোগিতার অপর দৃষ্টান্ত, তাহার বর্ণ সিংহের ন্যায় ধূসর।

এখন কথা হইতেছে যে জীবদিগের শরীরের গঠনের সঙ্গে বর্ণবৈচিত্র্যের কোন সম্বন্ধ আছে কি না। আমার বোধ হয় আছে। তাহা না হইলে এক এক জাতীয় পক্ষী প্রভৃতি জীবের গায়ের একই অংশে একই বর্ণ দেখা যায় কেন? সকল ময়নারই সেই কানের নীচে হলদে, সেই ডানার একটু খানি সাদা। চূড়াওয়ালা কাকাতুয়ার সব সাদা, কেবল চূড়াটুকু হলদে। পশুদেরও এইরূপ শরীরের ভাঁজে ভাঁজে বর্ণবৈচিত্র্য, তাহা লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়। প্রত্যেক বাঘেরই দেহের একই অংশে একই প্রকার ডোরা, আর সেই ডোরাগুলি ঠিক পাঁজরায় পাঁজরায় হইয়া থাকে। যখন এইরূপ একই প্রকার জন্তুর সর্ব্ব অবস্থায় একই বর্ণ আবার তাহারই অপর শ্রেণী জন্তুগুলির সকল অবস্থায় অপর একই বর্ণ, তখন অস্থিগঠনের সহিত বর্ণবৈচিত্র্যের যোগ একেবারে অস্বীকার করা যায় না। গৃহপালিত জীবজন্তুতে বর্ণের এরূপ সমানভাব থাকিতে দেখা যায় না, কেবল স্বাধীন বন্য জন্তুতেই দেখা যায়—তাহাতেই বর্ণের উপকারিতা বিশেষরূপে বুঝা যায়।

বর্ণবৈচিত্র্য সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে সকল কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটীই পশুরাজ্যেও সমভাবে প্রযুজ্য। সুমেরুবৃত্ত বৎসরের অধিকাংশ কাল বরফে আবৃত। আমরা স্বভাবত অনুমান করিতে পারি যে তথাকার জীবজন্তু শ্বেতকায় হইবে। ফলেও তাহাই দেখি। শ্বেত ভল্লুক তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আরও আশ্চর্য্য এই যে সুমেরুবৃত্তের শৃগাল, খরগোস প্রভৃতি কয়েকটী প্রাণী শীতকালে বরফপাত কালে শ্বেতবর্ণ ও গ্রীষ্মকালে নিজেদের স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে ইহাতে বর্ণবৈচিত্র্যের উপকারিতা কেমন প্রত্যক্ষ

হইতেছে। মরুভূমির জীব সমূহের বর্ণ প্রায় একপ্রকার—উষ্ট্র, সিংহ, মরুচারী হরিণ, ইহাদের সকলের রং প্রায় একই প্রকার। প্রজাপতি প্রভৃতি কীটের সম্বন্ধে বলিয়া আসিয়াছি যে খাদ্যশ্রেণী অখাদ্যশ্রেণীর অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। পশুদের মধ্যে গন্ধগোকুল নামক ভোঁদড় জাতীয় জীবের নিকটে কোন শীকারী পশু অথবা মনুষ্য তীব্র গন্ধযুক্ত বিষাক্ত তরল পদার্থ লাভ করিবার ভয়ে সহজে অগ্রসর হয় না। স্কঙ্ক (Skunk) নামক জন্তু তাহারই অনুকরণে নিজের বাহিক আকার গঠিত করিয়া শীকারীর মনে ভীতি উৎপাদন করে। অলস (sloth) নামক জীব যে গাছের ডালে বসিয়া থাকে, তাহার রেখা প্রভৃতির সঙ্গে নিজের বাহিক আকার এমনি মিলাইয়াছে যে ব্যারণ ভন স্লেক বলেন যে তিনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও এই জীবকে তাহার বাসবৃক্ষে পরিচিহ্নিত করিতে পারেন নাই। আফ্রিকার জিরাফ যেরূপ লম্বা লম্বা শুষ্কতৃণপূর্ণ মাঠের উপকণ্ঠবর্ত্তী ভগ্নশাখ বৃক্ষের অরণ্যে বাস করে, তাহার গাত্রবর্ণও ঠিক তদুপযোগী। বাঘের দৃষ্টান্তে বর্ণবৈচিত্র্যের উপকারিতা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। সুন্দরবনের বাঘের গায়ে ডোরা ডোরা দাগ। জ্যোৎস্নারাত্রে মধ্যাহ্নকালে হরিণ প্রভৃতি পশু জল খেতে নদীতীরে আসে। তাহাদিগের শীকারার্থ যে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে ওত করিয়া বাঘ বসিয়া থাকে, তাহাতে এরূপ ডোরা দাগ না হইলে তাহার আহার সংগ্রহ অসম্ভব হইত—ঠিক যেন একটী করিয়া শুষ্ক ঘাসের দাগ আর তাহার পরেই সেই ঘাসের ছায়ারূপী কাল দাগ। আবার চিতাবাঘ ভগ্নশাখ গাছে বেড়ায়, সুতরাং তাহার ডোরা দাগের প্রয়োজন নাই; ভগ্নশাখার অগ্রভাগের ন্যায় গোল গোল দাগ আবশ্যক এবং তাহাই সে লাভ করিয়াছে। আসিয়ার মরুচারী বন্য গর্দভের বর্ণ ধূসর ও রেখাশূন্য, আফ্রিকার জেব্রার গাত্র রেখাময়—বলা বাহুল্য যে অবস্থার উপযোগিতা অনুসারে উভয়ের বিভিন্ন পরিচ্ছদ হইয়াছে। আফ্রিকার সুপ্রসিদ্ধ গোরিলার বর্ণ কাল—জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তাহাদের পরিপার্শ্বের সহিত আপনাদিগকে মিলাইয়া লওয়া আবশ্যক বলিয়া এই কৃষ্ণবর্ণ। আমার বোধ হয় যে সকলেরই যথাপরিমাণে আত্মরক্ষার জন্য আত্মগুপ্তি আবশ্যক। গোরিলাগণ যেরূপ ভীষণ অরণ্যে বিচরণ করে, তাহার উপযোগী কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ নহে। মহিষ ও শূকর কাদায় পড়িয়া থাকে, তাই তাহাদের বর্ণ কাদার রং।

পরিপার্শ্বের সহিত উপযোগিতানুসারেই যে জীবজন্তুদিগের গাত্রবর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, যাদুঘরে রক্ষিত একটী সিংহ হইতে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। এই সিংহের উরুভাগে উপরিস্থ ধূসরবর্ণের নিম্নে অতি দুর্লক্ষ্যভাবে রেখা আছে দেখা যায়। তাহাতেই বুঝা যায় যে সময়ে সিংহ সুন্দরবনের বাঘের উপযুক্ত অবস্থা ও স্থানে বাস করিত, কিন্তু পরে ঘটনাচক্রে তাহাকে মরুবাসী হইতে হইয়াছে। যাদুঘরের এই সিংহটীর ঘাড়েও আবার কেশর নাই। অনেকে বলেন যে সংগ্রামকালে ঘাড়ে ব্যাঘ্র প্রভৃতির দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই কেশর, কিন্তু আমার বোধ হয় যে রৌদ্র হইতে রক্ষা পাইবার উপায় এই কেশর। নচেৎ কুকুর বল, ব্যাঘ্র বল, অধিকাংশ সংগ্রামশীল জন্তু পরস্পরের গ্রীবাতেই সবলে দশনাঘাত করে, তবে তাহাদেরই বা কেশর হয় না কেন?

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে এটুকু বুঝিতে বাকী নাই বোধ হয় যে অধিকাংশস্থলেই অবস্থার উপযোগিতা অনুসারে বর্ণবৈচিত্র্য এবং তাহার ফলে আশ্চর্য্যরূপে জীবরক্ষা সাধিত হইতেছে। অনেক স্থলে হয়তো আমরা বর্ণবৈচিত্র্যের ঠিক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না কিন্তু তাহার যে উপকারিতা আছে তাহা যেন অন্তরে অন্তরে সায় পাই। মানবের মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্যের ফলে যে সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং তাহাতে কোন জাতির পোষমাস ও কোন জাতির সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় তাহার আভাস প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দিয়া আসিয়াছি। আমি এ বিষয়ে আর অধিক বলিব না—কেবল সামাজিক বর্ণভেদের সাহায্যে সমাজরক্ষা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। সেই বৈদিক পুরাকালে অনার্য্যজাতি আর্য্যদিগের বর্ণবিভাগের মধ্যে আসিয়া এবং তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়া সমূল ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল। মধ্যে পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়া স্বীয় কর্ম্মের মর্ম্ম উপলব্ধি করিলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া তথাকার কতকগুলি শূদ্রকে ক্ষত্রিয় করিয়া দিলেন এবং তাহারা উন্নত অধিকার পাইয়া উন্নতি করিতে লাগিল। তিতুমিরের লড়াইয়ে যখন দাড়িগোঁফবিশিষ্ট মুসলমান দেখিলেই ইংরাজেরা বন্দী করিতে লাগিল, তখন মুসলমানেরা অনেকে দাড়িগোঁফ ফেলিয়া গলায় পৈতা পরিয়া "মুইহাঁদু" বলিয়া পরিচয় দিয়া রক্ষা পাইয়াছিল। অল্পদিন হইল সুঁড়ীজাতি পৈতা ধারণ করিয়া

আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছে এবং ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উপাধিতে স্বনাম বিভূষিত করে—বলা বাহুল্য যে এতদিন সমাজ যেরূপ হেয় দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিত, ক্রমে ব্রাহ্মণভ্রমে তাহাদিগকে আর হেয় দৃষ্টিতে দেখিবে না এবং তাহারাও ক্রমে অজানত ব্রাহ্মণের অধিকার ও সম্মান লাভ করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারিবে আশা হয়। আর একথা বলিয়া দিতে হইবে না যে মুসলমানের রাজত্বে হিন্দুরা মুসলমানী আদবকায়দা অবলম্বন করিয়া অনেকস্থলে রক্ষা পাইয়াছিল এবং ইহাও বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্বে হিন্দু মুসলমান উভয়েই ইংরাজী পোষক ও আদবকায়দা অবলম্বন করিয়া নানা স্থলে সম্মান ও সুখ লাভ করিয়া স্বদেশভক্ত ভারতসন্তান অপেক্ষা সর্ব্বরকমে রক্ষা লাভ করিতেছেন। এইরূপ অনুকরণে সুখলাভের দৃষ্টান্ত থাকিলেও আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে মোটের উপর সামাজিক জীবের স্ববর্ণ রক্ষাতেই লাভ।

পরিশেষে একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অনেক জীবতত্ত্ববিদ্ ময়ূরের প্যাকমের এবং আরও নানা পশুপক্ষীর বর্ণ বৈচিত্র্য যৌবন-সঞ্চারিত বর্ণবৈচিত্র্য বোধ করেন, জীবনসংগ্রামজনিত বোধ করেন না। সত্য কথা বলিতে কি, আমি এই কথার প্রকৃত মর্ম ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তুমি বলিবে যে ময়ূরের প্যাকম ও তাহার বর্ণবৈচিত্র্য তাহাদিগের শোভা বৃদ্ধি ও স্ত্রীসংগ্রহের উপায় করিয়া দিতেছে কিন্তু তাহাদের জীবন-রক্ষার সহায়তা করিতেছে না। আমি বলি যে ইহাতে শোভাবৃদ্ধি হেতু যদি স্ত্রীসংগ্রহের উপায় হয়, তাহা হইলেই কি বংশবৃদ্ধি ও তদ্দ্বারা তাহাদের অস্তিত্বরক্ষারও উপায় হইতেছে না? বংশবৃদ্ধি দ্বারা অস্তিত্বরক্ষার কথা আসিলেই বলা বাহুল্য যে তাহা জীবনসংগ্রামের অধীনে আসিয়া পড়িল। বর্ণবৈচিত্র্যের একটু আধটু বৈলক্ষণ্যে যে ভাল বা মন্দ স্ত্রী পাইবে না তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপে যেদিক্ দিয়াই দেখি সকলেতেই জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়া, মৃত্যুর মধ্য দিয়া উন্নতির কার্য্য দেখি, অমৃতের সোপান নিত্য নব নব রচিত হইতে দেখি। আমাদের ভীত হইবার কথা নাই—মঙ্গলময় ভগবান গায়ের প্রতি রেণুতে, প্রতি ইচ্ছার প্রতি অংশে, প্রতি ঘটনায়, প্রতি নিমেষে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া জগত সংসার নিয়মিত করিতেছেন—মাভৈ

রবে গগন ভেদ করিয়া তাঁহারই জয়জয়কার কর। যিনি জীবনসংগ্রাম পাঠাইয়াছেন, যিনি পরিবৃত্তিকে নিয়মিত করিতেছেন, যাঁহার ইঙ্গিতে বর্ণভেদে জীবরক্ষা সাধিত হইতেছে, এবং বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়া আমাদের মনপ্রাণ শীতল হইতেছে, তাঁহারই চরণে অহমিকা সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া আপনাকে নিবেদন করিয়া দাও এবং নিশ্চিন্ত হও, জগতের মঙ্গলচক্র তোমার নিকটে স্বপ্রকাশ হইবে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায়
বর্ণভেদে জীবরক্ষা মূলক ষষ্ঠ কথা সমাপ্ত।

সপ্তম কথা—ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার।

শান্তিময় হরির রাজ্যে অশান্তি, শান্তির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিতেছেন সংগ্রামের—ইহা এক প্রহেলিকা। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, অধর্ম্মের ভিতরেও ধর্ম্ম, শান্তির উদ্দেশ্যে সংগ্রাম, সংগ্রামের ফলে শান্তি, এইরূপ বিপরীত পদার্থের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ জগতের একটা ধারা, ইহা এক প্রহেলিকা। গীতা আমাদিগকে যে দ্বন্দ্বের অতীত হইতে উপদেশ দিয়াছেন, সেই দ্বন্দ্বই সংসারের জীবন, প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সংসারের প্রকৃতি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করিয়া আমাদিগকে দ্বন্দ্বের অতীত হইতে হইবে, ইহাও এক প্রহেলিকা। প্রতি-পদে সংগ্রাম করিতে হইবে, সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাকিতে হইবে। সংগ্রাম বিনা উন্নতি নাই, সংগ্রাম বিনা জীবনই থাকিতে পারে না। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে অন্তঃশত্রু বা বহিঃশত্রু, অন্তরের রিপুগণ অথবা বাহিরের রোগশোক, কোন না কোন শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে। ইহা ব্যতীত কীট পতঙ্গ অবধি মানব পর্য্যন্ত প্রাণীগণের পরস্পরের মধ্যে জগতের রাজত্ব লইয়া অহর্নিশি জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য নিয়মের আশ্চর্য্য ফল এই যে, এই জীবনসংগ্রামেই আবার তাহাদের উন্নতি ও অভিব্যক্তি অন্তর্নিহিত। মৃত্যুর সোপান সংরচন করিয়া অমৃতে উঠিতে হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছি যে ভগবানের এক এক ইঙ্গিতের বলে কত রাশি রাশি ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। পরমাণুসমূহে এক বিকর্ষণ শক্তি অর্পণ করিয়াছেন তাহার ফলে কতশত গ্রহ উপগ্রহ নিত্য উৎপন্ন হইতেছে। সেইরূপ ভগবান জীবনসংগ্রামরূপ এক ইঙ্গিতের বলে প্রাণরাজ্যে নিত্য কত পরিবর্ত্তন সম্পাদন করিতেছেন, তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? এক জীবনসংগ্রামের ফলে প্রাণীগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হইতেছে; এক জীবনসংগ্রামেরই ফলে প্রাণীগণের বর্ণবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য বিধান হইতেছে; আবার সেই জীবনসংগ্রামেরই কার্য্যকারিতায় এই বর্ণবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য, এই শরীর ও মনের অভিব্যক্ত ও উন্নত গঠনাবর্ত্তন

ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা যাহাকে জড় পদার্থ বলি, সেই সকলের ভিতরেও যে জীবনসংগ্রাম কার্য্য না করিতেছে কে বলিতে পারে? কয়লা যখন অভিব্যক্ত হইয়া হীরকে পরিণত হয়, কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে ইহার মধ্যে জীবনসংগ্রামের কার্য্যকারিতা নাই? যখন ভূপৃষ্ঠে এক স্তরের উপর অপর এক স্তর জমিয়া নিজের আধিপত্য বিস্তার করে, যখন সুন্দরবনের ন্যায় এককালে জনাকীর্ণ জনপদ সকল সাগরের করায়ত্ত হইয়া পুনরায় ধীরে ধীরে সাগরগর্ভ হইতে মুখোত্তোলন করিবার চেষ্টা করিতেছে, কে সিদ্ধান্তপূর্ব্বক বলিতে পারে যে এই সকল ঘটনার ভিতরে জীবনসংগ্রাম কার্য্য করে নাই? একই মহাপ্রাণ হইতে যখন এই "প্রাণ করে চলাচল," তখন জড় বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে কি না বড়ই বিচার্য্য বিষয়—জড় ও প্রাণের মধ্যে প্রভেদ রেখা কে নির্ণয় করিবে? নানাপ্রকার চেষ্টা হইলেও কৃত্রিম উপায়ে শ্রেষ্ঠতম "জলের" হীরক আজ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয় নাই, হীরকের জীবন দিতে পারে নাই, তাহার নকল হইতে পারে। জীবাদি প্রাণপঙ্কের অম্লজান প্রভৃতি উপকরণ মিলিত করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক তাহার পঙ্কিলভাব প্রভৃতি অনুকরণ করিয়াছেন কিন্তু চেতনের জীবন তাহাতে আনিতে পারেন নাই।

যাই হোক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে, সচরাচর যাহাকে প্রাণ আখ্যা দেওয়া যায় সেই প্রাণরাজ্যের বর্ণবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য এবং শারীরিক ও মস্তিষ্কের গঠনাবর্ত্তন ও তদানুষঙ্গিক মানসিক ভাবোন্নতি কিপ্রকারে ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল অথবা পড়িবার সম্ভাবনা, তাহারই সম্বন্ধে দুচারিটী কথা আলোচনা করিব। পৃথিবী সূর্য্য হইতে বিক্ষিপ্ত হইবার পর অবধি ভূপৃষ্ঠ যতকাল পর্য্যন্ত বাষ্পময় অথবা প্রাণধারণের অনুপযোগী অত্যুত্তপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, সেই কালটুকু সম্বন্ধে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। এই বিক্ষিপ্ত হওয়া অবধি প্রাণের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালকে আমরা আর্কেয় (Archœan) যুগ বলিব। প্রাণের আবির্ভাব অবধি সমেরু মৎস্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে আমরা শম্বূকযুগ (Cambrian) আখ্যা দিলাম। এই শম্বূকযুগ অবধিই জীবের অভিব্যক্তি ও তৎসহায় জীবনসংগ্রামের সম্বন্ধ একপ্রকার প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে দেখিয়া আসিয়াছি যে জীবনসংগ্রামের কার্য্য-কারিতায় জীবাদি হইতে ক্রমে মানবের অভিব্যক্তি হওয়া সম্ভব। যত বড় বৈজ্ঞানিক হউক না কেন, কেহই বলিতে পারেন না যে তিনি জীবাদি হইতে মোলস্ক, মোলস্ক হইতে শম্বুক, শম্বুক হইতে মৎস্য ইত্যাদিরূপে মানব পর্য্যন্ত কাহারও সত্যসত্য অভিব্যক্তি সংঘটিত হইতে দেখিয়াছেন। ইতিহাস আলোচনা করিয়া যতদূর দেখা যায়, তাহাতে বলা যাইতে পারে যে ঐতিহাসিক কাল অর্থাৎ আনুমানিক অন্তত দশহাজার বৎসরের ভিতরে ভূপৃষ্ঠের জীবসমূহের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এ অবস্থায় শতবর্ষ পরমায়ুর মধ্যে মনুষ্য যে জীবাদি হইতে মানবের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিবে তাহা অসম্ভব। যেমন অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া অথবা জীবনসংগ্রামের ফলে জীবগণের মধ্যে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভ করা মনুষ্যের অল্পায়ুর পক্ষে অসম্ভব, সেইরূপ জীবাদি অবধি মনুষ্য পর্য্যন্ত জীবসকলের ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃতিরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া মনুষ্যের ক্ষুদ্র পরমায়ুর পক্ষে অসম্ভব। রসায়ন, জ্যোতিষ প্রভৃতি ভৌতিক বিজ্ঞান সকলকে সংগণিত বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে—ইংরাজিতে এই সকলকে exact science বলে। এই সকল বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই কার্য্য অধিক, অনুমানের কার্য্য অল্প। এতটুকু অম্লজানের সহিত অতটুকু অজ্ঞান মিলিত হইলে তবে জলে পরিণত হয়। হলুদে ও সাদা রং মিলিত হইলে লাল রং হয়। এই সকলের ভিতরে অনুমানের কার্য্য নাই, সকলই সংগণিত অর্থাৎ এমন কথা বলিবার উপায় নাই যে এই দুইটী মিলিত হইলে উহা হইবে না, সকলই এক প্রকার গণিয়া ঠিক করা হইয়াছে বলা যায়। জ্যোতিষশাস্ত্রে সংগণিত বিজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কোথায় কোন্ তারা কোন্ পথে ঘুরিবে ইত্যাদি কথা ঠিক করিয়া বলা যায়, কেবল সেই গণনার ভিতরে অনুমানের কার্য্য এক বিন্দু-নাই। তবে এই সংগণিত বিজ্ঞান সমূহেও কয়েক বিষয়ে যে অনুমান একবারে কার্য্য করে না তাহা নহে। আমরা এখানে দেখি যে লৌহ উত্তপ্ত হইলে এক প্রকার রশ্মিজাল বিস্তার করে, স্বর্ণ একপ্রকার, রৌপ্য একপ্রকার, এই প্রকারে বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন রশ্মিজাল প্রকাশ করে—ইহা এই পৃথিবীতেই পরীক্ষিত হইয়াছে। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া আমরা

দূরবর্ত্তী গ্রহনক্ষত্রের রশ্মিবিশ্লেষণ করিয়া অনুমান করি যে অমুক গ্রহে এই পদার্থ আছে, অমুক নক্ষত্রে অমুক পদার্থ আছে। এই অনুমানকে আমরা সিদ্ধান্তমূলক অনুমান বলিতে পারি। এই স্থলে অবশ্য আমরা বলিতে পারি যে সম্ভবত এই অনুমানের ভিতরে ভ্রান্তি নাই। সকল স্থলে সে কথা বলা যায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি সিদ্ধান্তমূলক অনুমান বা অনুমানমূলক সিদ্ধান্তের উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কোন চিকিৎসকই রোগের নিদান ও চিকিৎসা একেবারে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন না। অভিব্যক্তিবাদও বর্ত্তমানে এই প্রকার সিদ্ধান্তমূলক অনুমান অথবা অনুমানমূলক সিদ্ধান্তের উপরেই বলিতে গেলে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে জীবগণের মধ্যে পরিবৃত্তি কার্য্য করে এবং জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন হয়। তাহার পরে দেখি যে ভূগর্ভে স্তরে স্তরে উন্নত হইতে উন্নততর জীবের কঙ্কালাবশেষ পাওয়া যায়। এই সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত হইতে অনুমান করিলাম যে পরিবৃত্তি ও জীবনসংগ্রামের সহায়তায় নিম্নতম জীব হইতে মানবের অভিব্যক্তি হওয়া সম্ভব। জীববিজ্ঞানের সাহায্যে অভিব্যক্তিবাদ আলোচনা করিয়া যতদূর বুঝা যায় তাঁহাতে এই অনুমান মূলত অভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। ঘোটকের বংশাবলীর নিদর্শন পাইয়াই পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একপ্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছেন।

জীবের অভিব্যক্তির ন্যায় ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসারও প্রমাণের জন্য সিদ্ধান্তমূলক অনুমানের উপর দণ্ডায়মান। শতবর্ষ পরমায়ু লইয়া মানব ইহা বলিতে পারে না যে ভূপৃষ্ঠের যেখানে যত জীবের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে সকলই সে দেখিয়াছে। ইতিহাস অবলম্বনে আমরা প্রাণপ্রসারের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীলণ্ড যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন সেখানে শূকর প্রভৃতি দেখা যায় নাই, তাহার পর জাহাজের সাহায্যে গিয়া পড়িয়া এখন শূকর, খরগোস, ইন্দুর প্রভৃতি জীব এবং কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে ; দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম আবিষ্কার কালে তথায় বলদ, ঘোটক প্রভৃতির সম্পূর্ণ অভাব ছিল, কিন্তু ঔপনিবেশিকগণ সেখানে এই সকল জীব লইয়া যাওয়ায় এখন তাহারা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া বন্য অবস্থায় পরিণত ; উত্তর আমেরিকায় চড়ুই ছিল না, তথায় কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমদানী হইয়া

অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে হয়তো আশিয়া ও ইউরোপের যে স্তরে একপ্রকার জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়, আমেরিকার পরবর্ত্তী স্তরে তাহা দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে বোধ হয় যে ইউরাশীয় দেশ হইতে আমেরিকায় এই জীবের আমদানী ঘটিয়াছিল। আবার হয়তো ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র একই স্তরে জীববিশেষের কঙ্কাল পাওয়া যায়—ইহাতে অনুমান হয় যে যদি এক স্থলে এই জীবের প্রথম জন্ম হইয়া থাকে, তবে ইহা বিস্তৃত হইয়া সময়ে ভূপৃষ্ঠ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর অভিব্যক্তিবাদীগণ সিদ্ধান্তমূলক অনুমান করেন যে আদিম-কালে ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার ঘটিয়াছিল ও এখনও ঘটিতেছে। হইতে পারে যে, সময়ে সমস্ত প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া ভূতত্ত্ব এবং তৎসঙ্গে অভিব্যক্তিবাদ সংগণিত বিজ্ঞানের মধ্যে পরিগণিত হইবে, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাদের অধিকাংশই অনুমানের উপর চলিতেছে।

অভিব্যক্তিবাদীগণের মতে ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার ও জীবের অভিব্যক্তি পরস্পরসম্বদ্ধ। তাঁহারা বলেন যে, যে প্রাণীর যত অধিক প্রসার হইবে, সেই প্রাণীর অভিব্যক্তি তত শীঘ্র ও স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা এবং অল্প স্থানে প্রসার হইলে অভিব্যক্তি বিলম্বে ও অস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা। একটা সহজ দৃষ্টান্তেই ইহা বুঝা যাইতে পারে। ভূপৃষ্ঠের যেখানে যত মানবজাতি আছে, যদি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অবাধ আদানপ্রদান চলিত তাহা হইলে সহজেই এক অভিনব মানবজাতি অভিব্যক্ত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে অধিকাংশ দেশেই এরূপ জাতিসংমিশ্রণের পক্ষে যেরূপ অর্গল দেওয়া আছে, তাহাতে সেই অভিনব মানবের অভিব্যক্তি এখনও বহুকালসাপেক্ষ। বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশে এক এক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি, আবার তাহাদেরই মধ্যে বিভাগ কত। আমরা দেখি যে বন্য জীবজন্তুদিগের ভিতরে এত ভেদজ্ঞান নাই—যত নিম্নদিকে যাওয়া যায় ততই ভেদজ্ঞান কম দেখা যায়। নিম্ন প্রাণীদের প্রসারও অধিক স্থানব্যাপী হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে নিম্ন প্রাণীদের মধ্যে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন কিছু শীঘ্র শীঘ্র ঘটে। প্রসার অল্প-স্থানব্যাপী হইলে যে অভিব্যক্তি-প্রসারও অল্প হয়, তাহার প্রমাণ,—নিউ-জীলণ্ড ও ম্যাডাগাস্কার দ্বীপদ্বয়ের প্রাণীবর্গ। ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে নিম্নতম

স্তন্যপায়ীর নানাপ্রকার ভেদমাত্র দৃষ্ট হয়, উচ্চশ্রেণীর স্তন্যপায়ী একটীও দৃষ্ট হয় না। আবার নিউজীলণ্ডে মাত্র একপ্রকার স্তন্যপায়ী দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহার ভূতপূর্ব্ব অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই দ্বীপে মাত্র একপ্রকার উভচর ভেক পাওয়া যায়। যেখানে আবার অভিব্যক্তির প্রসার অল্প দেখা যায়, সেখানে অভিব্যক্তিবাদীগণ ধরিয়া লয়েন যে প্রাণপ্রসার অল্পস্থানব্যাপী হইয়াছে। মনে কর জলেও আগুন নিভিয়া যায়, বাতাসেও নিভিয়া যায়; এখন যদি কোন স্থলে বাতাস জোরে বহিবার কোন লক্ষণ দেখা না যায়, অথচ সেইস্থলে নির্ব্বাপিত বহ্নির নিকটে জলের চিহ্ন দেখা যায়, তাহা হইলে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে জলের দ্বারা বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। সেইরূপ একদিকে ম্যাডাগাস্কার প্রভৃতি মহাদেশের সন্নিহিত দ্বীপ সমূহে উন্নত জীবের অভাব এবং পৃথিবীর বিপরীত খণ্ডে একই শ্রেণীর জীবের অস্তিত্ব দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে এক সময়ে ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র প্রাণীগণের অবাধ যাতায়াত ছিল, কেবল যে সকল ভূখণ্ড সাগরের খাঁড়ি দ্বারা যে সময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেই সময় অবধি সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে অবাধ গতিবিধি বন্ধ হইয়া গেল এবং অগত্যা তথায় অভিব্যক্তিরও মুক্তগতি রুদ্ধ হইয়া গেল। এই রুদ্ধগতি অভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড এবং ম্যাডাগাস্কার প্রভৃতি দ্বীপসমূহে।

এইবারে সিদ্ধান্তমূলক অনুমানের সাহায্যে ভূতত্ত্ব অবলম্বনে দেখা যাউক যে ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার কি প্রণালীতে সংঘটিত হইয়াছিল। পৃথিবীর কেন্দ্র পর্য্যন্ত খনন করিয়া জীবসমূহের কঙ্কাল অন্বেষণ করা মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ ভগবান পৃথিবীতে জ্ঞানবিস্তারের জন্য নানা উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। ভূগর্ভে অগ্ন্যুৎপাতজনিত কার্য্যের ফলে কত স্থল উৎক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে এবং কত স্থল বসিয়া গিয়া হ্রদ প্রভৃতি গভীর খাদে পরিণত হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বত ও হ্রদ বলিতে গেলে ভূতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের পক্ষে অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার। দু একটী হ্রদ শুকাইয়া যাওয়াতে তাহার তলস্থ স্তর পরীক্ষার সহজ বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। সেইরূপ অনেক পর্ব্বতের উপরিভাগও সহজেই পরীক্ষা করিবার উপায় আছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কয়েকটী শুষ্ক হ্রদের নিম্নতম স্তর এবং অনেকগুলি

পর্ব্বতের উপরিতন স্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উভয়ত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোলস্ক (mollusk) জাতীয় শম্বূক সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়, এই কারণে পর্ব্বতের সেই উপরিতন স্তরই জীবোৎপত্তির উপযুক্ত সর্ব্বপ্রথম স্তর বলিয়া উক্ত হয়। দেখা গিয়াছে যে ভূপৃষ্টের প্রায় সর্ব্বত্রই এই মোলস্কের কঙ্কাল আছে। এই মোলস্কগণ সাগরিক জীব, অতএব অনুমিত হয় যে অতি আদিম কালে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ প্রায় সাগরগর্ভে নিমগ্ন ছিল। মোলস্কের আধুনিক বংশধরগণ নিতান্ত শীতদেশে বাঁচিতে পারে না দেখা যায়। এই কারণের সহিত অন্যান্য কারণের সামঞ্জস্য করিয়া অনুমান করা হয় যে শম্বূক যুগে আমেরু সমগ্র ভূপৃষ্ঠ অত্যন্ত উষ্ণ ছিল। সেই আদিম কালে মোলস্ক প্রভৃতি শম্বূকের সহিত বাহিরের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না, তাহাদের আপনাদেরই মধ্যে জীবনসংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার ফলে তাহারা আকারে প্রকারে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরে যখনই স্থান ও আহারের সংকুলানের অভাব হইতে লাগিল, তখনই অভিব্যক্তিরও কার্য্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মোলস্কগণ নির্ম্মেরু মাংসল জীব, কিন্তু মোলস্ক যে স্তরে দেখা যায়, ঠিক তাহার পর স্তরে অর্দ্ধ মোলস্ক ও অর্দ্ধ শম্বূক জীব (বৈজ্ঞানিকগণ যদিও সেই সকল জীবকে মোলস্কেরই অন্তর্গত করিয়াছেন) এবং তাহার পরে পুরা শম্বূক দেখা যায়। শম্বূকগণ গুপ্তি ও রক্ষার জন্য একপ্রকার চূর্ণপ্রধান খোলস লাভ করিয়াছে। একজাতীয় মোলস্ক আছে তাহারা নিজেদের খোলস ছাড়িয়া অপরের পরিত্যক্ত খোলসে আবশ্যক হইলে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করে। শম্বূকগণ আবার মোলস্কের স্থানে আকারে প্রকারে বৃদ্ধি পাইল। শিরঃপদী, বাহুপদী প্রভৃতি শ্রেণীতে তাহারা বিভক্ত হইয়া থাকে। শম্বূক সকল যখন বহুকাল বিলুপ্ত হইবার পর বরাহ প্রভৃতি বৃহৎকায় স্তন্যপায়ীদিগের রাজত্ব কাল আসিয়াছিল, সেই সময়ের একটী শিরঃপদী শম্বূকের প্রশীল কঙ্কাল কলিকাতাস্থ যাদুঘরে রক্ষিত আছে, তাহার আকার দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই শম্বূকযুগে কৃকলাসের পূর্ব্বপুরুষ ত্রিবলি শম্বূকের শ্রেণীভেদের চিত্র দেখিলেও পরিবৃত্তি ও অভি-ব্যক্তির কার্য্যকারিতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভূপৃষ্ঠকে নানা স্তরে সংগঠিত বলিয়া সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন। সেই এক একটী স্তরের আদর্শ জীব বা পদার্থ হইতে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে যে দুই তিনটী স্তরের সাধারণ প্রধান আদর্শ পদার্থ বা প্রাণী একই, সেই কারণে পণ্ডিতেরা দুই তিনটী স্তরের সংগঠন কাল লইয়া এক এক যুগ ধরিয়াছেন এবং সেই সাধারণ আদর্শ পদার্থ বা প্রাণী হইতে যুগ সকলের নামকরণ করিয়াছেন। এক একটী স্তর সংগঠন কালে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত, ভীষণ প্লাবন প্রভৃতি ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপ্লবের লক্ষণ সকল দেখা যায়। আবার এক একটী স্তরের সংগঠনকালও বড় অল্প নহে, কোটী কোটী বৎসর, লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এক একটী স্তর সংগঠিত হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তিন চার যুগে বিভক্ত হইয়া থাকে। আর্কেয় যুগের (Paleozoic) পর আমি যদিও শম্বূক যুগের কথা বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু অনেকের মতে ইহা মৎস্য যুগের একটী স্তর মাত্র। মৎস্য যুগের আদর্শ জীব একপ্রকার বৃহৎশল্ক মৎস্য। মৎস্যযুগের দ্বিতীয় স্তর শৈবাল স্তর (lower Silurian)। এই স্তরে সাগরিক শৈবালের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য। তৃতীয় স্তরে পর্ণীর (Fern) বাহুল্য। আমরা অনুমান করিতে পারি যে শৈবাল হইতে পর্ণী সকল অভিব্যক্ত হইয়াছে। শম্বূক ও শৈবাল, এই দুই স্তরের ত্রিবলি (Trilobite) শম্বূকের চিত্র দেখিলেই অভিব্যক্তির কার্য্য কতকটা সুস্পষ্ট হইবে। এই আদিম কালের একটী লক্ষণ এই দেখা যায় যে এক এক স্তরে যে জীব বা উদ্ভিদের প্রশীল(Fossil) কঙ্কাল পাওয়া যায়, তাহা পৃথিবীর এক স্থানে আবদ্ধ ছিল না, বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবে ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র এককালে ছাইয়া ফেলিত। শৈবাল স্তরে কড়ি, স্পঞ্জ প্রভৃতিরও অস্তিত্ব দেখা যায়। সাগরগর্ভের কয়েক অংশে প্রবাল দেখা দিয়াছিল। তারামাছেরও কঙ্কাল এই স্তরে পাওয়া গিয়াছে। এই স্তরে কাঁকড়াবিছা এবং একপ্রকার উচ্চিংড়া পাওয়া গিয়াছে। পর্ণীস্তরে পুষ্পহীন পর্ণীজাতীয় বৃক্ষের বাহুল্য থাকিলেও তদানীন্তন উচ্চভূমিতে পাইন বৃক্ষ যে জন্মাইত তাহার দুই একটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই স্তরে কীট পতঙ্গ অনেক প্রকার আবির্ভূত হইয়াছিল। স্থলশম্বূকেরও চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই পর্ণী (Upper Silurian) স্তরে বৃহৎশল্ক মৎস্যের আবির্ভাব। পূর্ব্ব-স্তরের সহিত এই স্তরের ত্রিবলির আকার আলোচনা করিলেই অভিব্যক্তির কার্য্য

বুঝা যাইবে। মৎস্যযুগের চতুর্থ স্তর অঙ্গার স্তর (carboniferous)। এই স্তরের প্রধান লক্ষণ অঙ্গার—স্থানে স্থানে এই স্তর ২০ হাজার ফুট কিন্তু সচরাচর ৬০০০ ফুট স্থূল দেখা যায়। পর্ণীস্তরেই ভূপৃষ্ঠের অনেক অংশ সাগরগর্ভ হইতে জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার কতক অংশে অঙ্গারস্তরকালে অভিব্যক্তির ফলে ৫০।৬০ হাত উচ্চ পর্ণী প্রভৃতি বৃক্ষের অরণ্য হইয়াছিল। ভূগর্ভের অগ্নু্যৎপাতী কার্য্যে সেই সকল অরণ্য ধীরে ধীরে নিখাত হইয়া সেই আদিম কালের ভূগর্ভ ও ভূপৃষ্ঠ উভয়ের উত্তাপের মধ্যে একপ্রকার দমে বসিয়া অঙ্গারাকার ধারণ করিয়াছিল। ত্রিবলি এই সময়ে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম যে এক একটী স্তর গঠিত হইতে কোটী কোটী লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ৬০ ফুট অঙ্গারস্তর গঠিত হইতে এক লক্ষ বাইশ হাজার চারশত বৎসর লাগে। গড়ে ৬০০০ ফুট এই স্তরের স্থূলতা ধরিলে আমরা বলিতে পারি যে কেবলমাত্র এই একটী স্তর সংগঠিত হইতে এক কোটী বাইশ লক্ষ চল্লিশ হাজার বৎসর লাগিয়াছে। মৎস্যযুগের পঞ্চম ও শেষ স্তর মৎস্য (Permian) স্তর। এই স্তরে একপ্রকার মৎস্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহার অর্দ্ধভাগ অস্থি ও অপরার্দ্ধ কঠিন চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। এই স্তরে মৎস্য ও সরীসৃপের সংযোগী শৃঙ্খল প্রথম দৃষ্ট হয়, এই সংযোগী শৃঙ্খলের দাঁত অনেকটা কুমীরে দাঁত; কিন্তু অঙ্গার-স্তরে ক্ষুদ্রকায় পঞ্চাঙ্গুলি একপ্রকার অপরূপ টিকটিকির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার দাঁত তখনও সরীসৃপের আকার অবলম্বন করে নাই। চতুর্থ স্তর অবধি উভচর প্রাণীর সৃষ্টি দেখা যায়। উদ্ভিজ্জ পর্ণীরও আবির্ভাব এই স্তরে। মোটের উপর সমগ্র মৎস্যযুগে ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ ও আবহাওয়া আমেরুবিষুব প্রায় একই রকম ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতাও এই সময় অবধি বাড়িতে চলিয়াছে।

মৎস্যযুগের পরবর্ত্তী দুই তিনটী স্তরে সরীসৃপেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কূর্ম্মই এই যুগের আদর্শ জীব। ভূমিজ পর্ণীর পরিবর্ত্তে উদ্ভিজ্জ পর্ণীরই কূর্ম্মযুগের (Mesozoic) প্রথম স্তরে বিশেষ বাহুল্য। কর্দ্দমাক্ত বালুময় ভূমির উপযুক্ত বগড়া (cycad) বৃক্ষের বড়ই প্রাবল্য। এই স্তরে তিন ক্ষুদ্র স্তরের অস্তিত্ব দেখা যায় বলিয়া ইহার নাম ত্রিস্তর (Triassic) রাখা হইয়াছে। এই স্তরে নানাপ্রকার আদিম সরীসৃপ দেখা দিয়াছিল। এক শ্রেণীর সরীসৃপের
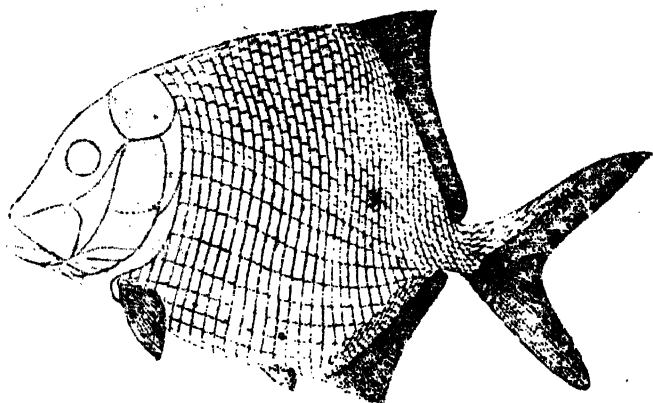
১৩শ চিত্র।
মৎস্যযুগের মৎস্যাবতার।
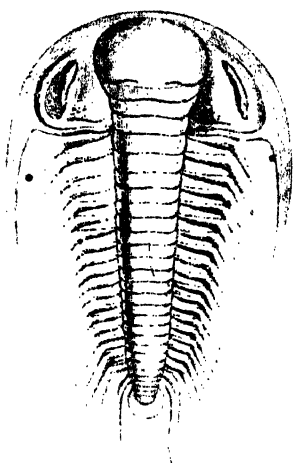
১৪শ চিত্র।
শম্বূক যুগের ত্রিবলি।
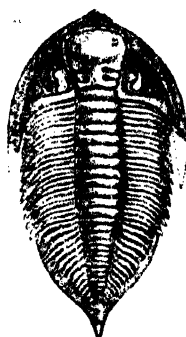
১৫শ চিত্র।
শৈবাল স্তরের ত্রিবলি।
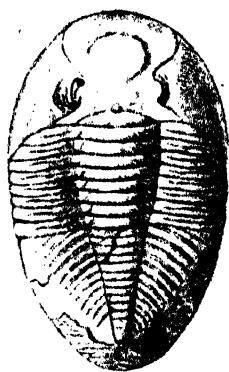
১৬শ চিত্র।
পর্ণী স্তরের ত্রিবলি।

অঃ বাঃ পৃঃ—৭৮।

১৭শ চিত্র।
মৎস্য ও সরীসৃপের সংযোগী শৃঙ্খল
(স্বাভাবিক আকৃতি)।

অঃ বাঃ পৃঃ—৭৮।
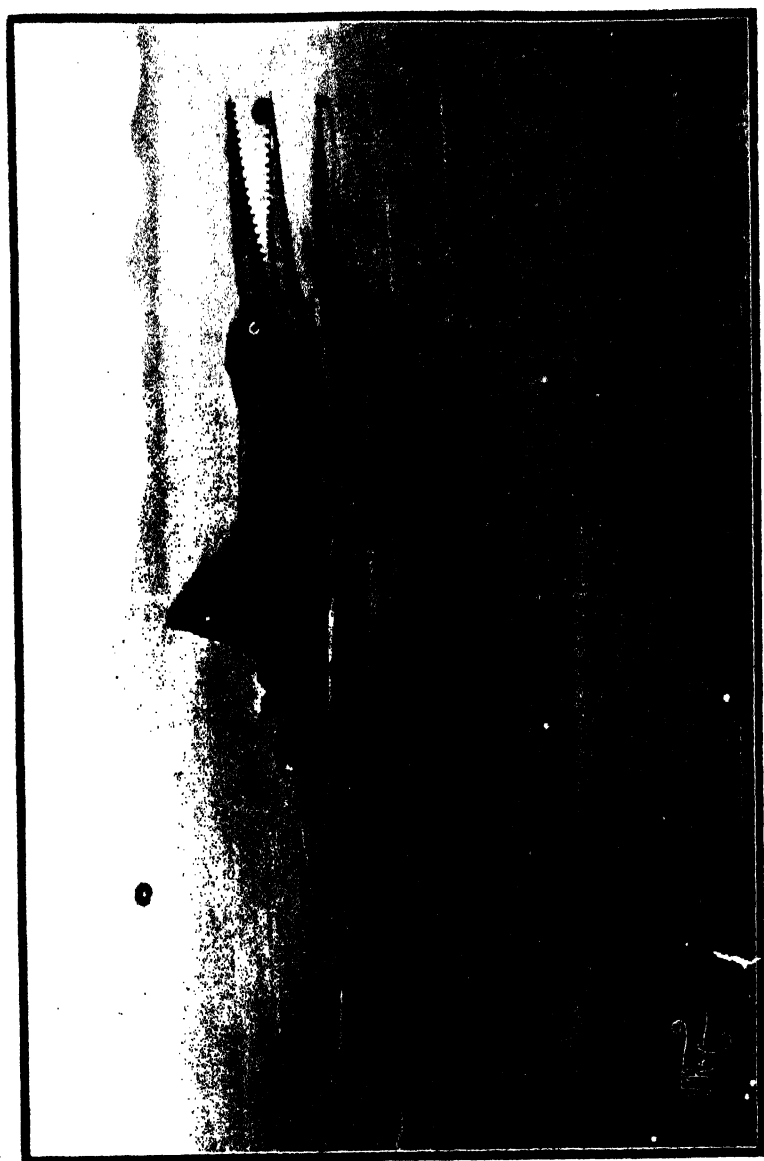
১৮শ চিত্র।

মৎস্য কূর্ম্ম।

অঃ বাঃ পৃঃ ৭১।

১৯শ চিত্র।

লম্বগ্রীব কূর্ম্ম।

অ: বা: পৃ: ৭[illegible]।

২০শ চিত্র।

উৎসর্প কূর্ম্ম। (Pterodactyl.)

অ: বা: পৃ: ৭৯।

২১শ চিত্র।

বৃহৎ গোধা—(২৫ ফুট লম্বা)।

অ: বা: পৃ: ৭৯।

আকার কূর্ম্মের ন্যায় এবং চোয়াল পক্ষীচঞ্চুর ন্যায় ছুঁচালো। আর এক শ্রেণীর চোয়ালে দুইটা প্রকাণ্ড দন্ত। ইহারাই সরীসৃপ ও পক্ষীর সংযোগী শৃঙ্খল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা প্রায় পশ্চাতের পদদ্বয়ে চলিত। প্রথম কোষপায়ী জীব এই স্তরেই দেখা যায়। কোষপায়ী জীবই স্তন্যপায়ী জীবের পূর্ব্বপুরুষ। মৎস্যের প্রাদুর্ভাব অবধি মেরুজীবের আরম্ভ, আবার কোষপায়ী জীব অবধি স্তন্যপায়ী জীবের আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। এই স্তর পর্য্যন্ত মোটামুটি আবহাওয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমান ছিল, সুতরাং ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র প্রধান প্রধান প্রাণীগণের প্রসারের পক্ষে কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তী স্তরের কাল হইতেই ঋতুপরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইবার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্তর সরীসৃপ-প্রধান। বলা বাহুল্য যে এই যুগে সরীসৃপের প্রাদুর্ভাব হেতু ত্রিবলি শম্বূক, বৃহৎশল্ক মৎস্য প্রভৃতি জলচর প্রাণীর বহুলপরিমাণে বিলোপসাধন হইয়াছিল। এই স্তরে জলে, স্থলে ও আকাশে সর্ব্বত্র সরীসৃপেরই রাজত্ব। দুই প্রকার সিন্ধুকূর্ম্মের এই স্তরে বড়ই ব্যাপ্তি দেখা যায়। মৎস্যকূর্ম্ম (Ichthyosaurus) দৈর্ঘ্যে ২৪ ফুট, তাহার গ্রীবা অস্ফুট, সাঁতার কাটিবার জন্য দুইটী পাখনা, চক্ষু প্রকাণ্ড ও অস্থিসংবৃত, মস্তক কৃকলাসের ন্যায়, দন্ত কুম্ভীরের ন্যায়, দেহ ও লাঙ্গুল চতুষ্পদ জীবের মত, অস্থিগ্রন্থি মৎস্যের ন্যায় এবং পাখনা দুইটী তিমির মত। শল্কী মৎস্য ইহার প্রিয় খাদ্য ছিল। লম্বগ্রীব কূর্ম্ম (Plesiosaurus) আরও অদ্ভুত। ইহার মস্তক কৃকলাসের ন্যায়, দন্ত কুম্ভীরের ন্যায়, গলা রাজহংসের ন্যায় অথচ অনেক লম্বা, পঞ্জর সরীসৃপের মত, চারটী পাখনা তিমির মত। ইহারা সাগরের উপকূলে বেড়াইত বলিয়াই স্পষ্ট অনুমান হয়। আর একপ্রকার এই স্তরের অদ্ভুত জীব উৎসর্প কূর্ম্ম (Pterosaurus) ইহার ভাবভঙ্গী কতকটা বাদুড়ের মত। ইহার ঠোঁট কুক্কুটের মত লম্বা, দন্ত কুমীরের ওষ্ঠাগ্রস্থিত দন্তের মত, অস্থিগ্রন্থি, পঞ্জর ও পদাঙ্গি কৃকলাসের মত। ইহার ডানা আছে কিন্তু তাহার অঙ্গের কুত্রাপি না আছে পাখীর মত পালক, না আছে বাদুড়ের মত লোম। ইহার মূলমূল অস্থির গঠন সরীসৃপজাতীয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ত্রিস্তরে সরীসৃপ ও পক্ষীর সংযোগী শৃঙ্খল পাওয়া যায়। সরীসৃপস্তরে সরীসৃপগণ আকারে ও প্রকারে অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ইহার এক শ্রেণী দৈর্ঘ্যে ২৫ ফুট এবং ইহারা

অত্যন্ত মোটা মোটা পশ্চাৎপদের উপর দাঁড়াইয়া চলিত। আর এক শ্রেণীর দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট, ক্ষুদ্রদেহ; ইহাদের গ্রীবা ও লেজ লম্বা, মাথা ছোট, পাগুলি নিতান্ত সূক্ষ্ম নহে—এক একটী পায়ের ছাপ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এক গজ। সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড বৈহগকূর্ম দৈর্ঘ্যে ১০০ ফুট ও প্রস্থে ৩০ ফুট। এই স্তরেই সর্ব্বপ্রথম পক্ষীর অস্তিত্ব দেখা যায়—বর্ত্তমান পক্ষী হইতে তাহার অনেক প্রভেদ এবং সরীসৃপের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। সেই সকল পক্ষীর চোয়ালে দাঁত, টিকটিকির মত লম্বা লেজ এবং প্রতি অস্থিগ্রন্থিতে দুইটী করিয়া পালক। এই সকল আলোচনা করিয়া কে অস্বীকার করিবে যে সরীসৃপ হইতে পক্ষীর উৎপত্তি হয় নাই? অপোসম জাতীয় কোষপায়ী জীবের দন্ত ও চোয়াল এই স্তরে পাওয়া গিয়াছে। কূর্মযুগের তৃতীয় খটিক স্তরে এই সকল বৃহৎকায় সরীসৃপ একদিকে কুম্ভীরাদি, অপরদিকে অষ্ট্রীচ পক্ষীর পূর্ব্বপুরুষের জন্মদান করিয়া অন্তর্হিত হইল। বৈহগ কূর্মের সর্ব্বশেষ বংশধরের নাম বিহগনোদন (Iguanodon)—ইহারা উভচর ও উদ্ভিদাশী। এই স্তরে প্রচুর সিন্ধুসর্প দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণী সিন্ধুসর্পের দেহ ৪০ ফুট লম্বা ও তাহার গলা ২০ ফুট উচ্চ। এই স্তরে উদ্ভিদ সকলের গঠনাবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত জটিল দেখা যায়, আর কেবল পর্ণীত্ব নাই। এই যুগেও ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ প্রায় সমানই ছিল, কেবল শেষভাগে সুমেরুকেন্দ্রে অন্ধকার হইত, কিন্তু তথায় এখনও বরফ পড়ে নাই।

এই যুগ পর্য্যন্ত ভূগর্ভের আলোড়ন বেশ রীতিমতই চলিয়াছিল। সেই আলোড়ন ও সমুদ্রের লবণজলের কার্য্যফলে ম্যাডাগাস্কার, নিউজীলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ মহাদেশ হইতে এই যুগেরই কোন সময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ম্যাডাগাস্কার আফ্রিকার অত্যন্ত সন্নিহিত হইলেও উভয়ের প্রাণরাজ্যে অত্যন্ত প্রভেদ দৃষ্ট হয়। আফ্রিকার পরিচায়ক স্তন্যপায়ী, পক্ষী প্রভৃতি কিছুই উক্তদ্বীপে নাই বলিলেও চলে। উভয়ের মধ্যস্থিত সাগরাংশের গভীরতা ন্যূনাধিক ৪০০০ হাত। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীলণ্ডের মধ্যে ৮০০০ হাতেরও অধিক গভীর সাগরশাখা ব্যবধান থাকিলেও শেষোক্ত দ্বীপের উত্তর পশ্চিম কোণে ৪০০০ হাত গভীরতা পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল দ্বীপের কোন দিকে সাগরশাখা ন্যূনাধিক ৪০০০ হাত গভীর দৃষ্ট হয়, সেই সকল দ্বীপ নিশ্চয়ই

২২শ চিত্র।

স্থূলপদ গোধা—(৫০ ফুট লম্বা)।

২৩শ চিত্র।

বিহগনোদন।

অঃ বাঃ পৃঃ ৮০।
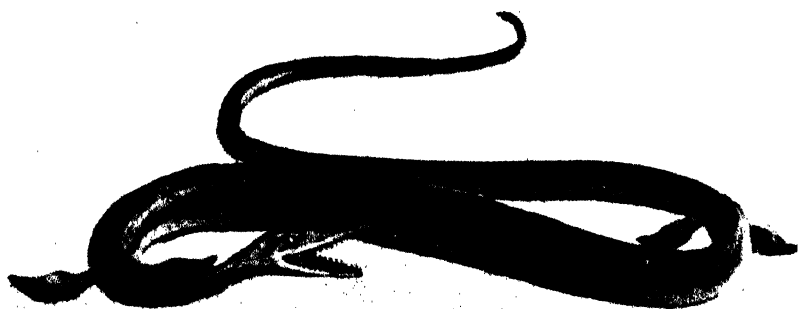
২৪শ চিত্র।

সিন্ধুসর্প।

অঃ বাঃ পৃঃ ৮০।

সময়ে মহাদেশের সহিত কোন না কোন স্থানে সংলগ্ন ছিল। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতে সমগ্র ভূমিখণ্ড একবার সাগরগর্ভে নিলীন আর একবার জাগ্রত হইয়াছিল, এইপ্রকারে যে কতবার মহাপ্লাবন ও মহাজাগরণ হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। আধুনিক অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে তাহা সম্ভবপর নহে। সাগরপৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূমিপৃষ্ঠ গড়ে ২২৫০ ফুট উচ্চ এবং সাগরের গভীরতা গড়ে ১৪৬৪০ ফুট। এ অবস্থায় যদি ভূমি সাগরে নিলীন হয়, তাহা হইলে তাহার উপর দুই মাইল উচ্চে সাগরজল উঠিবে। এই প্রকার ভূমিখণ্ড বারম্বার দৃশ্যাদৃশ্য হইলে আমরা প্রতিবার নূতন করিয়া জলজ শম্বুকাদির উৎপত্তি দেখিতে পাইতাম কিন্তু আমরা মোলস্ক অবধি সরীসৃপ, পক্ষী প্রভৃতির ধীরে ধীরে অভিব্যক্তি দেখিয়া আসিলাম এবং পরেও দেখিতে পাইব যে মানবের অভিব্যক্তি কিরূপে সাধিত হইয়াছে। একই স্তরে পৃথিবীর এক অংশে যে এক প্রকার জীব এবং অন্য অংশে তাহা হইতে বিসদৃশ জীব দেখা যায় তাহা নহে —পৃথিবীর সকল অংশেই সমস্তরে প্রায় সদৃশ ও আত্মীয় জীবেরই অস্তিত্ব দেখা যায়। ইহাও মহাপ্লাবনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। নদীপ্রবাহিত কর্দ্দমপর্ব্বতের সেই আদিকালাবধি অস্তিত্বও ইহার বিরোধী। মহাপ্লাবন না ঘটিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লাবন অথবা ক্ষয়কার্য্য যে ঘটে নাই তাহা নহে। পণ্ডিতেরা ৪০০০ হাতের গভীরতা এবং অন্যান্য প্রমাণ অবলম্বনে স্থির করিয়াছেন যে পূর্ব্বে বৃটেন ও ইউরোপ সংলগ্ন ছিল, এমন কি আইসল্যাণ্ডও ইউরোপের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল। এই সকল অনুমিতসংযোগ দ্বীপসমূহেই কেবল পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি জীবজন্তুর আধিক্য দেখা যায়।

ঠিক যে কোন্ জীবের অভিব্যক্তিতে বরাহের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু কূর্মযুগের পরবর্ত্তী যুগে (Tertiary or Cainozoic) স্থূলচর্ম্মী বরাহেরই প্রাদুর্ভাব দেখি। বরাহ বলিতে যে বর্ত্তমান বরাহ বুঝিতে হইবে তাহা নহে। বরাহ যুগে স্থূলচর্ম্মী জীবের আকারে প্রকারে বহুল ব্যাপ্তি হইয়াছিল, বরাহকেই বলিতে গেলে তাহাদের আদর্শ স্বরূপে ধরা যাইতে পারে। এই যুগাবধি ভূগর্ভের কোন বিরাট আলোড়নের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই যুগের তিন স্তর—আদি, মধ্য ও অন্ত। আদি স্তর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে গ্রীষ্মঋতুরই একমাত্র রাজত্ব ছিল। কিন্তু ঋতুবিভাগ ক্রমেই পরিস্ফুট হইতেছিল। এই স্তরে

হিমালয় প্রায় বর্ত্তমান উত্তুঙ্গতা লাভ করে। এই স্তরে নানা প্রকার প্রাণীর আবির্ভাব দেখা যায়। এই সময়ে বিড়াল, শার্দুল, বাদুড় প্রভৃতি এবং বিশেষত শূকর জাতীয় জীবের প্রাদুর্ভাব। মাংসাশীগণ এখনও অধিকাংশই কোষপায়ী। এই স্তরেই বর্ত্তমান ঘোড়ার পূর্ব্বপুরুষ প্রথম পাওয়া গিয়াছে—ইহা টেপার ও ঘোড়ার মধ্যবর্ত্তী শৃঙ্খল ও শৃগালের ন্যায় ক্ষুদ্রকায়। মধ্যস্তরের বিশেষ জীব চতুর্দন্ত ঐরাবত (Mastodon) ও বক্রদন্ত হস্তী। মনুষ্যেতর জীবজন্তুতে পরিবৃতা হইয়া ধরিত্রীমাতা আনন্দে হাস্যবদনা। স্থূলচর্ম্মী জীবেরই বিশেষ প্রাদুর্ভাব। এই স্তরে যখন বানর পাওয়া যায়, তখন অনুমান হয় যে অন্তত আদি-স্তরেই বানরের পূর্ব্বপুরুষের অভিব্যক্তি হইয়াছিল, এবং তাহা হইতে এক রেখা বানর প্রভৃতির দিকে গেল, অপর রেখা মানবের অভিব্যক্তির দিকে গেল। উত্তরাখণ্ড শীতপ্রধান হইতে থাকিলেও ইহার পরবর্ত্তী স্তর পর্য্যন্ত জীবগণের সুমেরু খণ্ডে যাইবার কোন বাধা ছিল না—তখনও বরফে তাহা আচ্ছন্ন হয় নাই। শেষ স্তরে বৃহৎকায় ঐরাবত প্রভৃতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এই স্তরের শেষভাগে উত্তরাংশ শীতল হইতে লাগিল ও পর স্তরে তুষারে আবৃত হইয়া গেল। আমরা এই তুষারাবরণ কাল অবধি বামনাবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী নৃসিংহযুগ ধরিলাম। নৃসিংহযুগের সহিত মানবের অভিব্যক্তির বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এই কারণে তাহার বিষয় যথাস্থানে বলিব। নৃসিংহ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত প্রকৃত পক্ষে মানুষের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, সুতরাং অন্যান্য প্রাণীগণের মধ্যে একটা তীব্রতম জীবনসংগ্রাম ও তাহাদিগের বৃদ্ধির পক্ষে কঠোরতম বাধা পড়ে নাই। তাহারা আপনাপন ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া যথানিয়মে অভিব্যক্তির নিয়মাধীন হইতে লাগিল। ধরিতে গেলে মানুষের ন্যায় হিংস্রক জীব দ্বিতীয় নাই। মানুষ নিজের সুখের জন্য অপ্রয়োজনে শত শত প্রাণী বধ করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু অপরাপর প্রাণী আত্মরক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনে পড়িয়া সংগ্রামে উদ্যত হয়। মানুষ শত্রুপক্ষকে জব্দ করিবার জন্য হয়তো শত শত নদী জলাশয় বিষাক্ত করিয়া রাশি রাশি প্রাণীর বধের কারণ হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না, এরূপ "গ্রাম উজাড়" পূর্ব্বক বধসাধনে একমাত্র মানুষেই অগ্রসর হয়। মাথার টুপিতে পালক দিলে ভাল দেখায় মনে করিয়া কত নিরীহ পক্ষীর হত্যা হইতেছে।

২৫শ চিত্র।

বক্রদন্ত হস্তীর মস্তক।

অঃ বাঃ পৃঃ ৮২।
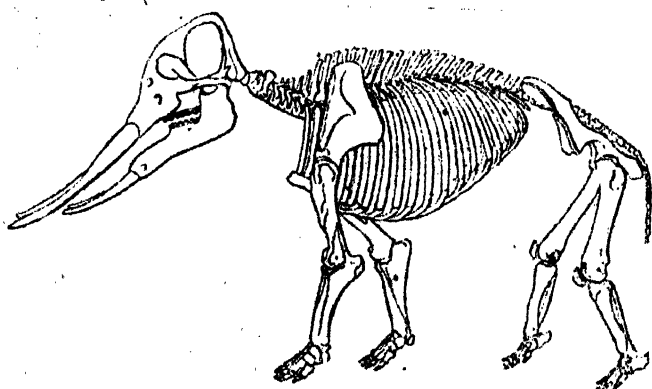
২৬শ চিত্র।

চতুর্দন্ত ঐরাবত।

অঃ বাঃ পৃঃ ৮২।

২৭শ চিত্র।

তুয়াতাবা—($\frac{১}{৪}$ আকৃতি)।

অঃ বাঃ পুঃ—৮৩।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে ভূতত্ত্ব অবলম্বনে প্রাণপ্রসার ও জীবের অভিব্যক্তি সমর্থন করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া আসিলাম। এইবারে আমাদের ঋষিরাও যে অভিব্যক্তিবাদে নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন না তাহাই দুইচারি কথায় প্রদর্শন করিব। ঋষিরা ব্রহ্মবিদ্যাকে রূপকল্পনা দ্বারা আচ্ছন্ন রাখিয়াছেন তাহা তাঁহারা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। সেইরূপ আমরা দেখিতেছি যে তাঁহারা তাঁহাদের অবতার কল্পনার ভিতরেও ভূতত্ত্ব ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান কল্পের, প্রথম অবতার করিলেন মৎস্য। মৎস্যাবতারের পৌরাণিক কথা হইতে আমরা অনুমান করি যে তখন দাক্ষিণাত্য জাগ্রত ছিল এবং ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ মৎস্যের ক্রমশ আবির্ভাব হইয়াছিল। হিমালয়ও বোধ হয় তখন মস্তক উত্তোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় অবতার হইল কূর্ম। কূর্মাবতার কথা হইতে অনুমিত হয় যে কূর্মযুগে উত্তরাখণ্ড বা মেরুসন্নিহিত প্রদেশ সাগরগর্ভে একবার প্রবেশ করিয়াছিল এবং ভূগর্ভের অতি প্রকাণ্ড আলোড়ন ও অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়াছিল। সেই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নানা স্থানের উন্নতি ও অবনতি ঘটিয়া উন্নত ভূমিতে ঐরাবত, ঘোড়া, গোরু প্রভৃতি জন্মাইবার অবসর হইয়াছিল। বোধ হয় দাক্ষিণাত্যে কূর্মযুগের স্তরে এই সকলের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। কূর্ম্ম-গণের জীবনসংগ্রামে শত্রু শম্বূক ও মৎস্য অবস্থাবৈগুণ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এই যুগে নীলকণ্ঠ নামক ত্রিতার (ত্রিনয়ন) কোন সরীসৃপের আবির্ভাব হইয়াছিল, সম্ভবত সেই সরীসৃপের প্রধান খাদ্য বিষাক্ত বায়ু। আজও নিউজীলণ্ডে ত্রিনয়ন একপ্রকার সরীসৃপ পাওয়া যায়, তথাকার অধীবাসীদের ভাষায় তাহাকে "তুয়াতারা" (Tuatara) বলে। হয়গ্রীব মৎস্য এবং সিংহি-কানন্দন অথবা সিংহাকৃতি রাহু নামক একজাতীয় শম্বূক সম্ভবত বাঁচিয়া গিয়াছিল। বরাহাবতার কথা হইতে উপলব্ধি হয় যে বরাহযুগের পূর্ব্বে পৃথিবীর অনেকটা সাগরপ্লাবিত ছিল। অতি ক্ষুদ্রকায় বরাহ কোন জীবের উৎপত্তি হইয়া ক্রমশ অতি বৃহৎকায় আদিবরাহের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল। বরাহযুগের জীবগণের সহিত তাহাদের শত্রু সরীসৃপ দৈত্যগণের জীবনসংগ্রামে দৈত্যগণই পরাস্ত হইল—এক শ্রেণীর সরীসৃপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। বলা বাহুল্য যে বরাহযুগে বরাহবংশের অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবী ভরিয়া গিয়া-

ছিল, অবশেষে কালিকাপুরাণের মত সত্য হইলে অষ্টপদ শলভ তাহাদিগকে স্বীয় খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিনাশসাধন পূর্ব্বক পৃথিবীকে মানবের আবাসের উপযুক্ত করিয়া দিল। যে যুগে যে জীব অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের প্রধান জীব তাহার জীবনসংগ্রামে শত্রু বলিয়া সম্ভবত দৈত্য প্রভৃতি আখ্যা পাইয়াছিল।

আমরা দেখিয়া আসিলাম যে কি প্রাচ্য ঋষি, কি পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিৎ, সকলেরই মতে যুগে যুগে প্রাণপ্রসার ও অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই প্রাণপ্রসারের প্রণালী কি? প্রাণপ্রসার ঘটিল কিরূপে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বরাহযুগ পর্য্যন্ত আমেরুবিষুব ভূখণ্ডে গ্রীষ্ম ঋতুরই রাজত্ব ছিল। ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণ প্রদর্শন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবরে অসম্ভব—তাহার জন্য ভূতত্ত্ব বিষয়ক একটী পৃথক্ গ্রন্থপ্রকাশ আবশ্যক। মেরু পর্য্যন্ত জীবগণের যাতায়াত অবাধ ছিল। যাতায়াত অবাধ ছিল বলি কেন, আমাদের বিশ্বাস সুমেরুবৃত্তেই প্রথম জীবের উৎপত্তি এবং মানব পর্য্যন্ত সকল জীবেরই পূর্ব্বপুরুষের প্রথম উৎপত্তি সুমেরুবৃত্তে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে যখন মেরু প্রদেশে কিঞ্চিৎ চাপা হইতে লাগিল, তখন সুমেরুবৃত্তই যে প্রথম জীবোৎপত্তির উপযুক্ত হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। কুমেরুবৃত্তেও জীবোৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সম্ভবত অন্য কোন কারণে দক্ষিণ দিকটাই জলপূর্ণ থাকিয়া উত্তরদিকের ন্যায় প্রাণীর আবাস স্থানের তেমন উপযুক্ত হইতে পারে নাই। কুমেরুবৃত্তে যে তিমি মৎস্য পাওয়া যায়, তাহার মস্তকই সার সম্ভবত উপযুক্ত সময়ে সুমেরু হইতে কুমেরুতে গিয়া তিমি মৎস্য অনাহারে সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলমস্তক আকার লাভ করিয়াছে। আমাদেরও শাস্ত্রে দক্ষিণ দিকটাকে মৃত্যুর দিক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের প্রবাদেও তাহাই চলিয়া আসিয়াছে। আমার এই উপপত্তি স্বীকার করিলে অনেক আপাতবিসদৃশ ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে প্রাণীবৈসাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক কেন? উভয় মহাদেশের উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত গভীর—উভয় দেশের চতুর্হস্ত বানর জাতির মধ্যে একটী শ্রেণীও অন্যোন্যসাধারণ নাই। আফ্রিকাতে ছুছুন্দরী ও তৎপরিবারের শজারু প্রভৃতি কীটভুক্ প্রাণী পাওয়া

যায়, দক্ষিণ আমেরিকায় তাহা পাওয়া যায় না। আবার দক্ষিণ আমেরিকায় বর্মিল (Armadillo) প্রভৃতি অদন্তক প্রাণী পাওয়া যায়, আফ্রিকায় তাহা পাওয়া যায় না। উভয় দেশে পক্ষীজাতির মধ্যেও কোন সাধারণ শ্রেণী দেখা যায় না। উভয় দেশেই কয়েকবিধ অন্তর্জাত (indigenous) পক্ষীর নানা শ্রেণী ও বর্গ অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল ঘটনা হইতে বুঝিতে পারি যে উভয়দেশ সাগরগর্ভ হইতে জাগ্রত হওয়া অবধি সাগরব্যবহিত ছিল, সংলগ্ন ছিল না। আরও অনুমান করি যে কূর্মযুগে সরীসৃপ স্তরে অথবা তৎপূর্ব্বে সরীসৃপ সকল সাগর ভেদ করিয়া উভয় দেশে যাতায়াত করিত, কিন্তু তদভিব্যক্ত স্থলজ জীবজন্তু সকলের যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল। অথবা আমাদের বিশ্বাস যে সুমেরুবৃত্তে কূর্মাভিধেয় সরীসৃপ সকল উৎপন্ন হইয়া কতকগুলি দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়া বসতি পূর্ব্বক একপ্রকারে অভিব্যক্ত হইল, কতকগুলি আফ্রিকায় উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন প্রকারে অভিব্যক্ত হইল। সম্ভবত আমেরিকা অঞ্চলের সুমেরুবৃত্তে বর্মিল জন্মগ্রহণ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় বিশ্রাম স্থান লাভ করিয়া এবং ইউরাশীয় অঞ্চলের সুমেরুবৃত্তে শজারু প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া আশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি প্রাচ্য মহাদেশে বিস্তৃত হইয়া অভিব্যক্তির সহায়তা করিয়াছিল। উত্তরে ক্রমেই শীত পড়িতেছিল, ইহা ও অন্যান্য কারণে অনুমান হয় যে উত্তর হইতে জীবজন্তু নীচে নামিয়াছিল, কিন্তু নীচেকার জীবজন্তুর উপরে যাইবার বিশেষ কোন প্রমাণ বা পরিচয় পাই না। আবার উত্তর আমেরিকায় আমরা স্কঙ্ক (skunk), গণ্ডকোষী (pouched) ইন্দুর এবং টর্কী (turkey) পাই, আশিয়ায় পাই না এবং আশিয়ারও ছোট শূকর, শজারু, মাছিধরা পাখী (flycatcher) এবং ময়ূর জাতি আমেরিকায় পাই না। ইহা হইতেও বুঝিতেছি যে সুমেরুবৃত্ত দিয়া যাতায়াত ছিল না, নচেৎ উভয় দেশেই এই সকল জীব পরস্পরসাধারণ হইত নিঃসন্দেহ। আমাদের অনুমান যে স্কঙ্ক প্রভৃতি উত্তর আমেরিকার বিশেষ প্রাণীগণের পূর্ব্বপুরুষ সেই অঞ্চলের সুমেরুবৃত্তে জন্মাইয়া উক্তদেশে উপযোগী আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং ছোট শূকর প্রভৃতি আশিয়ার বিশেষ জীব এই অঞ্চলের সুমেরুবৃত্তে জন্মাইয়া আশিয়াতেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। যে সকল বিশেষ বিশেষ জীবের উল্লেখ করিয়া আসিলাম, ইহারা এত ক্ষুদ্রকায়

যে, যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিত সেই অঞ্চলে সম্মুখে বিচারণভূমি প্রাপ্ত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই তাহাদের পক্ষে সম্ভব, অপর কোন অঞ্চলে আহার অন্বেষণে যাওয়া ততটা সম্ভবপর নহে।

আরও কয়েকটী ঘটনা আমদিগের এই উপপত্তিকে যথেষ্ট সমর্থন করিবে। আমেরিকা ও ইউরাশীয়, উভয় মহাদেশেই একই সময়ে চতুর্দ্দন্ত ঐরাবতের আবির্ভাব দেখি; তন্মধ্যে ইউরাশীয় ঐরাবত হিমানীযুগের সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত হস্তীর জন্মদান করিল, কিন্তু আমেরিকায় ঐরাবত ইউরাশীয় হইতে আরও দু'এক স্তর বাঁচিয়া থাকিয়া একেবারেই বিলুপ্ত হইল। ইহাতে বোধ হয় আমেরিকা ঐরাবতের উপযুক্ত হয় নাই, কিন্তু স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে সুমেরুবৃত্ত হইতে উভয় দেশেই ইহাদের আমদানী হইয়াছিল। টেপার পশু পাওয়া যায় মালয় দ্বীপপুঞ্জে এবং আমেরিকায়। দক্ষিণ আশিয়া হইতে সুমেরু ঘুরিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছান কল্পনা করিবার অপেক্ষা সুমেরু-বৃত্তে টেপারের জন্ম লাভ এবং তথা হইতে ইউরাশীয় ও আমেরিকা, দুইদিকে বিস্তৃতি অনুমান করা কি সহজ ও সঙ্গত নহে? একদিকে সুসভ্য মনুষ্যের তাড়নায় টেপার সুমাত্রা প্রভৃতি মালয় দ্বীপে তাড়িত হইল এবং অপরদিকে দক্ষিণ আমেরিকায় তাড়িত হইয়া টেপার মনুষ্যবিরল প্রদেশে বাস করিতে লাগিল। আশিয়ায় উষ্ট্র এবং আমেরিকায় লামাজাতি সম্বন্ধেও আমাদের একই কথা, কেবল উষ্ট্র মরুভূমির উপযুক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হইল এবং লামা পর্ব্বতারোহণের উপযুক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হইল। গরু, ঘোটক, ভল্লুক প্রভৃতি অপরাপর জীবসম্বন্ধেও ঐ একই বক্তব্য। সুমেরু বৃত্তের নিম্নে যে আমদানী ব্যতীত আপনাপনি জীবের অভিব্যক্তি ঘটে নাই, তাহার প্রমাণ ঐতিহাসিক কালে প্রাণপ্রসারের দৃষ্টান্তেই দিয়া রাখিয়াছি। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীলণ্ডে শূকর, খরগোস প্রভৃতি জীব জাহাজ প্রভৃতির সাহায্যে আনীত হইয়া অতি অল্প দিনেই বাড়িয়া উঠিয়াছে; দক্ষিণ আমেরিকায় ঘোটক ও বলদ এবং উত্তর আমেরিকায় চড়ুই আমদানী হইয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যখন এই সকল দেশ যথাযথোক্ত প্রাণীগণের উপযুক্ত দেখা যাইতেছে, তখন এই সকল জীব ইতিপূর্ব্বে কেন সেখানে অভিব্যক্ত হয় নাই? কারণ স্পষ্ট যে তাহারা ইতিপূর্ব্বে তথায় পৌছিতে পারে নাই। হিমানীযুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

সুমেরুবৃত্ত যে জীবের প্রধান উৎপত্তি স্থান ছিল, সেই উপপত্তি উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে একপ্রকার সিদ্ধান্তকল্প হইয়াছে দেখিতেছি। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিলে আফ্রিকা ও আমেরিকা-সংযোজক এক মহান্ ভূমিখণ্ডের কল্পনা করিবার কোনই প্রয়োজন হইবে না।

বৃহৎকায় প্রাণীগণের প্রসারপ্রণালী বলিলাম, কিন্তু উদ্ভিদ বীজ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় প্রাণীদিগেরও সুন্দর প্রসারপ্রণালী আছে—উপায়সমূহের মধ্যে বায়ু প্রধান। যে বায়ু প্রভঞ্জনরূপে লৌহশৃঙ্খল ভগ্ন করে, সেই বায়ু যে উদ্ভিদ বীজ সকল উড়াইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাইতে সক্ষম তাহা বলা বাহুল্য। এমনও হয় যে একস্থানের উদ্ভিদবীজ অপর স্থানে বায়ুচালিত হইয়া স্বয়ং রোপিত হইল, আবার সেই সকল উদ্ভিদের বীজ সময়ক্রমে বায়ুচালিত হইয়া আরও দূরে নীত হইল। এইরূপে সুমেরুবৃত্ত হইতে যে জাবা দ্বীপে উদ্ভিদবীজ নীত হইয়া সজাতীয় বৃক্ষের উৎপাদন করিতে সক্ষম তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। ওয়ালেস সাংঘাই নগরের এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। জীবজন্তুর পদসংলগ্ন মৃত্তিকাবলম্বনেও অনেক উদ্ভিদবীজ স্থানান্তরিত হয়। বায়ুর কার্য্যের একটী দৃষ্টান্ত দিই। বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ১২০ মাইল পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে, এ অবস্থায় সর্ষপবীজের ন্যায় ক্ষুদ্র বীজ সকল যে ১২ ঘণ্টাব্যাপী এক ঝড়ে ১০০০ মাইলের অধিক উড়িয়া যাইতে পারে বলা বাহুল্য। কীটপতঙ্গও এইরূপে দেশদেশান্তরে অনায়াসে নীত হইতে পারে। দেখা গিয়াছে বায়ুবলে ১৮ হাজার ফুট উচ্চে কীট পতঙ্গ উন্নীত হইয়াছে—অত উচ্চে কোন প্রভঞ্জন বায়ুর মুখে পড়িলে হাজার হাজার মাইল উড়িয়া গিয়া কি পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে না? ইহা ব্যতীত নৌকাতে নদী প্রবাহিত বৃক্ষসমূহে ডিম্বাকারেও কীট পতঙ্গ স্থানান্তরিত হয়। যত নিম্ন স্তরের জীব, তত অধিক শাবক প্রসব করে। কীটাদির উৎপাদিকা-শক্তি এত বেশী যে সহস্র বৎসরে একবার কয়েকটী কীট একস্থানে গিয়া পড়িলেই তাহা অচিরে পূর্ণ হইবার ভাবনা থাকে না।

এই অধ্যায়ে দেখিলাম যে ভূগর্ভের আলোড়নের ফলে মূলত পৃথিবীর আকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রাণপ্রসার ও জীবের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে এবং সেই প্রাণপ্রসারের প্রণালী কি। এই প্রাণপ্রসার আলোচনা কালে একটী

বিশেষ বিষয় লক্ষ্য হয় এই যে প্রত্যেক স্তরের প্রাণী সহসা খুবই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জীবনসংগ্রামের ফলে প্রায়ই পরবর্ত্তী স্তরে হয় একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায় অথবা অধিকতর আবর্ত্তিত-মস্তিষ্ক ও অভিব্যক্ত হইলেও আকারে প্রকারে ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। শম্বূকের কালে প্রকাণ্ডকায় শম্বূক রাজত্ব করিত, মৎস্য তাহাকে পরাস্ত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে উপযোগী প্রকাণ্ডদেহ ধারণ করিল; মৎস্যকে পরাস্ত করিয়া অভূতপূর্ব্ব বৃহৎকায় কূর্ম্মগণের আবির্ভাব; কূর্ম্মের পরাজয়ে বরাহ ও ঐরাবতগণের রাজত্ব। যে সকল শম্বূক, কূর্ম্ম, মৎস্য প্রভৃতি আত্মরক্ষা করিয়া উদ্বৃত্ত রহিল, তাহাদের দেহগঠন তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত দৃষ্ট হয়। এই সকল দেখিয়া আর কি বলিতে পারি—"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং আশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ" কেহ বা আশ্চর্য্য হইয়া ভগবানের মহিমা দর্শন করেন, কেহ বা তাঁহার মহিমা আশ্চর্য্যভাবে ব্যক্ত করেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায়
ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার মূলক সপ্তম কথা সমাপ্ত।

অষ্টম কথা—মানব শরীরের অভিব্যক্তি।

এতস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে হে গার্গি দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। "আমাদের পদতলে যে এই ভূলোক এবং মস্তকের উপরে যে দ্যুলোক, সকলই সেই মঙ্গল স্বরূপ বিশ্বপাতার প্রশাসনে নিয়ত স্থিতি করিতেছে। তাহাদের এক কণামাত্রও তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না।" যাঁহার আদেশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রের পরিভ্রমণ নিয়মিত হইতেছে, যাঁহার আদেশে এখনও এই আকাশে নিত্য নব নব গ্রহনক্ষত্রের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সাধিত হইতেছে, তাঁহারই আদেশে জীবনসংগ্রামও এই পৃথিবীতে নিয়মিত হইতেছে।

পূর্ব্ব অধ্যায় পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি যে জীবাদি হইতে বরাহ প্রভৃতি উচ্চতর জীবের অভিব্যক্তি আদতেই অসম্ভব নহে, প্রত্যুত সম্ভব। অভিব্যক্তিবাদের এতদূর পর্য্যন্ত আজকাল বড় বেশী আপত্তি উত্থাপিত হয় না। বানরজাতীয় কোন নিম্নতর জীব হইতে মানবের অভিব্যক্তির কথা উঠাইলেই যত আপত্তি আসিয়া পড়ে। আসল কথা এই যে, যে মানব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা আপনার আয়ত্ত করিতেছে, আত্মাতে অন্তরাত্মার আসন সংরচিত করিতেছে; প্রকৃতির নূতন নূতন শক্তিকে যে মানব বুদ্ধিবলে আবিষ্কার করিয়া স্বকার্য্য সাধনে নিরত করিতেছে, সেই মানবের পূর্ব্বপুরুষ যে বানরজাতীয় কোন নরকপি, একটা পশু, একথা শুনিতে ও বিশ্বাস করিতে লোকের ভাল লাগে না। জীবনসংগ্রামের ফল এমনি আশ্চর্য্য যে অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ দেখিলেও বিশ্বাস করিতে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। উত্তর আমেরিকায় যে জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইয়া তথাকার আদিম অধিবাসীগণ একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গেল, অতি বিস্তৃত একটা মানবজাতির অস্তিত্বই গেল, একথা সহজে কি বিশ্বাস হয়—বিশ্বাস না করিলে নিরুপায় বলিয়াই করিতে হয়।

নিম্নতর জীব হইতে মানবের অভিব্যক্তির অসম্ভাবনীয়তা যে কোথায়

তাহাতো কিছুই বুঝিতে পারি না, বরঞ্চ সম্ভাবনাই প্রতিপদে দেখিতে পাই ; আত্মা, বুদ্ধি বা ভাবা প্রভৃতি মানুষের যে সকল বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়, সেগুলি ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র শরীরের তুলনা করিলে মানুষ ও গরিলা প্রভৃতি নিম্নতর নরকপিগণের এবং সেই নরকপিগণের ও বানর প্রভৃতির এবং বানর ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে এমন কি কিছু বিশেষ বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়,—বোধ হয় তো না। যেটুকু বৈসাদৃশ্য দেখা যায়, সেইটুকুই তো অভিব্যক্তির সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সিংহেরও মস্তক আছে, বানরেরও মস্তক আছে, গরিলারও মস্তক আছে, আবার মানুষেরও মস্তক আছে ; সেইরূপ সকলেরই হাত আছে, পা আছে, উদর আছে ইত্যাদি। মোটের উপর বলা যায় যে মনুষ্যও অন্যান্য জীবজন্তুদিগের সহিত সাধারণ-ধর্ম্মী শরীর বিশিষ্ট একপ্রকার জীব মাত্র। এই মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের মস্তক আছে বটে কিন্তু তাহাদের করোটীতে বিস্তর প্রভেদ আছে। মনুষ্যজীবেরই করোটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও তদনুরূপ মস্তিষ্ক-পরিপূর্ণ ; গরিলার তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, বানরের আরও ক্ষুদ্র, সিংহের আরও ছোট। এই কয়টা জীবের বিষয় আমি কেবল দৃষ্টান্ত হিসাবে বলিয়া আসিলাম। মস্তকের ন্যায় এই সকল জীবের হস্তপদাদি থাকিলেও উহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। গরিলার হাত মানুষের চেয়ে লম্বা, আঙ্গুলগুলো বড় বড় ; বানরের হাত প্রায় তদনুরূপ, অল্প বিভিন্ন ; কিন্তু সিংহ প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুদের হাত আর হস্তনামের যোগ্য নহে, সম্পূর্ণরূপে পদ নামেরই উপযুক্ত এবং তদনুরূপই গঠিত। অপর কোন গ্রহ হইতে উন্নততর মানব আসিলে যখন দেখিতে পান যে মৎস্যেও কীটপতঙ্গ মুখ দিয়া আহার করে, সরীসৃপ, কূর্ম প্রভৃতিও মুখ দিয়া আহার করে, এবং বরাহ প্রভৃতি মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই মুখ দিয়া আহার করে, সকলেরই মধ্যে অন্যান্য অঙ্গ ও তাহাদের কার্য্যের একটা সাদৃশ্য ও শৃঙ্খলা আছে, তখন মনুষ্য যে পৃথিবীস্থ জীবসমূহের একটী শ্রেণীমাত্র, নিঃসন্দেহ এইরূপ ধারণা হইবে। করোটী প্রভৃতি বিষয়ক প্রভেদের বিষয় বলিলাম, আমানব জীবগণের মস্তিষ্কেও সাদৃশ্য ও প্রভেদ দেখা যায়। মস্তিষ্ক জিনিষটী সকল জীবেরই সমান, তবে পরিমাণে ও আবর্ত্তন-রেখায় প্রভেদ দেখা যায়। মানুষেরই মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং নিম্ন হইতে নিম্নতর জীবে পরিমাণ ক্রমানুসারে
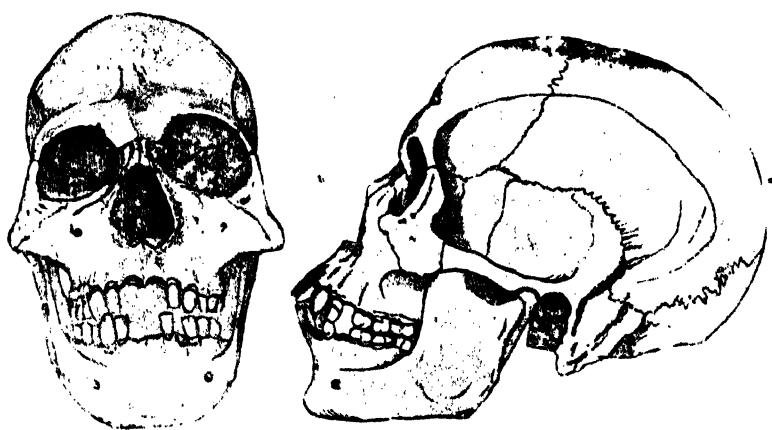
২৯শ চিত্র।

নিগ্রো করোটী পার্শ্ব ও সম্মুখ দৃশ্য—(⅙ আকৃতি)।

অঃ বাঃ পৃঃ ৯১।

কম হইয়া থাকে। আরও দেখা গিয়াছে যে জন্তুদের মস্তিষ্কে কতকগুলি ভাঁজের মত রেখা পড়ে এবং পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে সেগুলি বুদ্ধির পরিচায়ক—যে জন্তু যত বুদ্ধিমান, তাহার মস্তিষ্কের আবর্ত্তনরেখা তত অধিক ও জটিল। মনুষ্যের মস্তিষ্কের আবর্ত্তনরেখা, কি পরিমাণে, কি জটিলতায়, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দেখা গিয়াছে যে এই বিষয় পর্য্যায়ক্রমে ওরাংউটাং প্রভৃতি নরকপি, বানরজাতি, সিংহাদি চতুষ্পদ প্রভৃতি জীবের মস্তিষ্ক ক্রমশ হীন হইয়া থাকে। এইরূপ মানব ও নিম্নতর জীবসমূহের প্রত্যক্ষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বস্তুগত সাদৃশ্য এবং পরিমাণ ও জটিলতায় প্রভেদই নিম্নতর জীব হইতে মানবের অভিব্যক্তি সত্য বলিয়া নিতান্তই প্রতিপন্ন করিতেছে। একটা নিগ্রোর মুখ এক জন ইউরোপীয়ের মুখ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও নিগ্রোকে মনুষ্য বলিতে কুণ্ঠিত হই না, কারণ উহাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা আপাতত সাদৃশ্যের ভাগই অধিক দেখা যায়। এই কারণে যদি কেহ প্রমাণ করিতে বসেন যে নিগ্রো হইতে ইউরোপীয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে সম্ভবত আমরা বেশী আশ্চর্য্য হইব না। কিন্তু যদি কেহ আফ্রিকার নেগ্রিল (Negrillo) এবং মাল্কয় দ্বীপের নিগ্রোবটু (Negritto) দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই বানর হইতে মানবের অভিব্যক্তিতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইবেন না —উভয়ের মধ্যে এত সাদৃশ্য।

প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য দেখিয়া নিম্নতর জীব হইতে মানবের অভিব্যক্তি স্বীকার করা নিতান্ত কঠিন কার্য্য নহে, কিন্তু তাহা বিশেষ বলবান প্রমাণস্বরূপে গৃহীত না হওয়াই সম্ভব—এরূপ অনুমিত হইতে পারে যে দৈবক্রমে মনুষ্য অন্যান্য জীবদিগের সহিত আংশিক সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরোক্ষ সাদৃশ্য দেখিলে সে কথা বলিবার অবসর থাকিবে না। পরোক্ষ সাদৃশ্যের সকলগুলি সচরাচর প্রত্যক্ষ হয় না, সময় বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বিহৃতাঙ্গের (rudimentary organs) বিষয় আলোচনা করিলে এই পরোক্ষ সাদৃশ্যের মর্ম্ম সুন্দর উপলব্ধ হইবে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে আমাদের অনেক অঙ্গ অব্যবহার প্রযুক্ত অকর্ম্মণ্যাবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। ইহা দৈনিক প্রত্যক্ষ ঘটনা। ব্যায়ামের অভাবে পেশী বলিষ্ঠ হয় না, অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ইহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছে? অভিব্যক্তিবাদীগণ এই তত্ত্বের

বিস্তৃতি করিয়া বলেন যে ব্যবহারের অভাবে অঙ্গ সকল অকর্ম্মণ্য হইতে হইতে বিহৃত (rudimentary) অবস্থায়ও পরিণত হইতে পারে। অবশ্য এই অবস্থা সম্ভবত এক পুরুষে হয় না, কিন্তু যুগযুগান্তর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে অব্যবহার ঘটিলে অব্যবহৃত অঙ্গের বিহৃতি (degeneration) ঘটিতে পারে। গৃহপালিত পশুপক্ষীর মধ্যে এই বিষয়ের অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে ইহা একপ্রকার সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এখন, সম্মুখের দিকে চাহিয়া যেমন বলিতে পারি যে ব্যবহারের অভাবে অঙ্গের বিহৃতিলাভ ঘটে, সেইরূপ বিহৃতাঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইলে পশ্চাতের দিকে চাহিয়া বলিতে পারি যে সেই অঙ্গের পুরুষানুক্রমে অব্যবহার ঘটিয়াছে। আর অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেনও বটে যে এরূপ বিহৃতাবস্থায় পরিণতি ব্যতীত জীবশরীরে অকর্ম্মণ্য নানা অঙ্গের অস্তিত্বের অন্য কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব। দুই একটী দৃষ্টান্ত অভিব্যক্তিবাদের আপত্তিখণ্ডনে প্রদর্শন করিয়াছি। আরও কয়েকটী দিবার ইচ্ছা আছে। এমন অনেক জাতীয় বিহগ আছে, যাহাদের এক শ্রেণীর ডানা বিহৃতাকার ধারণ করিয়াছে, অপর শ্রেণীর ডানা সুব্যক্ত রহিয়াছে; এই অবস্থায় অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে প্রথম শ্রেণী যে কোন কারণে হউক, বংশানুক্রমে ডানার ব্যবহার করিবার অবসর পায় নাই। ঘোড়ার ক্ষুরে বিহৃতাকার তিনটী অঙ্গুলির চিহ্ন আছে; অনুমান হয় যে এই সকল অঙ্গুলি সময়ে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু প্রয়োজনের অভাবে অব্যবহার্য্য হওয়াতে বিহৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানের শিরদাঁড়া বিশিষ্ট মাছ আদিমকালের উভচর মাছ হইতে অভিব্যক্ত বলিয়া অনুমান হয়। সেই আদিম মাছে "পটকা" সর্ব্বপ্রথম নিশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রস্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ক্রমে মাছগুলো যখন কান দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করিতে লাগিল, তখন পটকার আসল কাজ চলিয়া গেল। তাহার ফলে, বর্ত্তমানে কোন কোন মাছে পটকা একেবারেই নাই, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত; কোন কোন মাছে বিহৃতিপ্রভাবে মটরের ন্যায় ক্ষুদ্রকায় পটকা দৃষ্ট হয় এবং অধিকাংশ মাছে উহা সন্তরণের উপায়স্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে সকল মাছের পটকা নাই তাহারা যে সাঁতার দিতে কষ্ট পায় তাহা নহে, পটকাবিশিষ্ট মাছের সঙ্গে সমান সন্তরণপটু। এই ঘটনা হইতে জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন

যে পটকা মাছের সাঁতার দিবার অপরিহার্য্য উপকরণ নহে, ইহা মাছের নিশ্বাসযন্ত্রের উদ্বর্ত্তনে কোথাও বা সন্তরণযন্ত্রের কার্য্য করিতেছে এবং কোথাও বা অব্যবহার বশতঃ বিহতাকার ধারণ করিয়াছে।

মানবেরও শরীরে এইরূপ বিহতাঙ্গের চিহ্ন সকল পরিদৃষ্ট হয়। মানুষের বিহত লাঙ্গুলের অস্থি আজও চর্ম্মাবৃত দেখা যায়। কোন কোন স্থলে এই লাঙ্গুল স্ফুটত্ব লাভ করিয়া বাহির হইয়া পড়িতেও দেখা গিয়াছে। মানুষ যখন হস্তদ্বারা মশামাছি তাড়াইতে সক্ষম হইল, তখন অব্যবহার বশতঃ লাঙ্গুল বিহত হইয়া পড়িল। পুরুষমানুষের স্তন বর্ত্তমানে বিহতাকৃতি। আমি দুএকটী লোকের স্তন স্ফুটত্ব লাভ করিয়া দুগ্ধনিঃসরণ করিতে দেখিয়াছি। উপরোক্ত দুইটী ব্যতীত প্রাণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মনুষ্যশরীরে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি বিহতাঙ্গের আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই অঙ্গগুলি নিম্নজীবের শরীরে স্ফুটাকারে অবস্থিত দেখা যায়। নিম্নজীবে পরিস্ফুট এবং মানবে বিহত অঙ্গের সংখ্যা দিনে দিনে এত অধিক আবিষ্কৃত হইতেছে যে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ আজ কাল প্রায় এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে সেগুলি নিম্ন প্রাণীর উত্তরাধিকারসূত্রে মানব প্রাপ্ত হইয়াছে। আর বাস্তবিক, কতকগুলি অনাবশ্যক অকর্ম্মণ্য, এমন কি অনিষ্টকর অঙ্গ মনুষ্যশরীরে ঈশ্বর সহসা নিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন, এরূপ কল্পনা অপেক্ষা নিম্নতর জীবের পরিস্ফুট অঙ্গ সকল অব্যবহার বশতঃ মনুষ্যশরীরে বিহতাবস্থায় অনুবৃত্ত হইয়াছে এই সিদ্ধান্তমূলক অনুমান কি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নহে? সাধারণতঃ কয়েকটী স্থলবিশেষ ব্যতীত মানুষের গাত্র রোম হীন, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে রোমের একটী সূক্ষ্ম আচ্ছাদন দৃষ্ট হয়। এই রোমাচ্ছাদন একটী বিহতাঙ্গের দৃষ্টান্ত। নিরীক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে সকল মানুষেরই বাহুর কি প্রকোষ্ঠ, কি অপরাংশ সকল অংশেরই রোমের অভিমুখতা কণুইয়ের দিকে; বানর প্রভৃতি উন্নত জীব সকল বৃষ্টি হইতে মস্তক হস্তদ্বারা রক্ষা করিবার কালেও জলের অভিমুখতা কণুইয়ের দিকে হয়। ইহা হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে মানবের পূর্ব্বপুরুষ নিম্নতর জীব হইতে এই রোমাচ্ছাদন ও রোমের এইরূপ অভিমুখতা নামিয়া আসিয়াছে। ডার্বিন বলেন যে যৌনোদ্বর্ত্তনেরই ফলে মানবশরীরে রোমের বিহতি ঘটিয়াছে। আমাদিগের মতে যৌনোদ্বর্ত্তনও

জীবনসংগ্রামেরই একটা অবান্তর প্রণালী মাত্র। পশুরা পেশীবিশেষের বলে কান নাড়িতে পারে, মানুষের সেই পেশী বিহত হইয়াছে। এখন আমরা সচরাচর সেই পেশীর বলে ভ্রূদ্বয় নাড়িতে পারি। কানের বহির্ভাগও অনেক পণ্ডিতের মতে কোন অঙ্গের বিহতাকৃতি, কারণ ইহাকে শ্রবণক্রিয়ার কোন উপকারে আসিতে দেখা যায় না। মানুষের ১২টী করিয়া পঞ্জরাস্থি পরিস্ফুট আছে, ত্রয়োদশতম পঞ্জরাস্থি বিহতাকৃতি, বানরজাতির ১৩টী আছে।

এইবারে যে দুইটী অঙ্গের কথা উল্লেখ করিব, তাহাতে মানবের নিম্নজীব হইতে অভিব্যক্তি সূচিত না হইয়া যায় না। আমাদের শরীরের ধমনীসমূহের মধ্যে মধ্যে একপ্রকার কপাটকল আছে, সেগুলি আপনি উন্মুক্ত হয় ও আপনিই রুদ্ধ হইয়া যায়। শরীরের দূষিত রক্ত এই কপাটকল ঠেলিয়া হৃদয়ের দিকে আসিতে পারে, কিন্তু শোধিত রক্ত তাহা পুনরুন্মুক্ত করিতে না পারিয়া সর্ব্বশরীরে ছড়াইয়া পড়ে—কপাটকলের দ্বার হৃদয়ের অভিমুখে উন্মুক্ত হয়। চতুষ্পদ জন্তুদেরও ধমনীতে কপাটকল আছে। এখন, চতুষ্পদ জন্তুতে এই কপাটকল সমকোণ খাড়া ধমনীতে পাওয়া যায়, সমতল ধমনীতে নহে; কিন্তু মানুষের সমতল ধমনীতেই কল দেখা যায়, সমকোণ ধমনীতে নহে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দ্বিপদ চতুষ্পদ সকল জীবের হাত ও পায়ের সমকোণ খাড়া ধমনীতেই কপাটকল অবস্থিত দেখা যায়। সকল জীবেরই হাত ও পা নিম্নমুখী এবং কাজেই হাত ও পায়ের ধমনী সকল জীবেই সমকোণভাবে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবের বিভিন্নভাবে অবস্থিত ধমনীতে কপাটকলের অস্তিত্ব দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হয় যে, ধরানিবদ্ধচক্ষু চতুষ্পদ জীবের যে সকল ধমনী সমকোণ ছিল, সেই সকল ধমনী উন্নতদৃষ্টি মানবের সরলাকৃতির অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমতল এবং সমতল ধমনী সমকোণ হইয়া পড়িল। বিশেষ অনিষ্টকর না হওয়াতে পূর্ব্বে চতুষ্পদের সমকোণ ধমনীতে যে কল অবস্থিত ছিল, এখন মানবের সমতল ধমনীতে তাহা রহিয়া গেল; পূর্ব্বে চতুষ্পদের সমতল ধমনীতে কলের যে অভাব ছিল, বর্ত্তমানে মানবের সমকোণ ধমণীতে কলের সেই অভাবই রহিয়া গেল। এই আশ্চর্য্য ঘটনা হইতে চতুষ্পদ জীব হইবে মানবের অভিব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধান্তমূলক অনুমান আসিতে পারে না বোধ হয়।

দ্বিতীয় আলোচ্য অঙ্গ মানবের তৃতীয় নয়ন—ইহা একটী বিহতাঙ্গ। মানবের না হউক, শিবের তৃতীয় নয়নের জ্যোতিতে মদনভস্ম করাইয়া মহাকবি কালিদাস ইহাকে ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকটে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। মানুষের এবং কয়েকজাতীয় সমেরু জীবের মস্তিষ্কের উপরে দুই চক্ষুর মধ্যস্থলে মটরের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার হৃদনকৃতি একটী বস্তু অক্ষিশিরার সহিত সংলগ্ন আছে। এই বস্তুটীর বর্ত্তমানে কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। দার্শনিকপ্রবর ডেকার্ট ইহাকে অন্য কোন প্রয়োজনে আসিতে না দেখিয়া অবশেষে আত্মার স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের যোগশাস্ত্রেও এই বিন্দুতে নয়নদ্বয়ের গতি স্থির রাখিয়া ঈশ্বরে মনঃ সমাধান করিবার উপদেশ আছে। ইহার কোন প্রয়োজনে আসা দূরে থাক্, সময়ে সময়ে ইহাতে জলবৃদ্ধি বশত আব হইয়া মধ্যে মধ্যে দুর্ভাগ্য রোগীর প্রাণসংশয়ও উপস্থিত করে। এরূপ অনিষ্টকর পদার্থের অস্তিত্ব আসিল কি প্রকারে? কাজেই অনুমান হয় যে এই তৃতীয় নয়ন নিম্নস্তরের জীব হইতে উদ্বর্ত্তন ফলে বিহতাকৃতিতে নামিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিয়া আসিয়াছি যে এখনও নিউজীলণ্ডে এক জাতীয় টিকটিকি রহিয়াছে, তাহাদের নাম দেশীয় ভাষায় তুয়াতারা। সেই ত্রিতার টিকটিকির তৃতীয় নয়ন শৈশবে বিকশিত দেখা যায়, ক্রমে তাহা চর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া যায়। পূর্ব্বে অনেক উভচর সরীসৃপের যে তৃতীয় নয়ন ছিল তাহাই দেখাইবার জন্য একমাত্র এই ত্রিতার টিকটিকি অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। নিম্নস্তরের জীব হইতে যে মনুষ্যে ইহা আসিয়াছে, অনিষ্টকারিতা ও অপ্রয়োজন সত্ত্বেও মানব শরীরে ইহার আবির্ভাবই কি তাহার অন্যতর প্রমাণ নহে? আর একটী প্রমাণ এই যে পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য অপেক্ষা মনুষ্যভ্রূণে এই চক্ষু বৃহত্তর দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে সময়ে সময়ে বিহতাঙ্গ স্ফুটতা লাভ করিতে দৃষ্ট হয়। প্রকৃতই প্রাণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অ-পূর্ব্বদৃষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অথবা তৎসংলগ্ন চিহ্নের অনিয়মিত আবির্ভাব এবং ভ্রূণতত্ত্ব অবলম্বনেই বিহতাঙ্গের তত্ত্ব আবিষ্কার পূর্ব্বক সিদ্ধান্তে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ডার্বিনপ্রমুখ মহাজনগণ উদ্ভিদ ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বিহতাঙ্গের পূর্ব্বাকৃতি লাভ করিবার দিকে একটা প্রবণতা আছে।

ঘোড়ার উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মধ্যে মধ্যে এক একটা শাবক গাত্রে জেব্রাদের ন্যায় ডোরা ডোরা দাগ লইয়া আবির্ভূত হয়। কপোত-দিগের উপর পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে এক একটী কপোতশাবক আদিম পাহাড়ীয় কপোতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া বাহির হয়। অনেক পরীক্ষার পর স্থির হইয়াছে যে পিতা মাতা অপেক্ষা পিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ, আবার তাহার পিতামহ এইরূপ ধারাক্রমে বহু উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষের ছায়া আসিয়া পড়ে। মানুষেরও যে লাঙ্গুল, স্তন, ত্রয়োদশতম পঞ্জরাস্থি, গাত্রে ঘন কেশা-চ্ছাদন, হস্তপদের ষষ্ঠ অঙ্গুলি প্রভৃতি অঙ্গের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হয়, প্রাণতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে তাহা এই সকলের সম্পূর্ণ অভাব হইতে আবির্ভূত হইতে পারে না—কোথাও না কোথাও সেই সকলের মূল ছিল, তবে এইরূপ প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইহা হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে এই সকল পূর্ব্বপুরুষ হইতে অনুবৃত্তিক্রমে আসিয়াছে। তবে এই পূর্ব্বপুরুষ কেবলমাত্র মানুষ ধরিলে চলিবে না—বিশাল সৃষ্টিতে অতি ক্ষুদ্র কীটাণুকীট পর্য্যন্ত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ধরিলে তবে এই সকল বিহতাঙ্গের অস্তিত্ব ও মধ্যে মধ্যে সহসা তাহাদের বিকাশের সমস্যা সহজে মীমাংসিত হয়।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিলাম যে তৃতীয় নয়ন মনুষ্যভ্রূণে বৃহত্তর দৃষ্ট হয়; কেবল তৃতীয় নয়ন কেন? মনুষ্যশরীরের অনেক বিহতাঙ্গ ভ্রূণাবস্থায় বিকশিত দেখা যায়। বাস্তবিক ভ্রূণতত্ত্ব আলোচনা না করিলে অভিব্যক্তিবাদ সুশা-ণিত প্রমাণাস্ত্র লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। মাছ, পাখী, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি সকল জীবেরই ভ্রূণ কতককাল পর্য্যন্ত অভিন্নাকার থাকে, ক্রমে ভ্রূণ যত বড় হইতে থাকে ততই স্ফুটপ্রভেদ হইয়া উঠে। একটা সময়ে কুক্কুর-ভ্রূণ ও মনুষ্যভ্রূণে প্রায় কিছুমাত্র আকৃতিভেদ থাকে না। ক্রমে পার্থক্য আসিতে আসিতে মনুষ্যভ্রূণ বানরশিশুর ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়; ইহারও পরে ক্রমে নিজ আকার ধারণ করেন। মনুষ্যভ্রূণের এক অবস্থায় লেজ প্রত্যক্ষ হয়, এমন কি, পায়ের চেয়ে লেজের দৈর্ঘ্য বেশী থাকে। আমার কোন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞান-প্রিয় বন্ধুর স্ত্রীর দুই মাসের এক গর্ভ বিনষ্ট হয়; তিনি সেই ভ্রূণ অনেক কাল যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। যাঁহাকেই সেই ভ্রূণ দেখান হইত তিনিই উহা একটী মৃত ইন্দুর বলিয়া ভ্রম করিতে বাধ্য হইতেন—তাহার লেজও

৩১শ চিত্র।

মনুষ্য-ভ্রূণ। কুক্কুর-ভ্রূণ।

অঃ বাঃ পৃঃ ৯৬।

ইন্দুরের মত লম্বা ছিল। সাত মাসে মানবভ্রূণের মস্তিষ্ক পূর্ণবয়স্ক নরকপির সমান আবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়। আমাদের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অপরাপর অঙ্গুলি অপেক্ষা বড় এবং নিম্নপ্রাণীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থিত; কিন্তু ভ্রূণাবস্থায় তাহা অন্যান্য অঙ্গুলি অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ও বানরদিগের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ন্যায় পার্শ্বস্থ অঙ্গুলির সঙ্গে কোণাচে ভাবে অবস্থিত থাকে। পাঁচমাসে মানবভ্রূণের ভ্রূ ও মুখ, বিশেষত মুখের চার পাশেই পশমের ন্যায় সূক্ষ্ম লোমের এক আচ্ছাদন পড়ে এবং ছয় মাসে সমগ্র ভ্রূণ রোমে আচ্ছাদিত হয়, এই সময়ে মুখের চুল মাথার চুল অপেক্ষা অনেক বড় থাকে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিম্নজীবের হাত ও পায়ের তলামাত্র রোমহীন থাকে, মানবভ্রূণেরও তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গে রোম থাকে, কিন্তু ঐ দুই স্থানে একটীও রোম উৎপন্ন হয় না। এইরূপ ঘটনাকে নিতান্ত কাকতালীয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না; নিম্নজীবের সহিত মানবভ্রূণের এই বিষয়ে দৈবাৎ মিল হইয়াছে, কেবল এই কথা বলিলে কোন কাজেরই কথা হইল না। ডার্বিন বলেন যে মানবভ্রূণের এই রোমাবরণ স্তন্যপায়ী জীবদিগের স্থায়ী রোমাচ্ছাদনেরই বিহৃতাকার মাত্র। তিনি ইহার সমর্থনে বলেন যে তিনি অনেক লোককে পশুবৎ রোমাবৃতদেহ দেখিয়াছেন এবং তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে দাঁতের অস্বাভাবিকতার সঙ্গে এইরূপ রোমাবৃতদেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অভিব্যক্তিবাদের সমর্থনে ভ্রূণতত্ত্বের আর একটী দৃষ্টান্ত দিই। জলচর টিকটিকির শাবক মাছের ন্যায় কানকাযুক্ত হয় এবং জলেই খেলিয়া বেড়ায়। পাহাড়ীয়া টিকটিকির ছানা একেবারে পূর্ণাভিব্যক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, ইহারা জলে সাঁতার দিতে পারে না। কিন্তু এই শ্রেণীর গর্ভিণী টিকটিকির পেট কাটিয়া ভ্রূণ বাহির করা হইয়াছে এবং পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে তাহাদের কানকা আছে এবং সেই ভ্রূণগুলিকে জলে ছাড়িয়া দিলে সাঁতারও দিতে পারে। ইহা হইতেই অনুমান হয় যে উভচর টিকটিকি হইতেই স্থলচর টিকটিকির অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। ভ্রূণতত্ত্ব আলোচনা করিয়া আর একটী বিষয় দেখা গিয়াছে যে, যে সকল জীব বড় হইলে বাহিরে ও আভ্যন্তরীণ গঠনে যতটা সমাকৃতি থাকে, সেই সকল জীবের ভ্রূণদিগের মধ্যে সাদৃশ্য তদনুপাতে অধিক কালব্যাপী হইয়া

থাকে।* এই সত্য হইতে আমরা আর একটী সত্য অনুমান করিতে পারি যে, যেমন চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি জ্যোতির্বিষক ঘটনা, স্তর-সংগঠন প্রভৃতি ভূগর্ভ বিষয়ক ঘটনা হইতে পৃথিবীর বয়স নিরূপিত হয়, সেইরূপ ভ্রূণের মৎস্যাদি এক এক অবস্থাপ্রাপ্তিরূপ প্রাণতত্ত্ব বিষয়ক ঘটনা হইতেও সম্ভবত পৃথিবীর বয়স নিরূপিত হইতে পারে। ভ্রূণের এক এক অবস্থার সঙ্গে ভূস্তরের এক এক স্তর-সংগঠন কালের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়।

মস্তিষ্কই বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রধান ইন্দ্রিয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই মস্তিষ্ক উন্নতি ও অভিব্যক্তির সঙ্গে পরিমাণে অধিক হয় এবং ইহার আবর্ত্তন-রেখাও অনেক বেশী ও জটিল হয়। এই আবর্ত্তনরেখা একদিকে যেমন মানব ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য সম্পাদন করে, সেইরূপ নিম্নপ্রাণী হইতে মানবের উদ্বর্ত্তনও ব্যক্ত করে। বানরের ও মানবভ্রূণের মস্তিষ্কের আবর্ত্তন-রেখার অবস্থান ও অভিমুখতা একবিধ। বানরের যে শ্রেণীর শরীরগঠন মানুষের যত নিকটবর্ত্তী, সেই শ্রেণীর সহিত মানুষের মস্তিষ্কসাদৃশ্যও তত অধিক। বলা বাহুল্য যে জীবনসংগ্রামের ফলে মানবেরই মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য লাভ করিয়াছে। মানুষের মস্তিষ্ক নিতান্ত কম হইলেও ৩১ আউন্সের চেয়ে কম কখনও দৃষ্ট হয় নাই এবং বর্ত্তমানে বলিতে গেলে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত পশু গরিলার মস্তিষ্ক কখনও ২০ আউন্সের অধিক দেখা যায় নাই—গড়ে নরকপিগণের মস্তিষ্ক-পরিমাণ ১৮ আউন্স মাত্র। নিম্নতর জীবগণের শরীরের সহিত মানবশরীরের বহির্ভাগ ও আভ্যন্তরীণ গঠন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখাইয়া

---

* Further more there is a period in which the young of all these resemble one another, not merely in outward form, but in all essentials of structure, so closely, that the differences between them are inconsiderable, while in their subsequent course they diverge more and more widely from one another. And it is a general law that the more closely any animals resemble one another in adult structure, the longer and the more intimately do their embryos resemble one another; so that, for example, the embryos of a snake and of a lizard remain like one another longer than do those of a snake and a bird; and the embryos of a dog and of a cat remain like one another for a far longer period than do those of a dog and a bird, or of a dog and an opossum, or even than those of a dog and a monkey."—"Man's place in Nature" Huxley.

৩২শ চিত্র।

ওরাংয়ের গর্ভস্থ শাবক।

৩৩শ চিত্র।

আর্য্য মানব, আদিম মানব ও সিম্পাঞ্জির করোটী-তুলনা।

৩৪শ চিত্র। ৩৫শ চিত্র।

মনুষ্য ও সিম্পাঞ্জি মস্তিষ্ক তুলনা।

আঃ খাঃ পুঃ ১১।
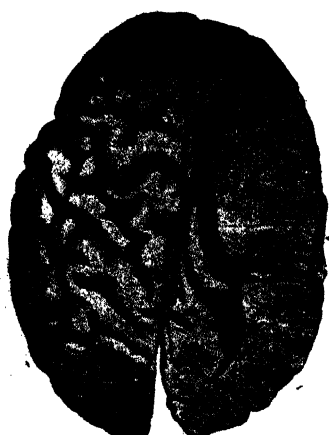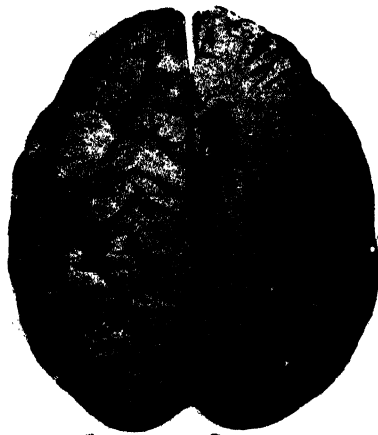
বলিয়া আসিলাম যে অভিব্যক্তিবাদী পণ্ডিতগণ তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তমূলক অনুমান করেন যে নিম্নতর জীবের শরীর হইতে মানবশরীরের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। দুইটী প্রধান প্রাণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা শরীরের অভিব্যক্তি বিষয়ক এই অংশের উপসংহার করিব। অধ্যাপক হক্সলি বলেন "বানরের মস্তিষ্কের পৃষ্ঠভাগ যেন মানবমস্তিষ্কের কাঠামো মাত্র; নরকল্প কপিগণের মস্তিষ্কের আবর্ত্তন মানবের সহিত সাদৃশ্যে এত অগ্রসর হইয়াছে যে ওরাং অথবা শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কের সহিত মানব-মস্তিষ্কের প্রভেদ অবান্তর বিষয়ে মাত্র। আকার ও পরিমাণ বিষয়ে, বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মানবমস্তিষ্কের মধ্যে যে প্রভেদ, ক্ষুদ্রতম মানব ও বৃহত্তম নরকপির মস্তিষ্কের মধ্যে সে প্রভেদ নাই। উচ্চশ্রেণীর কপিগণের দেহযষ্টি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আকৃতির পরিমাণ, অনুপাত অথবা অবস্থানের সামান্য তারতম্য থাকিলেও মূলত তাহার সহিত মানবদেহের হাড়ে হাড়ে মিল।" সুবিখ্যাত অধ্যাপক ওয়েন (Owen) বলেন "যে গঠনসাদৃশ্য বশতঃ মানুষ ও কপিদিগের অস্থিবিচারে প্রাণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের এত চিন্তা করিতে হয়, সেই গঠন-সাদৃশ্যে আমি অন্ধ থাকিতে পারি না—প্রত্যেক দাঁতে, প্রত্যেক হাড়ে মিল পাওয়া যায়।"

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায়
মানব শরীরে অভিব্যক্তি মূলক অষ্টম কথা সমাপ্ত।

নবম কথা—মানবাত্মার অভিব্যক্তি।

নিম্নপ্রাণী হইতে মানবশরীরের অভিব্যক্তি বিষয়ে অভিব্যক্তিবাদীগণের প্রায় সকলেই একমত, কিন্তু নিম্নপ্রাণী হইতে মানবের অন্তর্বৃত্তিসমূহের অভিব্যক্তি বিষয়ে প্রধানত দুইটী মত দেখা যায়—এক, অভিব্যক্তি হইয়াছে এবং দ্বিতীয়, কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি কর্তৃক অন্তর্বৃত্তিসমূহ মানবের অন্তরে রোপিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত মতবাদীদিগের নেতা ডার্বিন প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নেতা ওয়ালেস্ প্রভৃতি। ডার্বিন বলেন যে অভিব্যক্তিবাদ মানিতে গেলে কেবল শরীর বিষয়ে মানিবে, অন্তর্বৃত্তি বিষয়ে মানিবে না, এরূপ মত পরস্পর বিরোধী। ওয়ালেস্ বলেন জগতে এমন অনেক নিয়ম কার্য্য করিতেছে যাহা আমরা জানি না; সেইরূপ শরীর সম্বন্ধে মাত্র হয়তো জীবনসংগ্রামমূলক অভিব্যক্তি কার্য্য করিতেছে, অন্তর্বৃত্তি সম্বন্ধে করিতেছে না—ইহাতে বিরোধের কথা নাই। আমাদের বোধ হয় আছে। মাধ্যা-কর্ষণের অর্থে বুঝায় যে, যে লোকে যে কোন প্রকার পরমাণু থাক্ না কেন, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। এই মাধ্যাকর্ষণের সহিত কেবল পরমাণুরই সম্বন্ধ, পরমাণুর অতিরিক্ত কোন পদার্থের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অভিব্যক্তির এমন কোন অন্তর্নিহিত অর্থ নাই যে তাহা শরীরমাত্রেই প্রযুজ্য হইবে, অন্তর্বৃত্তি সমূহে প্রযুজ্য হইবে না—বিশেষত যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি যে শৈশব হইতে অন্তর্বৃত্তি সমূহের ক্রমাগত অভিব্যক্তি হইতেছে। অসভ্য মানুষ সভ্য অবস্থায় আসিতে গেলে তাহারও অন্তর্বৃত্তি সমূহের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

যাই হোক্, আশা করি নিম্নপ্রাণীর অন্তরে অন্তর্বৃত্তি সমূহের আধার আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে এই সকল মতদ্বৈধের শেষ হইতে পারে, কারণ সেই আত্মা নিম্ন প্রাণীতে অপরিস্ফুট অবস্থায় থাকিলেও ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে শরীরের ন্যায় আত্মাও মানবে অনুবৃত্ত হইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। আত্মার প্রধান লক্ষণ আমিত্বজ্ঞান এবং উপকরণ স্মৃতি-

শক্তি। আত্মার এই উপকরণ স্মৃতিশক্তি যে পশুপক্ষীদিগের আছে সে বিষয়ে কাহারও বোধ হয় সংশয় নাই, কারণ প্রায় সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তোতাপাখীদিগকে যাহা শেখান যায় তাহাই যখনতখন আবৃত্তি করে, অবশ্য স্মৃতিশক্তি না থাকিলে তাহা অসম্ভব হইত। আমার এক কুকুর আছে আমি কয়েকদিনের জন্য স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়াতে সে হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়াছিল। আমি গৃহে যে সময়ে প্রত্যাগমন করিতাম, সেই সময়ের পরে সে কাঁদিয়াছিল এবং তাহার চক্ষে জল দেখা দিয়াছিল। ইহাতেও কি পশুদের স্মৃতিশক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়? আর একটী দৃষ্টান্ত দিই। সেই কুকুরকে গুড্‌মর্ণিং বলিলেই পা উঠাইতে শিখাইয়াছিলাম, প্রায় মাস দুই পরে তাহাকে গুড্‌মর্ণিং বলাতেই পা উঠাইয়া দিয়াছিল। এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া কিছুতেই পশুদের স্মৃতিশক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। আমার অনুপস্থিতিতে কুকুরের ক্রন্দন হইতে যেমন অতীত-স্মৃতির অস্তিত্ব দেখিতে পাই, সেইরূপ ভবিষ্যৎ প্রতীক্ষারও ভাব দেখিতে পাই। সে জানিত যে আমি প্রতিদিন অমুক সময়ে গৃহে ফিরি, বিদেশ-গমনের দিনেও সেই সময়ে ফিরিব বলিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছিল এবং যখন যথাসময়ে ফিরিলাম না, তখন তাহার দুঃখ উদ্বেল হইয়া উঠিল।

নিম্নপ্রণালীতে যেমন আত্মার উপকরণ স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ আত্মার লক্ষণ আমিত্ব-জ্ঞানেরও অস্তিত্ব-পরিচয়ের অভাব নাই। জীবমাত্রেরই অন্তরে যে ভয়, হিংসা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর এবং স্নেহ, প্রেম, দয়া প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বৃত্তি আছে ইহা সর্ব্ববাদসম্মত। "আমার অনিষ্ট হবে" এইরূপ জ্ঞানমূলক ভাবের নামই ভয়। 'আমি খাইব, উহাকে খাইতে দিব না,' এই প্রকার ভাবই হিংসার ভাব। এই সকল ভাবের মধ্যে আমিত্ব সূচিত আছেই। পশুপক্ষী নিজের শাবকদিগকে প্রাণপণে ভাল-বাসে, অপরের শাবককে ভাল তো বাসেই না, সুবিধা পাইলে বিনাশ-সাধনেও অগ্রসর হয়। এই ভালবাসার মধ্যে এটী আমার শাবক ওটী নহে এইরূপ জ্ঞান নিহিত আছে। সেইরূপ কুকুর প্রভৃতি যখন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া নিজ প্রভুকে রক্ষা করিতে উদ্যত হয়, তখন ইনি আমার প্রভু এবং ঐ ব্যক্তি আমার প্রভুর শত্রু এইরূপ জ্ঞান নিহিত আছে। প্রাণীরাজ্যে এরূপ

ভালবাসার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, শক্তিমান পশু দুর্ব্বল অনুগত পশুকে অভয় ও আশ্রয়দান করে। এমন দেখিয়াছি যে এক গরু অপর গরুর ক্ষতস্থান জিহ্বাদ্বারা চুলকাইয়া দিতেছে। এই প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে দয়া স্নেহের বিস্তর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এবং বলা বাহুল্য সেই সকলেতেই আমিত্ব-জ্ঞানের অনস্তিত্ব সম্ভবই নহে। পশুরা অনেক স্থলেই আদর অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করে দেখা গিয়াছে—ইহার ভিতরেও আমিত্বজ্ঞান বিশেষ সূচিত থাকে। নিম্নশ্রেণীর অন্তরে এই সকল অন্তর্বৃত্তির অস্তিত্ব সত্ত্বে আমরা বলিতে বাধ্য যে, তাহাদেরও আত্মা আছে। আত্মার বৃত্তিসকল মনুষ্যে অনেকটা ব্যক্ত আকার ধারণ করিয়াছে এবং নিম্নতর প্রাণী সমূহে যথানুপাতে অব্যক্তাকারে থাকে। মানবসন্তান কি সম্যক্ পরিস্ফুট অন্তর্বৃত্তি সকল লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় এবং তাহা হয় না বলিয়া কি তাহার আত্মা অস্বীকৃত হয়? পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে পাখীর ছানাকে শাবকাবস্থায় ধরিয়া রাখিয়া অন্যান্য পাখীদের বাসানির্ম্মাণ দেখিতে না দিলে কিছুতেই বাসা নির্ম্মাণ করিতে পারে না—ইহার বেলায় তো এমন কথা শোনা যায় না যে সেই ছানার ভিতরে বাসা নির্ম্মাণ করিবার উপযোগী অন্ধসংস্কারের অস্তিত্ব নাই। প্রকৃত কথা এই যে, দৃষ্টান্তের অভাবে সংস্কারটী ব্যক্ত অবস্থায় আসিবার অবসর পায় নাই।

মনুষ্যেতর জন্তুদিগের অন্যান্য অন্তর্বৃত্তিরও নানা পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের যে আমোদস্পৃহা আছে প্রাণীবৃত্তান্তে তদ্বিষয়ক অনেক গল্প পড়া যায় এবং গৃহপালিত পশুদের ক্রীড়ায় তাহা প্রত্যক্ষ হয়। তাহাদের রসিকতারও পরিচয় বানরের নিজে দধিভক্ষণ করিয়া ছাগলের মুখে ম্রক্ষণের গল্পেই পাওয়া যায়—ইহা গল্প হইলেও আদর্শ গল্প অর্থাৎ সচরাচর বানরগণ যেরূপ রসিকতার পরিচয় দেয় তাহারই নমুনা। বানর, হাতী প্রভৃতির বুদ্ধির নিকটে অনেক সময়ে মনুষ্যবুদ্ধিও পরাজিত হয়। এক সাহেবের বানর একবারমাত্র খুলিবার প্রণালী দেখিয়া পেঁচবিশিষ্ট বুরুশের পেঁচ খুলিতে পারিত, অনেক চাকর এরূপ বুদ্ধি প্রকাশে অক্ষম হয়।

আমার বিবেচনায় মনুষ্যের যে কোন অন্তর্বৃত্তি আছে তাহার মূল বীজাকারে নিম্নপ্রাণীদের অন্তরে দেখা যায়। শীকারী জন্তুগণ যে শীকার ধরিবার

জন্তু যথাদূরে ওৎ করিয়া থাকে ও যথাসময়ে ঝম্ফপ্রদানে শীকার ধরে এবং পাহাড়ীয়া মেষ প্রভৃতি জন্তুগণ যে পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ হইতে উপযুক্ত দূরস্থিত শৃঙ্গান্তরে একলাফে চলিয়া যায়, এই সকলে সময় ও দূরত্বজ্ঞানের মূল কি দেখা যায় না? কুকুরেরা যখন পদচিহ্ন অনুসরণ করে, তাহার ভিতর কি চিত্রবিদ্যার মূল নিহিত বোধ হয় না? ধর্ম্মবুদ্ধি সম্ভবত ভয়মিশ্রিত পরার্থপর ভালবাসা হইতে সমুদ্ভূত। পশুদিগের যখন ভয়ও আছে, এবং পরার্থপর ভালবাসাও আছে, তখন তাহা হইতে ধর্ম্মবুদ্ধির অভিব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নহে। নীতিজ্ঞানও আমাদিগের মতে স্বার্থমিশ্রিত স্বজাতিপ্রেম বা এইরূপ কোন বস্তু হইতে সমুৎপন্ন। একসময়ে স্পার্টানদিগের মতে সকল চৌর্য্য প্রশংসাজনক কার্য্য বলিয়া গণিত হইল, কারণ তখন পরের ধনে স্বজাতি সংরক্ষণ ও সুতরাং প্রকারান্তরে আত্মরক্ষা আবশ্যক হইয়াছিল; ক্রমে যখন অন্যান্য জাতির সংঘর্ষণে তাহা নিজেদের অনিষ্টজনক বলিয়া বোধ হইল তখন অগত্যা তাহা নীতিবিগর্হিত বলিয়া ধরা হইল। এক সময়ে ভারতে নিয়োগ-প্রথা অন্যায় বলিয়া গণিত হইত না, কারণ তখন জনবৃদ্ধি আবশ্যক হইয়াছিল আজ অনাবশ্যক বোধে এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাদ্বেষ আনাইয়া অনিষ্টকর হইতে পারে বলিয়া ক্রমশ তাহা সামাজিক ও ব্যক্তিগত সুনীতির বহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পশুপক্ষীদের শাবকগণের মধ্যে একটীও হারাইলে বুঝিতে পারে, তখন কেমন করিয়া বলিব যে তাহাদের মধ্যে গণনাশক্তি সূক্ষ্মভাবে অন্তর্নিহিত নাই? এ কথা বলিলে চলিবে না যে তাহারা একটী চেনা জিনিষের অভাব বোধ করাতে তদন্বেষণে রত হয়। ইহাতেও বলিতে হইবে যে তাহাদের অন্তত একটা চেনা জিনিষেরও অভাব বোধ হয়। আর একটী কথা এই খানে বলি যে মানব ও অন্যান্য জীবের অন্যোন্য রোগের সংক্রমণ শক্তি থাকা প্রযুক্ত ওয়ালেস আমানব সকল জীবেরই দেহের মূল একত্ব স্বীকার করেন। তবে, যখন মানবের ইঙ্গিতব্যক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি অন্তর্বৃত্তি পশুপক্ষীতেও সংক্রামিত করা যাইতে পারে, তখন মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীর অন্তর্বৃত্তির এবং সুতরাং আত্মার মূল একত্ব অস্বীকৃত হং [illegible] রূপে তাহা তো বুঝিতে পারি না। এতক্ষণে দেখিলাম যে নিম্নপ্রাণী ও মানবের আত্মা ও তন্নিহিত অন্তর্বৃত্তিসকল মূলত এক এবং নিম্নপ্রাণীর

আত্মা হইতে মানবের আত্মা অভিব্যক্ত হওয়াই অসম্ভব নহে, বরঞ্চ অত্যন্ত সম্ভব। এখন দেখিব যে ওয়ালেসপ্রমুখ অভিব্যক্তিবাদীগণের তদ্বিরোধী মত কতদূর যুক্তিযুক্ত।

অভিব্যক্তি বা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের মূলমন্ত্র এই যে পরিবৃত্তি নিয়মানুসরণে জীবগণের মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে যেগুলি উপকারী জীবনসংগ্রামে সেই গুলির রক্ষা ও বৃদ্ধিসাধন হয় এবং যেগুলি অনুপকারী বা অপ্রয়োজনীয় অথবা অপকারী, জীবনসংগ্রামে সেইগুলির বিহিতসাধন হয়। ওয়ালেস বলেন যে মানুষের এমন কতকগুলি অন্তর্বৃত্তি আছে, যে গুলির অসভ্যাবস্থায় কোনই উপকারিতা দেখা যায় না, সুতরাং সেই সকল বৃত্তি জীবনসংগ্রামের ফলে সংরক্ষিত বা সম্বর্দ্ধিত হওয়া অসম্ভব; কাজেই ধরিয়া লইতে হইবে যে সেগুলি অতিপ্রাকৃত শক্তি কর্ত্তৃক রোপিত। সেই সকল বৃত্তির মধ্যে তিনি গণিতব্যুৎপত্তি, সঙ্গীত ও চিত্রব্যুৎপত্তি এবং ঈশ্বরজ্ঞান ও দর্শনব্যুৎপত্তি, এই কয়টীর উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিলাম যে এই সকলেরই মূল অসভ্য মনুষ্য, দূরে থাক, নিম্নতর প্রাণীদিগেরও অন্তরে নিহিত আছে। এখন দেখিতে হইবে যে জীবনসংগ্রামের ফলে সেই সকল বৃত্তির অভিব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না; অর্থাৎ সেই সকল বৃত্তির জীবনসংগ্রামে সহায়তা করা সম্ভব কি না; অবশ্য নিম্নপ্রাণীদের অথবা অসভ্যদিগের জীবনসংগ্রামে ইহারা ঠিক যে কতদূর সহায়তা করিয়াছিল তাহা বলা সহজ নহে। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে ওয়ালেসের উপপাদ্য হইল যে গণিতবুদ্ধি প্রভৃতি অসভ্য দিগের জীবনসংগ্রামে সহায় হয় নাই, কিন্তু তিনি গোড়াতেই উপপাদ্য মানিয়া লইয়াছেন। তার পর, আমরা দেখিব যে মাত্র অসভ্যদিগেরই জীবনসংগ্রামে এই সকল বৃত্তি সহায় হইতে পারে কি না এবং তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই ধরিয়া লইব যে নিম্নপ্রাণীদিগেরও জীবনসংগ্রামে সেগুলি সহায় এবং সিদ্ধান্তমূলক এই অনুমান পোষণ করিব যে নিম্নপ্রাণীদিগের অন্তরে নিহিত বৃত্তিসকলই অসভ্য মানুষে জীবনসংগ্রামেরই বলে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ওয়ালেসই বলিয়াছেন যে, কোন অসভ্যজাতি মাত্র দুই গণিতে পারে, এস্কিমোজাতি হাত ও পায়ের আঙ্গুল অবলম্বনে ২০ পর্য্যন্ত গণিতে পারে;

আবার অন্যান্য অসভ্যজাতি এককুড়ি, দুকুড়ি করিয়া অনেকদূর গণিতে পারে। অষ্ট্রেলীয় অসভ্যেরা ১০০ গণিতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার টঙ্গা-জাতি একলক্ষ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। মোটের উপর বোধ হয় গণিতবুদ্ধি নিম্নজীবের ন্যায় মানব মাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত আছে। এখন প্রশ্ন এই যে ইহা জীবনসংগ্রামে সহায়তা করিতে পারে কি না, সম্ভাবনা আছে কি না। দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ কাফ্রিদের প্রত্যেকেরই গৃহপালিত পশুর অনেকগুলি যূথ নিজস্ব থাকে। সেই সকল দলের যে কোনটী হইতে একটা পশু হারাইয়া গেলে পশুস্বামী তাহা ধরিতে পারে। ওয়ালেসের মতে পশুস্বামী যে সেই দলস্থ পশু গণিয়া তাহা বুঝিতে পারে তাহা নহে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যেরূপ কোন ছাত্রের অনুপস্থিতি ছাত্রসংখ্যা না গণিয়াও বুঝিতে পারেন, তদ্রূপ পশু-স্বামীও চেনা পশুর অভাব সহজেই বুঝিতে পারে। ইহা স্বীকার করিলেও আমরা এই খানেই গণিতবুদ্ধির জীবনসংগ্রামে সহায়তা করিবার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। মনে কর একব্যক্তির দল হইতে একটী পশু পলাইয়া অপর ব্যক্তির একটী দলে মিশিয়া গেল এবং প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট তাহার প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করাতে বিবাদ বাধিয়া গেল। অবশেষে হয়তো উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন অথবা রাজা মধ্যস্থ হইয়া উভয়কেই নিজ নিজ পশু গণিয়া দেখিতে বলিল। গণিতে না জানিলে বিবাদ কলহের শান্তি সহজ নহে, ফলে স্বজাতিধ্বংস ও আত্মবিনাশেরই সম্ভাবনা। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, যে জাতি যতদূর গণিতে পারিবে, সেই জাতিরই পশু প্রভৃতি ধনৈশ্বর্য্য রক্ষার সুবিধা হইতে পারিবে এবং কাজেই সেই জাতিরই জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার সম্ভা-বনা অধিক। মানবের শৈশবকালে এক একটী পশু কত না যত্নের ধন ছিল; এক একটী অস্ত্র কত না পরিশ্রমে প্রস্তুত হইত। তখন অবাধ বাণিজ্যও ছিল না এবং আমেরিকার অভূতপূর্ব্ব যন্ত্রাদিও আবিষ্কৃত হয় নাই। আর, এককুড়ি দুকুড়ি করিয়া গণিলেই গণিতবুদ্ধির অভাব বলা যায় না। উন্নত আর্য্য জাতি আজও দশের পর এক আর দশ (একাদশ), দুই আর দশ (দ্বাদশ), এক আর কুড়ি (একবিংশ), দুই আর কুড়ি (দ্বাবিংশ) এইরূপে গণনা করিয়া থাকেন।

এখন গণিত-ব্যুৎপত্তির কথা। অসভ্যদিগের গণিতব্যুৎপত্তি নাই—ইহাই

তো আরও সপ্রমাণ করে যে মানবের গণিতবুদ্ধি উদ্বর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। জ্যামিতিই বল, আর যে কোনপ্রকার গণিতই বল, মূলে তাহা সংখ্যাগণনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সংখ্যাগণনা দ্বারা যাহা অতিকষ্টে বাহির হইত, জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতির সাহায্যে তাহা সহজে হয়। অসভ্যসমাজ যত সভ্যতাসোপানে উঠিতে লাগিল, যত রাজ্য ও ধনৈশ্বর্য্য আয়ত্ত হইতে লাগিল, ততই অগত্যা শত্রুপক্ষের সহিত সংঘর্ষ হইতে লাগিল, ততই খাদ কাটা, প্রাচীর দেওয়া এবং খাদ উত্তীর্ণ হওয়া ও প্রাচীর ভেদ করা এই সকল কার্য্য আবশ্যক হইতে লাগিল এবং সুতরাং গণিতবুদ্ধিরও নানা প্রণালীতে উদ্বর্ত্তন হইতে লাগিল। এ অবস্থায় গণিতবুদ্ধির ন্যায় গণিতব্যুৎপত্তিও জীবনসংগ্রামে সহায় নহে এ কথা বলা অসঙ্গত। অসভ্য সমাজে অনেক কার্য্যই হাতেহেতেড়ে গণিয়া করিলেই চলিতে পারে, কিন্তু সভ্যসমাজে এত প্রকার জটিল কার্য্য সাধিত হয় এবং সে গুলি এত জটিল গণনার উপর নির্ভর করে যে, যত অল্পের মধ্যে অধিক গণনা হয়, যত সংহত ভাবে গণনা সাধিত হয়, ততই সেই সকল গণনা ও তন্মূলক কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হইবার এবং সুতরাং গণিতব্যুৎপত্তিবিশিষ্ট জাতিরই জীবনসংগ্রামে জয়লাভের সম্ভাবনা অধিক। অধ্যাপনা ও মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি উপায়ে সেই সংহত গণনাপ্রণালী সাধারণের গ্রহণোপযোগী করিয়া জয়ের সম্ভাবনা অধিকতর করিয়া দেয়। ভ্যাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি অসভ্য জাতি যে সুসভ্য রোমকদিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা গণিতব্যুৎপত্তির কারণে নহে, রোমের বিলাসিতা ও তৎসঙ্গী বিবাদকলহের কারণে। রোমকেরা দুর্নীতির ফলে সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা বশত গণিতব্যুৎপত্তি প্রকাশের অবসরই পায় নাই। মুসলমানদিগের নিকটে যে হিন্দুদের পরাজয় ঘটিয়াছিল, তাহা অন্তর্বিবাদের ফলে, গণিতব্যুৎপত্তির অভাবে নহে। সভ্যসমাজে স্বচ্ছন্দতাও জীবনসংগ্রামে জয়ের একটী প্রধান উপকরণ এবং বলা বাহুল্য যে গণিতব্যুৎপত্তি সেই উপকরণসংগ্রহের একটী প্রধান সহায়।

সঙ্গীতশক্তি জীবনসংগ্রামে অভিব্যক্ত হয় কি না অর্থাৎ জীবনসংগ্রামে সঙ্গীত সহায় হইতে পারে কি না? না হইবার কোনই কারণ দেখি না। সঙ্গীতের মূল স্বর ও লয়। যুদ্ধ করিতে গেলেই নিজেদের উৎসাহ বর্দ্ধন ও শত্রুপক্ষের ভীতি-উৎপাদনে চীৎকারধ্বনি যে বিশেষ সহায়তা করে তাহা বলা বাহুল্য।

এলোমেলো চীৎকার তো সকল অসভ্য জাতিরই অভ্যস্ত কিন্তু যদি যুদ্ধকালে ঐ রূপ এলোমেলো চীৎকারের মধ্যে একপক্ষ সহসা সমবেতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে, তবে তাহাতে অধিক ভীতি উৎপাদন কি সম্ভব নহে? এই খানেই লয়ের উৎপত্তি। তাহার পরে ক্রমে স্বপক্ষের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য সকলেরই আপনাপন বীরত্বকাহিনী বর্ণন করা আবশ্যক হওয়াতে হোলির সময় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী দরওয়ান এবং কাহারদিগের গানের ন্যায় স্বভাবতই একঘেঁয়ে সুর বিশিষ্ট সঙ্গীতের উৎপত্তি হইল। সুরের উৎপত্তি সম্ভবত এইরূপে হইয়াছিল। জগতের সর্ব্বত্রই ছোটলোকদিগের মধ্যে এইরূপ গানই প্রচলিত দেখা যায়। ক্রমে ক্লান্তি নিবারণের জন্যও লয়সংযুক্ত স্বরের প্রয়োজন হইল। বলা বাহুল্য যে ক্লান্তিনিবারণ জীবনসংগ্রামে বিশেষ সহায়। পক্ষীদিগের স্বরের অনুকরণও ক্রমে সঙ্গীতের মিষ্টতার অভিব্যক্তির অনেকটা সহায়তা করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। লয়সংযুক্ত স্বরে বিপক্ষের ভীতি উৎপাদনের মূলাদর্শ স্বরূপে দেখা যায় যে গরিলারা শত্রু দেখিলেই বজ্রকঠিন মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা পটুপটা শব্দ করিয়া তাহার ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। সঙ্গীতের অন্যতর মূল স্বর যে পক্ষীদিগের যৌনোদ্বর্ত্তন অবলম্বনে জীবনসংগ্রামে সহায় হয় তাহা ডার্বিন তাঁহার দুই খানি পুস্তকে সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন।*

চিত্রবিদ্যাও সম্ভবত মানবের জীবনসংগ্রামে সহায়রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সমাজের শৈশবাবস্থায় অধিকাংশ বস্তুই সংগ্রামের উপযোগিতা লইয়া আবির্ভূত হয়। সংযোগশৃঙ্খলের সকলগুলি না পাইলেও যে সকল সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বিজ্ঞান যখন অনুমান করিতে পারে যে মানবের শরীর জীবাদি হইতে অভিব্যক্ত, তখন চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি উন্নত অন্তর্বৃত্তির অভিব্যক্তিবিষয়ক সকল সংযোগশৃঙ্খল না ধরিতে পারিলেও সাহস, রাগ প্রভৃতির ন্যায় যে এগুলিরও ক্রমশ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার পক্ষে বিশেষ কোন সারবান্ যুক্তি দেখিতেছি না। মানবের সেই অতি আদিম কালে মানুষের বৃহৎকায় শত্রু মিত্র জীবজন্তুগণের সহিত বাস ছিল। তখন ভাষার অত্যন্ত অভাব ছিল একথা বলা বাহুল্য। সেই অবস্থায় কোন্ জন্তু শত্রু এবং কোন জন্তু মিত্র বুঝাইতে গেলেই চিত্র আঁকিয়া বুঝান আবশ্যক হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত অন্য প্রকারে

* Origin of spcies এবং Descent of man.

বুঝাইবার বিশেষ অসুবিধা ছিল। পণ্ডিতদিগের মতে মিসরদেশীয় চিত্রাক্ষরের (hieroglyphics) উৎপত্তিও এইরূপে ঘটিয়াছিল। আদিমকালের অঙ্কিত চিত্রসকলের মধ্যে ঘোড়া, বল্‌গাহরিণ, ম্যামথহস্তী প্রভৃতিরই চিত্র পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে ভাবব্যক্তি যে জীবনসংগ্রামে অনুকূল তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে কুকুরের পদচিহ্ন অনুসরণে চিত্রবিদ্যার মূল অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে।

সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি যেন কোনগতিকে জীবনসংগ্রামের ফলে অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভবপর দেখান গেল, কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞান ও দর্শনব্যুৎপত্তি কি সেইপ্রকারে বুঝান যায়? গ্রীক জাতির মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে ঈশ্বরে ভয় জ্ঞানের মূল। বাল্যকালে আমরা মেঘ-গর্জ্জনে, ঝড়বৃষ্টিতে কত না ভয় পাই। সেই আদিম মানবের সমকালীন ভীষণ অরণ্যের মধ্যে ভয়াবহ ঝড়বৃষ্টিতে আদিম মানব যে ভয় পাইবে তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। আদিম মানব দেখিল যে তাহার নিজের ইচ্ছামত এই ঝড়বৃষ্টি আসেও না থামেও না, তখন সেই ঝড়বৃষ্টির অদৃশ্য দেবতার প্রতি একটা ভয়ের উদ্রেক হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অশান্তি আসিল। কিন্তু তাহার পরে যখন সেই ঝড়বৃষ্টির পর রৌদ্র দেখা দিল, সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিল, ফলমূল অপর্য্যাপ্ত জন্মিল, তখন আবার তাহার হৃদয়ে শান্তি আসিল। আবার এই রকম শান্তি ও অশান্তির মধ্যে পড়িয়াই সে অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। এই অশান্তি দূর করিবার জন্য মানবের চিন্তা আসিল, অন্বেষণ আসিল যে, কে এই প্রকার ঝড় দিতেছেন, রৌদ্র দিতেছেন? মানব ক্রমে বুঝিল যে ইহাতে তাহার কোনই হাত নাই—এক অদৃষ্ট পুরুষের ইচ্ছাতে এই সকল ঘটিতেছে। ইহাই হইল দর্শনজ্ঞানের মূল। তার পরে যখন দেখা গেল যে এই প্রকার ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনায় পৃথিবীর উপকারই সাধিত হইতেছে, তখন সেই অদৃষ্ট পুরুষের প্রতি সভয় ভালবাসা এবং তাঁহাকে জানিবার পিপাসা আসিল। তখন মানব সেই অদৃষ্ট দেবতার উপর নির্ভর করিতে পারিয়া শান্তির পথ লাভ করিল। ভয় ও অশান্তি অপেক্ষা অভয় ও শান্তির মধ্যে বাস যে কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি উদ্ভাবিত করাইয়া মানবের জীবনসংগ্রামে অনুকূল হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

ওয়ালেস্ বলেন যে, এই সকল বিদ্যা জীবনসংগ্রামের ফল হইলে ব্যক্তিবিশেষে

আবদ্ধ না থাকিয়া সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িত। আমাদের বিশ্বাস যে মানবজাতির প্রত্যেকেরই হৃদয়ে এই সকল অন্তর্বৃত্তি ও বিদ্যার মূল অবিনশ্বর অঙ্কুরে নিহিত আছে। আমি দেখিয়াছি যে সম্মুখে গাড়ী উপস্থিত হইলেও ছাগলের ছানা নির্ভীক ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মানুষের হাতের নাগালে বিহগশাবককে নির্ভীকভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে ছাগশিশু ও বিহগশাবকের ভয়বৃত্তি নাই? দুই চারবার উপযুক্ত আঘাতাদি পাইলেই অন্তর্নিহিত ভয় পরিস্ফুট হইয়া পড়িত। সেইরূপ মানুষেরও কি কলাবিদ্যা, কি অন্যান্য অন্তর্নিহিত বৃত্তিসকল, সকলই জীবনসংগ্রামে আঘাত পাইলে, প্রয়োজন পড়িলে ক্রমশ অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষে জীবনসংগ্রামে ধর্ম্মচর্চা অধিকতর অনুকূল হইয়াছিল, তাই এখানে আর্য্যজাতির মধ্যে ধর্ম্ম ও তদানুষঙ্গিক দর্শনচর্চার এত আধিক্য। আমেরিকায় এবং সাধারণত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে জীবনসংগ্রামে বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রাদি আবশ্যক হইয়াছে, তাই তথায় গণিতশাস্ত্র রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির বিসদৃশ চর্চা চলিয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন বৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া মানবের বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষত্ব সম্পাদন করে।

এতক্ষণে আমরা দেখিয়া আসিলাম যে মানবের কি শরীর, কি আত্মা সকলই সম্ভবত জীবনসংগ্রামের ফলে নিম্নপ্রাণী হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই সূত্রে যেমন পশুদের আত্মা নাই এই অন্ধ সংস্কার আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে, সেইরূপ মনুষ্যেতর জীবজন্তুর ভাষা নাই এই অন্ধসংস্কারও ত্যাগ করিতে হইবে। হরবোলা যখন দাঁড়কাকের ডাক অনুকরণ করিতে থাকে, তখন অন্যান্য কাক তাহা দাঁড়কাকের অথবা শত্রুপক্ষের ডাক মনে করিয়াই হরবোলাকে দাঁড়কাক বোধে তাড়াইতে চেষ্টা করে। আমি বেড়ালের ছানাকে ডাকিবার স্বর এবং ছানাদের মাকে ডাকিবার স্বর অনুকরণ করিয়া ছানা ও ধাড়ী বেড়াল উভয়েরই নিকট আশানুরূপ প্রত্যুত্তর পাইয়াছি; অদৃশ্য থাকিয়া বিবাদ-কলহের স্বর অনুকরণ করিয়া অপর বিড়ালকে ভয় দেখাইতে সক্ষম হইয়াছি; বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী বিভিন্ন স্বরের অনুকরণে সন্তোষজনক ফল পাইয়া বুঝিয়াছি যে বিড়ালের ভাষা আছে। সেই প্রকার কুকুর, শৃগাল, দয়েল প্রভৃতি নানা পশুপক্ষীর বিভিন্ন অবস্থাজনিত স্বর অনুকরণ করিয়া প্রত্যাশামত উত্তরলাভ করিয়াছি। রোমানেজ এবং অধ্যাপক গার্ণারের গবেষণা সমক্ষে

আর একথা বলা শোভা পায় না যে পশুপক্ষীর ভাষা নাই। তবে, তাহাদের ভাষা তাহাদেরই অন্তর্বৃত্তির উপযোগী, মানবের ন্যায় পরিস্ফুট নহে। কিন্তু মানবেরই ভাষা কি সর্বতোভাবে পরিস্ফুট? কত কত নূতন ভাবরাজ্য সংরচিত হইতেছে এবং তদুপযোগী ভাষাও সংগঠিত হইতেছে।

মানুষ নিম্নপ্রাণী হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহা অস্বীকৃত না হইলেও একথা বলা যায় না যে বানরই মানুষের প্রত্যক্ষ পূর্ব্বপুরুষ। মানুষের দেহের এক টুক্‌রোর সহিত হয়তো এক বানরের সেই অঙ্গের সাদৃশ্য আছে এবং অপর টুক্‌রোর সহিত হয়তো কোন নরকপির সেই অঙ্গের সাদৃশ্য আছে। এই কারণে অভিব্যক্তিবাদী পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে বানর, নরকপি ও মানব, এই সকলেই কোন কোন সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে নামিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে অভিব্যক্তি হইয়াছে। বানর অথবা যে কোন জীব মানবের প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ হইবে, তাহার অন্তত প্রত্যেক দেহখণ্ডে মানবের সহিত অস্থিগঠনে সাদৃশ্যের অভিমুখতা থাকা আবশ্যক। বরাহযুগের আদিস্তরে অতি আদিম বানরের কঙ্কাল পাইয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে সেই সময়েই সম্ভবত মানব শ্রেণীরও অভিব্যক্তির সূত্রপাত হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিয়াছি যে অভিব্যক্তির মূল দুইটি—পরিবৃত্তি ও জীবনসংগ্রাম। জীবনসংগ্রাম ব্যতীত অভিব্যক্তির কথা উত্থাপিতই হইতে পারে না এবং বিনা পরিবৃত্তি জীবনসংগ্রাম সম্ভবই নহে। পরিবৃত্তিই হইল জীবনসংগ্রামের কার্য্যক্ষেত্র এবং অভিব্যক্তি হইল জীবনসংগ্রামেরই কার্য্যফল। পরিবৃত্তি দ্বিবিধ—এক পারিপার্শ্বিক পরিবৃত্তি, দ্বিতীয় বংশগত অনুবৃত্তি। পারিপার্শ্বিক পরিবৃত্তি সকল একপুরুষে ও সাময়িক পরিপার্শ্বের ফলে উৎপন্ন; অনুবৃত্তি সকল পুরুষানুক্রমে নামিয়া আসে বলিয়া কথিত হয়। এইখানে প্রাণতত্ত্ববিৎ মহারথীগণের মধ্যে বিরোধ। স্পেন্সরপ্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন যে পারিপার্শ্বিক পরিবৃত্তিও জীবনসংগ্রামের ফলে উদ্বর্ত্তিত হইয়া বংশানুক্রমে অনুবৃত্ত হয়; বেইসম্যান প্রভৃতি তাহা অস্বীকার করিয়া বলেন যে বীজপরিবর্ত্তন ব্যতীত সহস্র জীবনসংগ্রামেও পারিপার্শ্বিক পরিবৃত্তি সকল অনুবৃত্ত হয় না—চীনে রমণীদিগের পায়ের ক্ষুদ্রতা শতচেষ্টাতেও অনুবৃত্ত হয় নাই? অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন প্রভৃতিও অনুবৃত্ত হয় না। বেইসম্যান একটী উপপত্তি ধরিয়াছেন যে, যেমন পুরুভুজ স্বীয় অংশ হইতে

নিজের অনুরূপ অপর পুরুভুজের জন্মদান করিতে সক্ষম, সেইরূপ জীবের উৎপত্তিমূল বীজসমূহের কতকাংশ হইতে দেহযন্ত্র নির্ম্মিত হয়, অপরাংশে স্বানুরূপ অপর বীজ সকল উৎপাদন করিবার ক্ষমতা নিহিত থাকে। এই উপপত্তি আপাততঃ বিজ্ঞানরাজ্যে পরীক্ষাসাপেক্ষ ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এখন প্রত্যেক জীবেরই বীজ যদি ঠিক আপনার অনুরূপ বীজ উৎপাদন করে, তবে এত বৈচিত্র্য আসিল কি প্রকারে?—বেইসম্যানের মতে স্ত্রীপুরুষের বীজ সম্মিলনে। যৌনমিলন যখন বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে, তখন বীজপরিবৃত্তিরও ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত—পিতামাতা, তাহাদের প্রত্যেকের পিতামাতা, আবার তাহাদের প্রত্যেকের পিতামাতা, এইরূপে বীজসম্মিলনের উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে পরিবৃত্তির ক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কিন্তু বীজপরিবৃত্তিতে জীবনসংগ্রামের হস্ত নাই। বেইসম্যানের এই মত স্বীকার করিয়া লইলেও বীজপরিবৃত্তি ও অনুবৃত্তিতে জীবনসংগ্রামের হস্ত অস্বীকার করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাই না। এক পিতামাতার অনুবৃত্তিফলে অনেকগুলি সন্তান বিভিন্ন অনুবৃত্ত গুণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিল, তখন বলা বাহুল্য যে তাহাদের মধ্যে জীবনসংগ্রাম কার্য্য করিবে ও পরিশেষে যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন হইবে। এই যোগ্যতম সন্তান অবশ্য পিতামাতার কোন বিশেষ অনুবৃত্ত গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং ইহার সন্তানগণের কেহ কেহ আবার সেই বিশেষ অনুবৃত্ত গুণ একটু বর্দ্ধিত আকারে লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং সেই গুণ পরিপার্শ্বের উপযোগী হইলে তৎবিশিষ্ট পশুগণই যোগ্যতম বলিয়া উদ্বর্ত্তিত হইবে। এইরূপে জীবনসংগ্রামের ফলে সেই অনুবৃত্ত গুণেরও উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে এবং তদধিকারী ক্রমশই যোগ্যতমরূপে উদ্বর্ত্তিত হইতে থাকিবে। এইরূপে বেইসম্যানের মত সত্য হইলেও জীবনসংগ্রাম অন্তত ব্যতীরেকী ভাবে অনুবৃত্তিক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া তাহাকে নিয়মিত করিয়া থাকে। বিজ্ঞানে ইহা সিদ্ধান্তপ্রায় যে সকল প্রকার শক্তিই মূলত এক এবং পরস্পর রূপান্তর-যোগ্য। পারিপার্শ্বিক পরিবৃত্তি ও বংশগত অনুবৃত্তি যে মূলত এক নহে এবং রূপান্তর-যোগ্য নহে, একথা আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি না। আমাদিগের বিশ্বাস যে জীবনরক্ষা প্রভৃতির জন্য অনাবশ্যক হইলেই পারিপার্শ্বিক পরিবৃত্তি অনুবৃত্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। চীনে রমণীদিগের ক্ষুদ্রপদ যদি জীবনরক্ষার

অনুকূল হইত, অথবা অন্য কোনরূপে জীবনসংগ্রামে অনুকূল হইত, তাহা হইলে দেখিতাম যে পারিপার্শ্বিক পরিবৃত্তি অনুবৃত্ত হইয়াছে।

পারিপার্শ্বিক পরিবৃত্তির একটী প্রধান অংশ অর্জ্জিত সংস্কার। জীবন-সংগ্রামে অনুকূল হইলে অর্জ্জিত সংস্কার প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক পরিবৃত্তি অনুবৃত্ত হইতে পারে তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত ভারতের জাতিভেদে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য কর্ম্মভেদে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং প্রত্যেক জাতির এক একটী অবলম্বন ছিল। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে কাশ্মীরের শালপ্রস্তুতকারী বংশের সন্তানেরা যেরূপ সহজভাবে ও সুন্দররূপে শাল প্রস্তুত করিতে পারে, অপর কোন বংশের সন্তান সেরূপ পারে না। তাহাদের চক্ষে যত বর্ণ দৃষ্টি-গোচর হয়, অপর কাহারও চক্ষে ততগুলি বর্ণ সহজে ধরা পড়ে না। এ দেশীয় তাঁতি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন অর্জ্জিত সংস্কার সকল কেমন সহজে নামিয়া আসে তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে বুঝাইতে হইলেও এদেশীয় হিন্দুজাতিকে বুঝাইতে হইবে না আশা করি। ডার্বিন পাশ্চাত্য কয়েদীদিগকে দেখিয়া প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে কয়েদীগণের মুখে শ্রী ও সদ্ভাব দেখা যাইতে পারে না, কিন্তু পোর্টলুই সহরে (আণ্ডামান দ্বীপে) হিন্দু কয়েদীগণের শ্রী দেখিয়া আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে "নিউসাউথ ওয়েল্‌স্‌এ (অস্ট্রেলিয়ার এক অংশ) আমাদের দুর্ভাগ্য অপরাধী এবং এই সকল হিন্দু কয়েদী, উভয়কে সমদৃষ্টিতে দেখা অসম্ভব।" আমরাও সেইরূপ বলি যে পৃথি-বীর এক অংশ, একযুগ, একজাতি পর্য্যবেক্ষণ অথবা রাসায়নিক কর্ম্মশালায় পরীক্ষামাত্র করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে না। যতদূর সম্ভব, পৃথিবীর সকল অংশ, সকল যুগ, সকল জাতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তবে এই গুরুতর বিষয়ের সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। যে ভারতবর্ষ সর্ব্বাগ্রে উন্নতির চরম সোপানে পদার্পণ করিয়াছিল, সেই ভারতবর্ষকে এই পর্য্যবেক্ষণে সর্ব্বাগ্রে স্থান দিতে হইবে, তবে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

এই অধ্যায়ে দেখিলাম যে জীবনসংগ্রামে মানবের শরীরও যেমন নিম্ন প্রাণী হইতে অভিব্যক্ত সেইরূপ মানবের আত্মাও নিম্ন প্রাণী হইতে অভিব্যক্ত। নিম্নপ্রাণীর আত্মা নাই ইহা সম্ভব নহে, বরঞ্চ নানা ঘটনা তাহাদের আত্মার অস্তিত্বই সপ্রমাণ করে। মানব যে প্রত্যক্ষ ভাবে

বানর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এমন কোন কথা নাই, এক সাধারণ পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে বানর, নরকপি, মানব প্রভৃতি বিভিন্ন জীব বিভিন্ন অভিব্যক্তি-রেখা গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। ভাষা যে মানবের একচেটিয়া পদার্থ বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, বর্ত্তমান গবেষণার মুখে তাহা বোধ করি আর টেঁকে না। এই অভিব্যক্তির মূলে উভয়বিধ পরিবৃত্তি, পারিপার্শ্বিক ও অনুবৃত্ত। যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বোধ হয় ইহারা উভয়েই একই শক্তির রূপান্তর মাত্র। এই সকল কার্য্যক্ষেত্র বটে, কিন্তু জীবনসংগ্রামই এই ক্ষেত্রে একমাত্র কারণ। জীবনসংগ্রাম ঈশ্বরের এক অতি আশ্চর্য্য ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতের ফলে আজ জীবাদি হইতে সুসভ্য মনুষ্যের অভিব্যক্তি হইয়াছে প্রত্যক্ষ করিলাম, কে জানে যে এই সুসভ্য মনুষ্য হইতে দেবতার অভিব্যক্তি হইবে না? কে বলিতে পারে যে শান্তিময় হরির রাজ্য হইতে অশান্তি চলিয়া গিয়া শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, পাপতাপদগ্ধ, জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত জগতে ধর্ম্মের বিমল প্রভাব বিস্তৃত হইবে না?

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায়

মানবাত্মার অভিব্যক্তি মূলক নবম কথা সমাপ্ত।

—:: ওঁ ::—

দশম কথা—মানবাভিব্যক্তির আরও কয়েকটী কথা।

জীবনসংগ্রামে মানুষেরই বুদ্ধিবৃত্তি বাড়িল কেন, অপর বানরগণের বাড়িল না কেন? আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইঙ্গিত করিয়াছি যে বানরজাতীয় বর্ত্তমানদৃশ্য কোন জীবই মানুষের প্রত্যক্ষ পূর্ব্বপুরুষ নহে। পার্শ্বস্থিত চিত্রদ্বারা মানুষের অভিব্যক্তি কতকটা বিশদ হইবে আশা করি। জীবাদি হইতে মোলস্ক হইল, কিন্তু সেই মোলস্ক হইবার মুখে কতকগুলি মৎস্যাভিমুখী জীব হইল। শেষোক্ত জীব হইতে মৎস্যের আবির্ভাব হইল, আবার কতকগুলি কূর্ম্মাভিমুখী জীবেরও উৎপত্তি হইল। এই শেষোক্ত জীব হইতে ক্রমশ স্তন্যপায়ী বানর ও মনুষ্যমুখী জীব উভয়েরই উৎপত্তি হইল। আবার মনুষ্যমুখী জীব হইতে মনুষ্য ও বনমানুষের উৎপত্তি। ঠিক যে এইরূপে ধারাবাহিকরূপে উৎপত্তি ঘটিয়াছে তাহা নহে। যাহা হউক, জীবতত্ত্ববিৎগণ অনুমান করেন, যে বানর বনমানুষ এবং মনুষ্য ইহাদের সকলেরই পূর্ব্বপুরুষ এক, তাহা বানরজাতীয় একপ্রকার আদিম জীব। সেই আদিম জীবের বংশধরদিগের কতকগুলি আদিম কালের বিস্তৃত অরণ্য পাইয়া ফলমূল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া শাখামৃগরূপে অভি

ব্যক্ত হইল। বোধ হয় যে তাহাদের হস্তপদের গঠনও এবিষয়ে প্রবৃত্ত করাইবার সহায় হইয়াছিল। কতকগুলি মনুষ্যাভিমুখী বংশধর, অরণ্যসকল স্বীয় জ্ঞাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত দেখিয়া খোলা মাঠ ও অরণ্যস্থ বৃক্ষের নিম্নভূমি সকল অধিকার করিয়া লইল। বৃক্ষের উপর অপেক্ষা বৃক্ষের নিম্নে সেই সকল জীবগণের সরীসৃপ, অন্যান্য অরণ্যচারী জীব এবং বৃক্ষের উপরিস্থ স্বজাতিগণের সহিত জীবনসংগ্রাম লাগিয়া গেল। এই সকল নরাভিমুখী কপিগণের খুব সম্ভবত হাত দুটো একটু ছোট হইয়াছিল, কাজেই জীবনসংগ্রামের ফলে তাহাদের হস্ত ও পদ বর্ত্তমানের অনুপাত লাভে অগ্রসর হইল। বলা বাহুল্য ইহাদিগকে মাটীর উপর পাতা প্রভৃতির সাহায্যে বাসা (তাহাকে গৃহ বলিতে পারি না) বাঁধিতে হইল, ইহাতে মাটী খুঁড়িবারও বুদ্ধি আসিল। আজও সাঁওতালদিগের মাঠের উপরে বাসা বাঁধিবার প্রণালী দেখিলে এ বিষয়ে কতকটা বুঝা যাইতে পারে। বানর, গরিলা প্রভৃতি নরকল্প কপিগণের হাত দুটো ভূমিতলে দৌড়িবার অথবা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইবার সহায়তা করে। কিন্তু নরাভিমুখী জীবগণের হাত দুটো ক্ষুদ্র হওয়াতে জীবনসংগ্রামের বড়ই সহায়তা হইয়াছিল; শীকার করিতে, আত্মরক্ষা করিতে একদিকে সোজা পা, অপর দিকে স্বাধীন হস্ত বড়ই উপকারে আসিয়াছিল। তাহাদের হাত আর পায়ের কার্য্যের সহায়তা করিত না। বলা বাহুল্য যে অন্যান্য জীবের তুলনায় নরাভিমুখী জীবের শীঘ্র শীঘ্র উন্নতিলাভ, কর্ম্মে প্রখরতা এবং সুতরাং জ্ঞানবুদ্ধির অন্যতর প্রধান কারণ এই হাত দুটোর স্বাধীনতা লাভ। আমার এই কথার কতকটা মর্ম্ম বুঝা যাইতে পারে যদি আমাদের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী দৈবাৎ কোন গতিকে কাটা পড়ে। বুড়া আঙ্গুল হারাইলে বানরদিগের উপযুক্ত কার্য্য অনেকটা করিতে পারিব, কিন্তু হাতের স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত কাজে একেবারেই অক্ষম হইব। হাত দুটীর স্বাধীনতালাভ হওয়াতে যে মানুষের কি উপকার হইয়াছে, এই সময়ে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই স্বাধীনতার কারণে জীবনসংগ্রামের ফলে মস্তিষ্কপরিমাণও বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে জীবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিল।

অনেকে বানর ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী সংযোগী শৃঙ্খল দেখিতে চাহেন, সেরূপ কোন শৃঙ্খলের অভাবে তাঁহারা অভিব্যক্তিবাদ বিশ্বাস করিতে চাহেন না। একরূপ

শৃঙ্খল পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব। একে তো, ঠিক কোথায় যে মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ সেই স্থান ও তৎসঙ্গে আদিম মনুষ্যের কঙ্কাল প্রভৃতি যে ধ্বংসাবস্থা পায় নাই তাহাও কেহ বলিতে পারে না। এ অবস্থায় বানর ও মনুষ্যের সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সংযোগী শৃঙ্খলের প্রত্যাশা করাই বিড়ম্বনা। কয়েকটী জীবের ব্যতীত অধিকাংশ প্রাণীরই সংযোগী শৃঙ্খল এইরূপ কারণে হস্তগত হয় নাই। নর ও কপির সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে উৎপত্তির ভাব ভাষাতত্ত্বে বেশ পাওয়া যায়। এক আদিমূল সংস্কৃত হইতে হিন্দী, বাঙ্গালা, মৈথিলী প্রভৃতি নানা প্রাদেশিক উপভাষা জন্মলাভ করিয়াছে, কিন্তু সেই কারণে এরূপ বলা সঙ্গত নহে যে হিন্দী হইতে বাঙ্গালা ইত্যাদি, অর্থাৎ এক উপভাষা হইতে আর এক উপভাষা উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেইরূপ কল্পিত অভিব্যক্তির সংযোগী শৃঙ্খলের প্রত্যাশা করাও বৃথা। প্রত্যেক উপভাষার নিজ নিজ শৃঙ্খল অবশ্য অন্বেষণ করা যাইতে পারে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ঠিক যে সংস্কৃত হইতে ধীরে ধীরে উপভাষাগুলি বাহির হইয়াছে তাহা নহে। এই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি যতই কেন পশ্চাতে অন্বেষণ করি, তাহা বাঙ্গালাই থাকিবে এবং সেই আদিম বাঙ্গালা ভাষা হইতে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার ধীরব্যক্ত সংযোগী শৃঙ্খল পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইয়াছে যেন বুঝিলাম, কিন্তু যেই সেই প্রাকৃত হইতে ভাষা নানা প্রাদেশিক উপভাষায় বিভক্ত হইল, সেই বিভক্ত উপভাষা সমূহের মূল উপভাষা অথবা তাহারও মূল ভাষার সহিত সমুদয় সংযোগী শৃঙ্খললাভ বোধ করি একপ্রকার অসম্ভব। মূল ভাষার ছায়া যে উপভাষাসমূহে বর্ত্তমান থাকিবে তাহা বলা বাহুল্য। সেইরূপ নর ও কপির সাধারণ পূর্ব্বপুরুষের সহিত মানুষের ঠিক সংযোগী শৃঙ্খল পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ করি। সেই পূর্ব্বপুরুষ হইতে যখনই নরাভিমুখী জীবের উৎপত্তি হইল, তখন হইতেই বলিতে গেলে মানুষের সৃষ্টি। আমরা পশ্চাতে যাইতে যাইতে কেবল মাত্র এই নরাভিমুখী জীবে পৌঁছিতে পারি, কিন্তু তখনও বলিব যে ইহারও পশ্চাতের সংযোগী শৃঙ্খল কোথায়? ভাবি না যে ইহার পশ্চাতে একবারেই সেই সাধারণ মূল পূর্ব্বপুরুষ। হয় ধরিতে

হইবে যে শৃঙ্খল পাওয়া যায় না, নচেৎ নরাভিমুখী জীবকেই এই শৃঙ্খল বলিয়া ধরিতে হইবে।

মানুষের বুদ্ধির প্রাখর্য্যের আর একটী কারণ উল্লেখ করিব। মানুষ স্বাধীনভাবে দলবদ্ধ থাকিতে ভাল বাসে। জীবগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—(১) যাহারা একাকী বিচরণ করিতে ভালবাসে, যেমন লীমর, এইএই প্রভৃতি; ইহাদের ন্যায় বোকা জীব আছে কিনা সন্দেহ। আমরা এই প্রথম শ্রেণীর জীবগণকে একলষেঁড়ে বলিতে পারি। (২) আবদ্ধ—ইহারা বুদ্ধিতে কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। সময়ে ইহারা স্বাধীন বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু জীবনসংগ্রামের ফলে কতকটা করিয়া আর পারে নাই। ক্রমে তাহাদের সেই বুদ্ধিপ্রকাশ সংস্কারে পরিণত হইয়া উন্নতি প্রতিরুদ্ধ করিল। ইহাদের দৃষ্টান্ত মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি অধিকাংশ জীব। এই শ্রেণীর জীবগণ সমাজের পাঁচজনকে ছাড়িয়া একপাও চলিতে পারে না বলিতে পারি। (৩) মুক্ত; এই শ্রেণীর জীবগণ স্বাধীনতা ত্যাগ না করিয়া দলবদ্ধ থাকিতে চাহে—দৃষ্টান্ত কাক, শৃগাল প্রভৃতি। ইহাদেরই অধিক উন্নতি দেখা যায়। ইহারা একদিকে নিজেদের ব্যক্তিত্ব না হারাইয়া স্বাধীন বুদ্ধিবিকাশের অবসর পায়, অপরদিকে প্রয়োজন পড়িলেই সমাজের পাঁচজনের নিকটে সাহায্যও পাইয়া থাকে। অন্য সময়ে কাকগুলো খুব স্বাধীনভাবে খাদ্যসংগ্রহ করিবে, একটা কাক আর একটা কাকের বাসা চুরি করিবে, কিন্তু দাঁড়কাক প্রভৃতি সাধারণ শত্রু আসিলে সকলে মিলিয়া তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিবে। আমি দেখিয়াছি যে এক মালী একটা কাকের বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলাতে বাগানের কাকদিগের ঠোকরের জ্বালায় বহুদিন যাবৎ সেই বাগানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান মানবজাতি সমূহের মধ্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। প্রাচ্য মহাদেশ এসিয়ার অধিবাসীগণ এক সময়ে স্বাধীনভাবে বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছিল, ক্রমে তাহারা স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়া সমাজের দাস হইয়া পড়িল এবং তখন থেকে উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া গেছে। ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা তো আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। তবে আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানই একমাত্র ভরসা। অন্যান্য জীব হইলে বোধ হয় আর উদ্ধারের আশা থাকিত না, কিন্তু আমরা বুঝিতেছি যে আমরা আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি এবং মুক্ত জীবের স্বাধীনতাকে আহ্বান করি

তেছি, ইহাতেই আমাদের সময়ে সভ্যতার শিখরে পুনরারোহণের সম্ভাবনা আছে। ইউরোপ ও আমেরিকা এখনও মুক্ত জীবের আবাসভূমি আছে, তাই নিত্য নবনব উন্নতির চিহ্ন সকল দেখা দিতেছে। সেখানে এখনও কুসংস্কার সমূহের পাষাণভার চাপিয়া বসিবার অবসর পায় নাই। বিলাস ও আলস্যের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অন্ধতামসপ্রিয় দৈত্যগণ আবির্ভূত হইয়া উন্নতির মূল অবলম্বন সকল গ্রাস করিয়া ফেলে। আমরা এখন চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিলেই বা কথা বলিলেই উপহাসমাত্র পুরস্কার লাভ করি এবং তীব্র বাধা পাই, কিন্তু পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এখনও সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে লোকে সেই সত্যের আবিষ্কর্ত্তাকে সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাই অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে যাইতে হইয়াছে, কিন্তু কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতকে প্রাণের দায়ে ভারতে আসিতে হয় নাই।

নিম্ন প্রাণী হইতে মানবের অভিব্যক্তির সম্ভাবনা আমরা এতক্ষণে দেখিয়া আসিয়াছি। মানবশরীরের সঙ্গে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতিও যে নিম্নপ্রাণীদের অন্তর্বৃত্তিসমূহের সজাতীয়, তারতম্য কেবল পরিমাণে, তাহাও যথাসাধ্য প্রদর্শন করিয়াছি। বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি অন্তর্বৃত্তি সমূহও প্রাণশক্তির রূপান্তরিত সংহত আকার কি না তাহা সিদ্ধান্ত না হইলেও আর এক দিক দিয়া আমরা বলিতে পারি যে অন্তর্বৃত্তিগুলি অন্তত প্রাণশক্তির আনুষঙ্গিক, সুতরাং বলা বাহুল্য যে এখানেও জীবনসংগ্রাম অনিবার্য্য। অন্তর্বৃত্তি সমূহ প্রাণশক্তির রূপান্তর বলিয়া ইঙ্গিত করাতে নাস্তিকখ্যাতি ও উপহাস লাভের সম্ভাবনা আছে। "বাঘ পালাল, বেড়াল এল, শীকার কর্ত্তে হাতী। মোগলপাঠান হদ্দ হোল ফার্সি পড়ে তাঁতী॥" বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণের অনেকে যে কথা বলিতে সাহস করেন না, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে সে কথা বলা ও অগ্নিতে হস্তনিক্ষেপ উভয়ই সমান। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে বলিয়া রাখিতে বাধ্য হইতেছি, যে ঈশ্বরকে যখন আমরা পরমাত্মা এবং প্রাণস্বরূপ উভয়ই বলিতেছি, তখন প্রাণশক্তির সংহত আকারকে অন্তর্বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে নাস্তিক নাম পাইবার কোনই কারণ দেখিতেছি না। গীতাও বলিতেছেন এবং সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই বলিতে বাধ্য যে—

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

যথাযুক্ত আহারবিহারশীল, যথাযুক্ত কর্ম্মশীল এবং যথাযুক্ত নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তিরই দুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয়। সুতরাং স্পষ্টই দেখিতেছি যে আত্মার পরম ও চরম বৃত্তি যোগ যথাযুক্ত প্রাণনক্রিয়ারই অবিচ্ছিন্ন ফল। যেমন কয়লা হইতে হীরকের উৎপত্তি সম্ভব, সেইরূপ কে সাহস করিয়া বলিতে পারে যে প্রাণশক্তি হইতে এই যোগের উৎপত্তি অসম্ভব। আহার, বিহার, কর্ম্ম, স্বপ্ন, জাগরণ প্রভৃতির সামঞ্জস্যফল (resultant) হইল যোগ। পেটুকের আহার শরীরের অথবা নিজের প্রাণশক্তির অনুপাতে অত্যন্ত অধিক, সেখানে অতিমাত্র আহারের ফলে প্রাণশক্তি সংহত হইবার অবসর পায় না, সুতরাং যোগেরও অভাব ঘটে। অতিমাত্র কর্ম্মী, নিদ্রালু বা জাগরণশীল লোকেরও সেই কারণে যোগসাধন দুঃসাধ্য। সকল বিষয়ে অতিগামীদিগের প্রাণশক্তি কতকটা তরলাবস্থায় থাকে (too diffused)। সেইরূপ অনাহারী, নিষ্কর্ম্মা প্রভৃতি লোকদিগেরও প্রাণশক্তির পরিপুষ্টির অভাবে যোগসাধন হয় না। প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি যে জীবে যে পরিমাণে হইয়াছে, অন্তর্বৃত্তি সমূহও সেই পরিমাণে সেই জীবে পরিস্ফুট। কতকগুলি ঘাস খাইলেই চলিবে না—অল্প সময়ের মধ্যে পরিপাকশীল উপযুক্ত আহারের দ্বারা প্রাণশক্তিকে জীবনসংগ্রামে জয়ী করিতে হইবে; আবার কেবল আহারে প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত হইবে না, কর্ম প্রভৃতি সকল প্রকার উপায়কে সামঞ্জস্যের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। সকল শক্তির মূল যখন এক ভগবান, তখন সকল শক্তিই যে মূলত এক নহে, ইহা কে বলিবে? কে জানিত যে আলোক ও তাড়িত উভয়ই মূলত এক? এখন এক প্রকার সিদ্ধান্তই হইয়া গিয়াছে যে আলোক, তড়িৎ, উত্তাপ এবং সাধারণত সকল জড়শক্তিই মূলত এক। কে জানে যে আর এক শতাব্দীর ভিতরে কি জড়শক্তি কি প্রাণশক্তি, কি আত্মশক্তি, সকলেরই মূলত একপ্রাণতার বিজয় ঘোষণা হইবে না?

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায় মানবাভিব্যক্তির আরও কয়েকটী কথা মূলক দশম কথা সমাপ্ত।
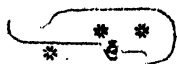
একাদশ কথা—আদিম মানবের স্থান ও কাল নির্ণয়।

ঈশ্বরের রাজ্যে যেমন জীবাদি হইতে মানবের অভিব্যক্তি দেখা যায়, সেই রূপ মানবসমাজেরও ভিতরে অভিব্যক্তির পরিচায়ক চিহ্নের অভাব নাই। এইবারে আদিম মানবের আচার ব্যবহারে অভিব্যক্তির কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই দেখিব। ভূপঞ্জর প্রোৎখাত করিয়া যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে আদিম মানবের নিখুঁত ইতিহাস না হউক, স্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা ঘটিবে বলিয়া বোধ হয় না। বলা বাহুল্য যে এই সকল উপকরণও অসম্পূর্ণ এবং সুতরাং আদিম মানব সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় লইয়াই বাদানুবাদের বিরাম নাই। যে সকল মত পণ্ডিত-মণ্ডলী কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, আমরা সেই সকল মতই আলোচনা করিব।

আচার ব্যবহারের পূর্ব্বে আদিম মানবের স্থান ও কাল নির্ণয়ে কিঞ্চিৎ প্রয়াস করা যাউক। আদিম মানবের প্রথম উৎপত্তিস্থান কোথায়, এই একটী বিষয়ের উপরেই আজ পর্য্যন্ত কত না বাদানুবাদ চলিয়াছে। অভিব্যক্তিবাদের দুই প্রধান প্রবর্ত্তক ডার্বিন ও ওয়ালেস এই বিষয়ে দুই সম্পূর্ণ বিপরীত পথাবলম্বী। ডার্বিন দক্ষিণ ইউরোপে আদিম মানবের কঙ্কাল সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত হইয়া আফ্রিকাকেই তাহার প্রথম জন্মস্থান বলিয়া অনুমান করিলেন। তাঁহার মনের ভাব এই যে, যখন আফ্রিকা ও ইউরোপ সংযুক্ত ছিল, উভয়ের মধ্যে ভূমধ্যসাগরের বৃহৎ ব্যবধান ছিল না, সেই সময়ে মানব আফ্রিকা হইতে ইউরোপে উপনিবেশ করিয়াছিল এবং ক্রমশ ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ওয়ালেস বলেন যে আফ্রিকায় আদিম মানবের জন্মলাভ একেবারেই অসম্ভব। বরাহযুগের প্রারম্ভভাগে আফ্রিকার সহিত ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশের যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় এবং প্রায় সেই একই কালে যে ম্যাডাগাস্কার দ্বীপও আফ্রিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহাও পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি। বাহির হইতে আমদানী বিনা আফ্রিকার নিজ মাটীর গুণে

তদ্দেশজাত বরাহযুগের প্রাক্কালীন জীব হইতে যে কিরূপ স্তন্যপায়ী জীবের উদ্ভব সম্ভব ছিল, মাডাগাস্কার দ্বীপের অনুন্নত স্তন্যপায়ী জীবেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, উদ্ভিজ্জপরিপূর্ণ বলিয়া যদি আফ্রিকাকে মানবের আদিম উৎপত্তি স্থান বলিয়া অনুমান করা হয়, তাহাও সঙ্গত নহে। যোগ্যতমের উদ্বর্তন যদি একটী সত্য সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি যে কেবল উদ্ভিজ্জপরিপূর্ণ স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া ফলমূলের উপর জীবনধারণ নির্ভর করিলে উদ্বর্ত্তিত মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন বর্ত্তমান মানবের অনুরূপ হইত না—তাহাদের হস্তপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গরিলা প্রভৃতির ন্যায় বক্রগ্রন্থি হইয়া থাকিত, বর্ত্তমান মানবের ন্যায় অন্যান্য অঙ্গুলির সহিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সমান্তরালপ্রায় ভাবে অবস্থান অসম্ভব হইত। আর, মানবের হস্তপদ গাছের ডালপালা ধরিতেই সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত থাকিলে তাহাদের এত সত্বর উন্নতিলাভ ঘটিত না—ইহার দৃষ্টান্ত নিগ্রোবটু ও নেগ্রিল (Negritto and Negrillo)। তাহারা মালয় দ্বীপপুঞ্জের ও আফ্রিকার ঘোর অরণ্যের মধ্যে বাসস্থান লাভ করিয়া বানর প্রভৃতি নিম্নতর জীব হইতে এক পদও উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। তাহারা গাছে বাসা বাঁধিয়া রাত্রি যাপন করে এবং পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীগণ অনেক সময়ে তাহাদিগকে বানর বলিয়াই ভ্রম করিয়া থাকেন।

পণ্ডিতবর ওয়ালেসের মতে বিশাল ইউরেশীয় সমতল অধিত্যকারই কোন এক অংশ আদিম মানবের জন্মস্থান। এই বিশাল অধিত্যকার মধ্যে মাঞ্চুরিয়া, তিব্বত, পারস্য, সাইবীরিয়া প্রভৃতি বৃহৎ প্রদেশ সকল অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার এই অনুমানের কারণ এই যে এই অধিত্যকার প্রধান অধিবাসী মঙ্গোলীয় জাতি—তাহাদের করোটী ও মুখমণ্ডলের সহিত আদিম মানবের প্রাপ্ত করোটী প্রভৃতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং তাহাদের গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ, ওয়ালেসের মতে এই বর্ণই আদিম মানবের গাত্রবর্ণ ছিল। তাঁহার এই দুইটী উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও আমরা বলিতে বাধ্য যে এই দুইটী বিষয়ে সাদৃশ্য উল্লেখই আদিম মানবের জন্মস্থান নির্ণয় করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এশিয়ার উষ্ট্র এবং আমেরিকার লামা একজাতীয় জীব, কিন্তু মরুভূমিতে বিচরণকালে উষ্ট্রের জলস্থলী ও পদতলের চেপ্টাভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু পার্ব্বত্য প্র-

দেশে বিচরণ হেতু লামার আর জলস্থলীও অভিব্যক্ত হয় নাই এবং পদ-তলের চেপ্টা ভাবও হয় নাই। সেইরূপ হইতে পারে যে স্থান ও অবস্থা মাহাত্ম্যে আদিম মানবের সহিত মঙ্গোলীয়দিগের মুখমণ্ডলের সাদৃশ্য থাকিয়া গিয়াছে। মোটের উপর ওয়ালেসের নির্দ্দিষ্ট স্থান এত বিস্তৃত যে তাহার এক অংশে আদিম মানবের জন্ম বলিলে প্রকৃত পক্ষে কিছুই বলা হয় না। পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধের এক অংশে আদিম মানবের উৎপত্তি হইয়াছে, একথাও প্রায় ওয়া-লেসের উক্তির সহিত সমান হইয়া পড়ে।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর ভাষাতত্ত্ব অবলম্বনে বলেন যে ইরাণীয় উপত্যকাই আদিম মানবের জন্মস্থান। বৈদিক সংস্কৃত, প্রাচীন পারস্য, গ্রীক, লাটিন, স্যাক্সন প্রভৃতি ভাষায় অনেক গার্হস্থ্যোপযোগী দ্রব্যাদির নামের মূল এক দেখা যায়। আবার দেখা যায় যে দেব অসুর প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ অর্থ, আদিম পারস্য ভাষায় ঠিক তাহার বিপরীত অর্থ। এরূপ শব্দপ্রমাণ অবলম্বনে মোক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে ভারতের প্রাচীন আর্য্য, রোমক, গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্য আর্য্য, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই এক সময়ে একত্র বসবাস করিত এবং সম্ভবত ইহাদের মূল্যও এক ছিল, পরে বিবাদ ও অন্যান্য কারণে সেই পূর্ব্বপুরুষেরা বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশ দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। আমাদিগের অনুমান হয় যে ইরাণীয় উপত্যকা মানবের আর্য্য অংশের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই কারণে সেই আর্য্যদিগের ভাষাও সর্ব্বপ্রথম উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়াছিল। ইরাণীয় আর্য্যগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশদেশান্তরে সেই উন্নত ভাব ও ভাষার স্পর্শ লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া যে সেই আদিম কর্ম্মক্ষেত্রকে আদিম মানবেরও প্রথম জন্মস্থান স্বীকার করিতে হইবে, তৎসমর্থক বিশেষ কোন প্রমাণ দেখিতেছি না।

তবে আদিম মানবের জন্মস্থান কোথায়? আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়েই ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি যে আমাদের মতে সুমেরুখণ্ডেই মানবের প্রথম জন্ম। বর্ত্তমান সাইবীরিয়ার উত্তরাংশেই বোধ হয় সর্ব্ব প্রথম মানব আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতকে ধন্য করিয়াছিল। সময়ে এই প্রদেশেও উষ্ণপ্রধান বিষুব বৃত্তের উপযুক্ত উদ্ভিজ্জ অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু বোধ হয় পরে এই

প্রদেশ কিছু পার্বতীয় হইয়া উঠাতে মানবাভিব্যক্তির সহায় হইয়াছিল—মানবের পূর্বপুরুষদিগকে কেবল গাছের ডালপালা ধরিয়া বেড়াইতে হয় নাই, তাহারা শীকারান্বেষণে হস্তপদ ও বুদ্ধি চালনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দক্ষিণ দিকও সম্ভবত মানবের জন্মদান করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনই চিহ্ন পাওয়া যায় না বলিয়া দক্ষিণ দিকের মানবযুগের সহিত বর্ত্তমান মানবযুগের প্রারম্ভের কোন সম্পর্ক ধরিলাম না। সুপ্রসিদ্ধ সুইডীয় পণ্ডিত কাউণ্ট জর্ণষ্টর্ণা সুমেরু বৃত্তকেই আদিম মানবের জন্মস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আমাদের শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিলেও বোধ হয় আদিম মানবের উৎপত্তি-বিষয়ক দু'একটী তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে। মেরু প্রদেশ দেবগণের আদিম বাসস্থান বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে এবং রামায়ণে পাওয়া যায় যে মেরু প্রদেশে সূর্য্য অস্ত যায় না। এই মেরু প্রদেশ এবং আমাদের সুমেরুবৃত্ত অভিন্ন বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে পূর্বদিকে দেবগণের আবাস, দক্ষিণদিকে পিতৃদিগের আবাস, এবং উত্তর দিকে মানবের আবাস (১ম কাণ্ড, ২ অং ৫ ব্রাং)। এই উক্তি হইতে আমরা অনুমান করিয়াছি যে সুমেরু বৃত্তের বহু পূর্ব্বে কুমেরু বৃত্তে সময়ে মানবের আবির্ভাব হইয়াছিল। বর্ত্তমান মানবের আদিপুরুষ যে সুমেরুবৃত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, ঋষিরা তাহা স্পষ্টই জানিতেন বলিয়া বোধ হয়। নৃসিংহাবতারকথা হইতেও মানবের উত্তর দিক হইতে আগমন সমর্থিত হয় বলিয়া অনুমান করি। দৈত্য হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার বৃদ্ধি হওয়াতে "দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু হিমালয় পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া নরসিংহরূপ ধারণ স্থির করিয়াছিলেন।" হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করিবার পর "নারায়ণ নরসিংহরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মূর্ত্তিতে ক্ষীরোদসাগরের উত্তরকূলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।" এই ক্ষীরোদ সাগর কোথায়? ভূস্তরের গঠনকাল হিসাবে ধরিয়া অধ্যাপক হক্স্লি বলেন যে কিছু কাল পূর্বে কৃষ্ণসাগর, কাস্পী হ্রদ, আরল হ্রদ এবং বালকশ হ্রদ প্রভৃতি এসিয়ার মধ্যস্থিত জলরাশি সমূহের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন হ্রদের পরিবর্ত্তে এসিয়ার মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ ভূমধ্যসাগর বর্ত্তমান ছিল। সম্ভবত তাহাতে নানা নদীর জল আসিয়া পড়িত এবং গভীরতা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী ছিল বলিয়া তাহার জলের আস্বাদ মিষ্ট ছিল এবং সেই কারণে ইহাই

পুরাণে ক্ষীরোদ সাগর বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে সাইবীরিয়ার মরুভূমিও এই ক্ষীরোদ সাগরের অন্তর্গত ছিল। ক্ষীরোদ সাগরের উত্তরকূলের অর্থে আমরা সাইবীরিয়ার উত্তরাংশই বুঝিয়াছি। ক্যাত্‌রফাগেস তাঁহার "মানবজাতি" পুস্তকে বলেন যে সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আমরা অনুমান করিতে বাধ্য যে বৃহৎকায় স্তন্যপায়ী জীবসমূহের পশ্চাতে আদিম মানব উত্তর দিক হইতে দক্ষিণদিকে নামিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি সুমেরু বৃত্ত হইতে দূরতম প্রদেশেও আদিম মানবের বহুকালাবধি অস্তিত্ব পরিচয় পাওয়া যায়। আদিম মানবের দক্ষিণ দিকে উপনিবেশ হইয়াছিল স্বীকার করিলেও এই সকল স্থানে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় কি না? এসিয়া হইতে আমেরিকা বহুপূর্ব্বাবধিই বিচ্ছিন্ন আছে—আমেরিকার দক্ষিণতম অংশে আদিম মানবের আবির্ভাব উপনিবেশ অনুমানের সাহায্যে বুঝান যায় কি না? ক্যাত্‌রফাগেস তাঁহার উপরোক্ত পুস্তকে কালমুখ যবনদিগের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন যে আদিম মানবের পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে। মানুষের বিস্তৃতির পক্ষে এক মানুষ ব্যতীত আর কোন গুরুতর প্রতিবন্ধক আছে বলিয়া বোধ হয় না। হানিবল তাঁহার হস্তীযূথ এবং নেপোলিয়ন তাঁহার কামানব্যূহ লইয়া তুষারাবৃত আল্পস পর্বত অতিক্রম করিয়াছিলেন। কালমুখ যবনগণ মোগল জাতীয় ও চীনরাজের প্রজা ছিল। একবার চীনরাজের সহিত ইহাদের মনান্তর হওয়ায় ইহারা চীনরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বল্গাতীরে রুষরাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক কিছুকাল নির্বিবাদে কাটাইয়া দিয়াছিল। অবশেষে রুষরাজের সহিত ইহাদের মনান্তর হওয়ায় ইহারা চীনরাজ্যে প্রতিগমন করিতে মনস্থ করিল। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে দেখা গেল যে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর দশ পনেরো হাজার অশ্বারোহীর তত্ত্বাবধানে পনেরো কুড়ি হাজার কালমুখ বল্গাতীর হইতে যাত্রা করিতে লাগিল। অশীতি সহস্র দক্ষতম কালমুখ এই সকল যাত্রীদিগের পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত রহিল। এইরূপে যথাসম্ভব সত্বরতা ও সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক রুশিয়ার সেই ভীষণ শীতের মধ্য দিয়া ছয় লক্ষ কালমুখ সাতদিনের মধ্যে
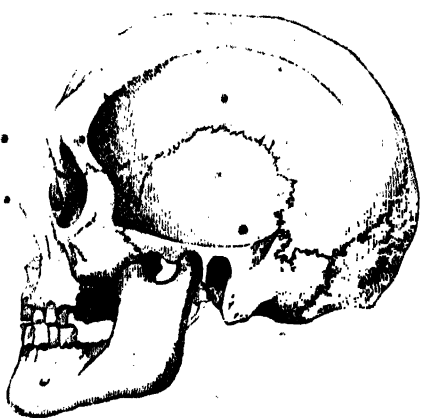
৩৬শ চিত্র।　　　　　　৩৭শ চিত্র

কালমুখ যবনের করোটীর সম্মুখ ও পার্শ্ব দৃশ্য—($\frac{1}{2}$ আকৃতি)

অঃ বাঃ পৃঃ ১২৪।

৩৮৩ মাইল চলিয়াছিল। শীতের কঠোরতার প্রভাবে রাশি রাশি পশু বিনষ্ট হওয়াতে যাত্রীদিগের মধ্যে শিশুদিগেরও দুগ্ধের অভাব ঘটিয়াছিল। জেম নদীতীরে একদল অশ্বারোহী কালমুখ রুশিয়ার কসাক সৈন্য কর্ত্তৃক নিরবশেষে নিহত হইয়াছিল। একদিকে রুষসৈন্য হইতে সহসা আক্রমণভয়, অপর দিকে প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাতে সবলে ধ্বংসের ভয়, এই উভয় ভয়ের মধ্যে পতিত হইয়া কালমুখগণ দ্বিগুণিত বেগে চলিতে লাগিল—পথিপার্শ্বে শতসহস্র কঙ্কাল তাহাদিগের গমনপথ চিহ্নিত করিতে লাগিল। এইরূপে পাঁচমাসে ২১০০ মাইল চলিয়া অবশেষে মৃতাবশিষ্ট পশু ও যাত্রীগণ চীনের সীমানায় আসিয়া পৌছিল। আড়াই লক্ষ যাত্রী এবং উষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় সহগামী জীব এই ভীষণ যজ্ঞে জীবন আহুতি দিয়াছিল। এত বিপদ মস্তকে লইয়া যখন একদল মানব সহস্র সহস্র মাইল অতিক্রম করিতে পারিল, তখন, যে সময়ে মানুষের সংখ্যা অল্প ছিল এবং সুতরাং মানুষদিগের পরস্পরের নিকটে হিংসাদ্বেষ জনিত বাধা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, সেই সময়ে যে আদিম মানবগণের ধীরে সুস্থে চলিতে চলিতে পৃথিবীর সুদূরতম অংশেও প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল, তাহা বুঝাইতে অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। কেবল পর্বত, মরুভূমি-বিশিষ্ট দেশ সমূহ অতিক্রম করিয়া নহে, মহা মহা সাগর ব্যবধান অতিক্রম করিয়াও যে আদিম মানবের দেশদেশান্তরে উপনিবেশের সম্ভাবনা ছিল, ক্যাতরফাগেস তাহা নানা দৃষ্টান্ত ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। পঞ্জাব দেশের কাংড়া জেলায় নৃসিংহপূজা প্রচলিত আছে—নারিকেল পুষ্পাদির সাহায্যে সেই পূজা নিষ্পন্ন হয়। তাহা হইতে আমাদের অনুমান হয় যে ভারতের দিকে অন্তত পঞ্জাব পর্য্যন্ত আদিম মানবের শুভাগমন হইয়াছিল—সেই সময়ে পঞ্জাবেও সাগর অভিপ্রবিষ্ট ছিল ও সুতরাং নারিকেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। সেই আদিম মানবের আগমনবার্ত্তাই পূজার মধ্য দিয়া আসিয়া আমাদিগের ইতিহাস রচনার সহায়তা করিতেছে।

আদিম মানবের উৎপত্তির স্থাননির্ণয় যেমন দুঃসাধ্য, কালনির্ণয়ও ততোধিক দুঃসাধ্য। নৃসিংহযুগে যে মানবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই—কারণ, প্রকারান্তরে বলিতে গেলে যে সময়ে মানবের প্রথম প্রাদুর্ভাব সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহারই নাম পণ্ডিতেরা আদিম মানবের যুগ এবং আমরা নৃসিংহযুগ

আখ্যা প্রদান করিয়াছি। আদিম মানবের উৎপত্তিকালবিষয়ক বাদানুবাদের একটী প্রধান বিষয় এই যে বরাহযুগে আদিম মানবের অভিব্যক্তি হইয়াছিল কি না। নৃসিংহযুগে আদিম মানবের যে প্রকার প্রাচুর্ভাব দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে বরাহযুগে নিশ্চয়ই মানবের আবির্ভাব ঘটীয়াছিল, নচেৎ নৃসিংহযুগে তাহার সহসা এত অধিক বিস্তৃতি সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। নৃসিংহাখ্য আদিম মানবের কঙ্কাল এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি নানা স্থানে প্রাপ্ত হইয়া সময়ে ভূখণ্ডের প্রায় সর্বত্র তাহার বিস্তৃতি সূচিত করিয়া দিতেছে।

বরাহযুগে যে মানবের অভিব্যক্তি হইয়াছিল, তাহার আরও গুরুতর প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। যে সকল ভূস্তর নৃসিংহযুগের অন্তর্গত বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে, সেই সকল স্তরের একটীতেও দক্ষিণাস্থ হস্তীর (Elephas Meridionalis) কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই। এই দক্ষিণাস্থ হস্তী বরাহযুগের অন্তস্তরের শেষ অংশেরই জীব বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল হস্তীর কঙ্কালের সঙ্গে মানবীয় অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে এবং কয়েকটী অস্থিতে প্রস্তরাস্ত্রের আঘাতচিহ্নও যেন দেখা যায়। বরাহযুগের অন্তস্তরের শেষ অংশের কথা বলিলাম, আবার মধ্যস্তরের প্রথম অংশেও যে সকলে জীবকঙ্কাল পাওয়া যায়, তাহাদেরও মধ্যে কোন কোন হাড়ে অস্ত্রাঘাত চিহ্ন যেন পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয়। মধ্যস্তরের শেষ অংশে বিপত্রিত অগ্নিপ্রস্তর (chipped flints) পাওয়া যায় বোধ হয়। পাঁচ রকম অগ্নিপ্রস্তর হইতে একই রকমে প্রস্তুত অস্ত্র দেখা গিয়াছে। উপরে অনেক স্থলে আমি "বোধ হয়" প্রভৃতি অনুমান-সূচক শব্দের উল্লেখ করিয়াছি—সেই সকল বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে, সেগুলি সর্ব্ববাদসম্মত নহে। বরাহযুগের অন্তস্তরের প্রথম অংশে চারিটী কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটী স্ত্রীলোকের এবং দুইটী বালকের। আশ্চর্য্য এই যে এই কঙ্কালগুলি নৃসিংহযুগের প্রাপ্ত কঙ্কাল-অপেক্ষা পশুত্বহীন। কিন্তু এখনও স্থির হয় নাই যে এই সকল কঙ্কাল সত্য সত্য বরাহযুগের মানবের অথবা নৃসিংহযুগের মানবকঙ্কাল কোন প্রকারে বরাহযুগের স্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। আমেরিকায় আইডাহো প্রদেশের নম্পা গ্রামে বরাহ যুগের একটী স্তরে এক ইঞ্চি মাত্র লম্বা একটী মৃণ্ময় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—তাহার এক অংশ অগ্নিদগ্ধ। তাহার গাত্রে লৌহদর্স্তানের (oxide of iron) স্তর পড়াতে
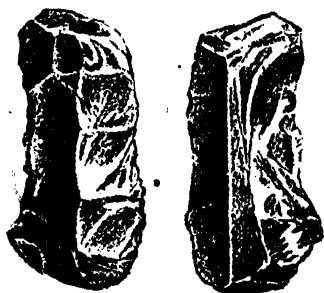
৩৮শ চিত্র।
বর্মা হইতে প্রাপ্ত আদিম
অস্ত্র—বিপত্রিত অগ্নিপ্রস্তর।
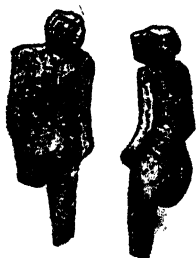
অঃ বাঃ পৃঃ ১২৬।

৩৯শ চিত্র।
নম্পা গ্রামে প্রাপ্ত মৃন্ময় মানব মূর্তি।

অঃ বাঃ পৃঃ ১২৬।

তাহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই। এই মূর্ত্তি যখন প্রথম আবিষ্কৃত হইল তখন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছিল। যাই হোক, এই মূর্ত্তি সত্য সত্য বরাহযুগের মানবের হস্তরচিত কিনা, তদ্বিষয়ে এখনও বিশেষরূপই মতদ্বৈধ আছে। বরাহযুগের উবস্তরে মানবাস্তিত্বের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

বরাহযুগে যদি মানবের বিস্তৃত অস্তিত্বই ছিল, তবে নৃসিংহযুগের ন্যায় তাহার পরিচয়বাহুল্য পাওয়া যায় না কেন? নৃসিংহযুগের ন্যায় বরাহযুগের মানবের কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি যে বরাহযুগ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমণ্ডলে গ্রীষ্মঋতুরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য ছিল, শীতঋতুর আবির্ভাবই হয় নাই। সুতরাং সম্ভবত অন্যান্য জীবগণের ন্যায় মানুষও গুহা প্রভৃতি নির্জ্জন ও শীতনিবারক স্থানে আশ্রয় লইবার পরিবর্ত্তে মাঠে জঙ্গলে বিচরণ করিত। অন্যান্য জীবজন্তু নদীপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে প্রোথিত হইয়া নিজেদের জীবনের বিনিময়ে পৃথিবীর ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু মানুষ নিজ বুদ্ধিবলে সেই সকল বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের পথে বিশেষ বিঘ্ন আনয়ন করিয়াছে—তাহাদের কঙ্কাল সকল উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত না হওয়াতে জল সূর্য্যো-ত্তাপ প্রভৃতির রাসায়নিক কার্য্যফলে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মানবা-স্তিত্বের প্রধান সাক্ষী কঙ্কালের অস্তিত্ব বরাহযুগে দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সাক্ষ্যের যে একান্ত অভাব তাহা নহে। ইতিপূর্ব্বেই জীবগণের অস্থিতে অস্ত্রাঘাতচিহ্নের কথা বলিয়া আসিয়াছি। চারিটী কঙ্কাল প্রাপ্তির এবং মৃণ্ময়মূর্ত্তি প্রাপ্তিরও উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল ব্যতীত আমেরিকায় ক্যালিফর্ণিয়ার স্বর্ণখনি হইতে বরাহযুগের স্তরে মানবহস্তের অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই স্বর্ণখনির ভিতরে পাথরের হামামদিস্তা পা[illegible] গিয়াছে। আমেরিকার এই অঞ্চলের বারাহ স্তর সকল প্রাচ্য মহাদেশের বারাহস্তর অপেক্ষা অনেক আধু-নিক। আর, প্রাচ্য মহাদেশে যেমন বরাহ ও নৃসিংহযুগের মধ্যে হিমাচ্ছাদনের ফলে একটা সীমা-রেখা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, আমেরিকায় সেরূপ হয় নাই। তথায় স্থানে স্থানে হিমকেন্দ্র হইয়াছিল এবং হিমাচ্ছাদন অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল। সুতরাং আমেরিকার বারাহ স্তরসমূহকে ঠিক বরাহ যুগের

বলিতে পারি কি না সন্দেহ এবং উপরোক্ত হামামদিস্তার নির্ম্মাতা মানব সত্যই বরাহযুগে আবির্ভূত হইয়াছিল কি না বলা বড়ই দুরূহ। আমাদের অনুমান হয় যে আমেরিকার, বিশেষত কালিফর্নিয়া অঞ্চলের আমানব জীবসকল প্রাচ্য মহাদেশে নৃসিংহযুগে আবির্ভূত হইয়া তথায় বারাহস্তরসংগঠন কালে উপনিবেশ করিয়াছিল।

আদিম মানবের কাল নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা দেখিয়া আসিলাম যে নৃসিংহযুগে মানুষের আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা সকলেই একমত, কিন্তু বরাহ যুগের মধ্যস্তরে মানবের অস্তিত্বপরিচয় পাইলেও পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে অভিন্নমত হইতে পারেন নাই। এইবারে আমরা অন্য এক প্রণালী অবলম্বনে আদিম মানবের জন্মকাল নির্ণয়ে অগ্রসর হইব। নৃসিংহযুগের মানবকঙ্কালগুলি অধিকাংশই পর্ব্বতের গুহা প্রভৃতি আচ্ছাদিত স্থানে পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে হিমশৈলের কঠোরতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য অন্যান্য জীবগণের ন্যায় মানবও শীতাতপনিবারক গুহা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। নৃসিংহ যুগে ধরণী যে হিমাচ্ছাদনে আবৃতপ্রায় হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি। অধিক জ্বরের পর উত্তাপ সহসা কমিয়া গিয়া রোগীর গা যেমন হিম হইয়া পড়ে, সেইরূপ সৃষ্টির আদি অবধি বরাহ যুগ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ উত্তাপের পর কোথা হইতে হিমশৈল আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর অধিকাংশ ছাইয়া ফেলিল।

এই হিমস্তূপ সময়ে গলিয়া গিয়া শত শত নদনদীর যে জন্মদান করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য—রাইন নদ এই সকল নদ নদীর অন্যতর। এই রাইন নদের আদিম গর্ভে হিমগলিত প্রবাহে আনীত পলি দেখা যায় প্রায় ৮০০ ফুট গভীর। নীলনদের বন্যায় যে পলি পড়ে, পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে তাহার পরিমাণ শতাব্দীতে তিন ইঞ্চি মাত্র। এই হিসাবে গণনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে রাইন নদের পলি পড়া আরম্ভ হইয়াছিল অন্তত ৩২০০০০ বৎসর পূর্ব্বে। বলা বাহুল্য যে হেমন্ত যুগের পূর্ণ প্রভাবের সময় হিমশৈল সকল গলিয়া নদনদী প্রস্তুত করণে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বলা যায় যে হেমন্ত যুগের শীতের শেষ সীমার পর, যতদূর সম্ভব হিমাচ্ছাদন সম্পূর্ণ হইবার পর, কতকটা পূর্ব্বের ন্যায় গ্রীষ্মঋতুর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল এবং তাহারই ফলে রাইন প্রভৃতি নদনদীর উৎপত্তি।

হিম যুগের পর আবার দারুণ গ্রীষ্মের আবির্ভাব হইল কেন? অধিকাংশ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্বীকার করেন যে সম্ভবত হিমশৈলের ভারে ভূপঞ্জর কিছু নামিয়া গিয়া সাগরের উষ্ণস্রোত প্রবেশের পথ রচনা করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে ধরণী আবার শ্যাম শোভা ধারণ করিবার অবসর পাইলেন। সুইডেনের দুই হাজার ফুট উচ্চে সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে সুইডেন হেমন্ত যুগের শেষ সীমায় বর্ত্তমান অপেক্ষা অন্তত ২০০০ ফুট অধিকতর উচ্চ ছিল। গ্রেট ব্রিটেন তৎকালে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক উচ্চ ছিল এবং হিমশৈলের ভারে ২০০০ ফুটেরও অধিক নামিয়া গিয়াছিল। এইরূপে সম্ভবত সুইডেন উচ্চ ভূমির নামিবার সূত্রপাত হইতে অন্তত ৬০০০ ফুট ওঠানামা করিয়াছে এবং হিম ভারে অন্তত ৪০০০ ফুট সাগরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ লায়েল পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে শতাব্দীতে আড়াই ফুট ভূপঞ্জর উঠিয়া থাকে। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে হিমশৈল গলিয়া নদনদী প্রস্তুত হইবার ন্যূনাধিক ১৬০০০০ বৎসর পূর্ব্বে সুইডেন বরফের চাপে নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই খানে দেখিতেছি যে হেমন্তযুগের প্রচণ্ডতম প্রভাব পৃথিবীর উপরে অন্তত ৪৮০০০০ বৎসর পূর্ব্বে পড়িয়াছিল। সুতরাং ইহাও বলা যাইতে পারে যে অন্তত ৪৮০০০০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে মানবের বিস্তৃত অস্তিত্ব ছিল এবং তাহারা ভীষণতম শীত হইতে আত্মরক্ষার জন্য গুহা প্রভৃতি স্থান আশ্রয় করিয়াছিল। আমাদের অনুমান হয় যে শীত প্রচণ্ডতম হইবার বহুপূর্ব্বাবধিই মানব গুহাশ্রয়ী হইতে বাধ্য হইয়াছিল। ফকনার বলেন যে ভারতে বরাহযুগে মানবের অস্তিত্বপরিচয় পাওয়া যায়। ইহা সত্য হইলে আদিম মানবের কালনির্ণয়ে আমাদিগকে আরও অনেক পিছাইয়া যাইতে হয়। বরাহযুগে মানবের অস্তিত্ব যে বিশেষ আশ্চর্য্যকর নহে তাহা [illegible]য় ভূতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক প্রেসট্‌উইচের উল্লিখিত প্রমাণেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

অধ্যাপক প্রেসট্‌উইচ ইংলণ্ডের ওয়েলডীয় পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে ৮০০ ফুট উচ্চে মানব-নির্ম্মিত অস্ত্র পাইয়াছিলেন। স্থানীয় অবস্থা পরীক্ষা করিয়া তিনি বলেন সেই অস্ত্র নিশ্চয়ই আরও ২০০০ ফুট উর্দ্ধে ছিল—সেই ২০০০ ফুট ক্ষয় হইয়া যাওয়াতে এখন ৮০০ ফুট মাত্র উর্দ্ধে নামিয়া পৌছিয়াছে। আবার

সেই নীল নদের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ৩০০০ বৎসরে এক ফুট মাটী ক্ষয় হয়। সুতরাং ২০০০ ফুট ক্ষয় করিতে ন্যূনাধিক ৬০ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে। প্রকারান্তরে দেখিতেছি যে ৬০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও মানুষের অস্তিত্ব ছিল। যখন মানবের আবির্ভাবকাল পণ্ডিতগণের মধ্যে চার পাঁচ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তখন এইস্থলে পঞ্জিকাকারদিগের মতে কত বৎসর দাঁড়ায় দেখিলেও ক্ষতি নাই বোধ হয়। কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর, দ্বাপরের ৮৬৪০০০ এবং ত্রেতার ১২৯৬০০০ বৎসর। সত্য-যুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর এবং চার অবতার, সুতরাং গড়ে প্রত্যেক অবতারের কালপরিমাণ ৪৩২০০০। বরাহ যুগের তিন স্তর ধরিলে প্রত্যেক স্তরে ১৪৪০০০ পড়ে। বর্ত্তমানে ৫০০৩ কলিগতাব্দ চলিতেছে। এখন বরাহযুগের মধ্যস্তর অবধি কলিযুগের শেষ পর্য্যন্ত ধরিলে ৩৩৯২০০০ বৎসর হয় এবং বর্ত্তমান কলিগতাব্দ পর্য্যন্ত ধরিলে ২৪৫৩০০৩ বৎসর হয় অথবা অন্তত ২৪ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানবের অস্তিত্ব ছিল। যতদূর সম্ভব নানাদিক দিয়া আমরা আদিম মানবের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথার আদিম মানবের স্থান ও কাল নির্ণয় মূলক একাদশ কথা সমাপ্ত।

দ্বাদশ কথা—আদিম মানবের আচার ব্যবহার।

এইবারে আমরা আদিম মানবের আচার ব্যবহারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। মনুষ্যের আকৃতি অনেক সময়ে তাহার গুণ এবং আচার ব্যবহার ব্যক্ত করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নৃসিংহযুগের তিনটী স্তরে প্রধানত তিন জাতীয় মনুষ্যকঙ্কাল আবিষ্কার করিয়াছেন—আমরা কিন্তু প্রথম দুই স্তরকে নৃসিংহযুগের অন্তর্গত ধরিব এবং তৃতীয় স্তরকে বিভিন্ন যুগের অন্তর্ভুক্ত করিব। প্রথম দুই স্তরে যে দুই জাতীয় কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রথম আবিষ্কারস্থানের নামানুসারে যথাক্রমে ক্যানষ্ট্যাড (canstadt) ও ক্রোম্যাগনন (cro-magnon) রাখা হইয়াছে। হক্সি ক্যানষ্ট্যাড মানবের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে তাহাকে অতিশয় হিংস্রক ও পশুভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়। "এই মানব আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাদের গঠন খুব দৃঢ়। ইহার উরুর অস্থি ঈষৎ বঙ্কিম; এই অস্থির নিম্ন প্রান্ত এরূপ ভাবে গঠিত যে সে জানু কিঞ্চিৎ না বাঁকাইয়া চলিতে পারিত না। ইহার করোটী (skull) লম্বা ও চেপ্টা। ইহার ভ্রূদ্বয় বানর প্রভৃতির ন্যায় বাহিরে ঝুঁকিয়া থাকিত। পরিস্ফুট চিবুক মানবের উন্নতির একটী প্রধান লক্ষণ, ক্যানষ্ট্যাড মানবের সেই চিবুকের সম্পূর্ণ অভাব ছিল এবং সেই কারণে ইহার চোয়াল দুটীর নিম্ন অংশ গভীর ও নীরেট এবং নীচের দিকে ও পিছনদিকে ঝোলানো। এইরূপ চোয়ালের ঝোলানো ভাব নিতান্তই পশুত্বব্যঞ্জক। ইহার অগ্রবাহু সভ্য মানব অপেক্ষা অনেক লম্বা ছিল, হাড়গুলো মোটা এবং হস্তপদের কব্জাগুলি অপেক্ষাকৃত বর্ত্তুলাকার। ইহাদের নাকের হাড়গুলি চেপ্টা। ইহাদের মাথা কিছু বিলম্বিত এবং মস্তিষ্কের অধিকাংশ করোটীর পশ্চাদংশে রক্ষিত। ইহাদের কপাল সরু ও পশ্চাদ্বিলম্বিত।"ক্যানষ্ট্যাড মানবের কঙ্কাল উত্তরে দক্ষিণে এত অধিক সংখ্যক পাওয়া গিয়াছে যে পণ্ডিতেরা নৃসিংহযুগের প্রারম্ভকালে ইহার অত্যন্ত বিস্তৃতি অনুমান করিয়া থাকেন।

নৃসিংহযুগের দ্বিতীয় স্তরে প্রাপ্ত ক্রোম্যাগননের সহিত ক্যানষ্ট্যাডের

সাদৃশ্য অল্প এবং প্রভেদ বিস্তর। সাদৃশ্যের মধ্যে উভয়ের করোটী বিলম্বিত এবং মস্তিষ্কের অধিকাংশ করোটীর পশ্চাদংশে রক্ষিত। এখনও চিবুকের অভাব আছে এবং চোয়ালের নিম্ন অংশ এখনও নীচের দিকে ও পিছনদিকে একটু ঝোলানো আছে। এই সাদৃশ্য ব্যতীত আর সকল বিষয়েই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ। ক্রোম্যাগনন মানব অপেক্ষাকৃত লম্বা ছিল—গড়ে ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি, একটীর দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি দেখা গিয়াছে। ইহার কপাল উপযুক্ত উঁচু ও নিটোল ছিল—আর সরু ও পশ্চাদ্বিলম্বিত নাই। ভ্রূদ্বয়ের আর সেরূপ বাহিরে ঝুঁকিয়া আসিবার ভাব নাই। পশুত্বব্যঞ্জক অন্যান্য চিহ্ন সকলও প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। নাসিকার চেপ্টাভাব চলিয়া গিয়া বহির্বিকাশ ও শুকনাসাত্ব লাভ হইয়াছে। মস্তিষ্ক যথাপরিমিত স্থান অবলম্বন করাতে মুখের কাঠামো সুদৃশ্য হইয়াছে। কি ক্যান্‌ষ্ট্যাড, কি ক্রোম্যাগনন, কাহারও জটা ও লোমবিভূষিত দেহের কোন বিবরণ দেখি নাই, কিন্তু আদিম মানব সম্বন্ধীয় একটী পুস্তকে সম্ভবত ক্যানষ্ট্যাড মানবের যে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে জটাযুক্ত দেহই সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়।

আদিম মানবের যুগকে আমরা নৃসিংহ নামে অভিহিত করিয়াছি, কিন্তু ক্যান্‌ষ্ট্যাড ও ক্রোম্যাগনন, এই দুই জাতীয় মানবের মধ্যে কাহাকে নৃসিংহ বলা যাইতে পারে? যতদূর বুঝা যায়, ক্রোম্যাগনন মানবই নৃসিংহ নামের উপযুক্ত। নৃসিংহধ্যানে আছে যে তাহার শরীর স্বর্গস্পর্শী বা দীর্ঘায়তন, তাহার গ্রীবা অদীর্ঘ ও স্থূল, বক্ষঃস্থল বিশাল। তাহারা অতিশয় দৃঢ় এবং অত্যন্ত অধিক পেশীবলবিশিষ্ট। তাহাদের উরু অত্যন্ত চওড়া ও নিবিড়। শঙ্খ, চক্র, পাশ, অঙ্কুশ, কুলিশ, গদা প্রভৃতি অস্ত্র তাহার সহচর। নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে নখরাস্ত্র বা "বাঘনখ" প্রভৃতির ন্যায় নখরাকার কোন অস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে নৃসিংহের স্তম্ভভেদ করিয়া প্রকাশ হইবার কথারও উল্লেখ আছে। নৃসিংহের দেহ ও বিশেষত কণ্ঠ জটা ও লোমে বিভূষিত।

ইতিপূর্ব্বেই আমরা ক্রোম্যাগনন মানবের যে বর্ণনা দিয়াছি, তাহাতে উভয়ের দেহসাদৃশ্য বেশ বুঝা যাইবে। তদ্ব্যতীত, ক্রোম্যাগনন নানাপ্রকার এবড়োখেবড়ো অস্ত্র ব্যবহার করিত। তীক্ষ্ণধার ফলকবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বল্লম অধি-

৪০শ চিত্র।

ক্যানষ্ট্যাড মানব।

(The story of primitive men হইতে গৃহীত)

৪১শ চিত্র।

প্রস্তর বর্শাফলক।

অঃ বাঃ পৃঃ ১৩২।
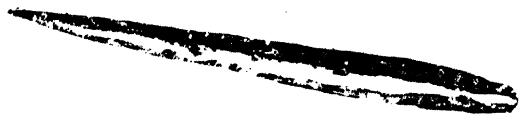
৪২শ চিত্র।
ক্রোম্যাগননের প্রস্তর ছোরা।
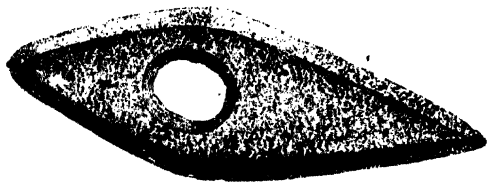
৪৩শ চিত্র।
ক্রোম্যোগননের সচ্ছিদ্র কুঠার।
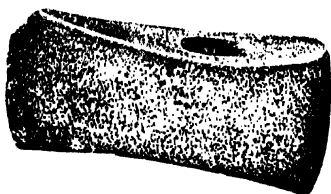
৪৪শ চিত্র।
ক্রোম্যাগননের কুঠারমস্তক।

৪৫শ চিত্র।
হরিণ শৃঙ্গে বসান কুঠার।

৪৬শ চিত্র।
পাথরের ছুরি।

৪৭শ চিত্র।
প্রস্তর-খন্তা।
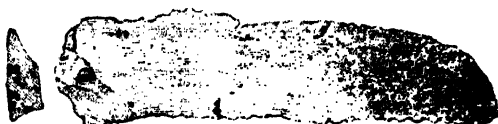
৪৮শ চিত্র।
প্রস্তর-করাত।
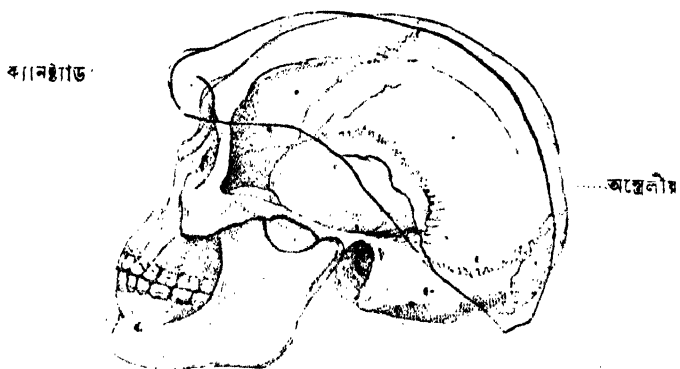
৪৯শ চিত্র।

অস্ট্রেলীয় করোটী চিত্রে, আদিম ক্যানষ্ট্যাড মানবের করোটীর আকৃতি প্রদর্শিত।

($\frac{1}{4}$ আকৃতি)
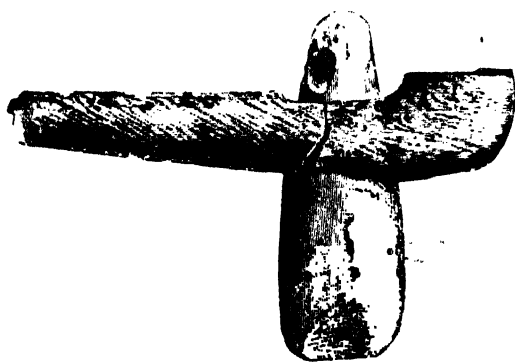
৫০শ চিত্র।

আদিম প্রস্তর কুঠার।

অং বাঃ পৃঃ ১৩৩।

কাংশস্থলে ব্যবহৃত হইত—তাহার এক পিঠ মসৃণ, অপর পিঠ কাটা ও অমসৃণ। তাহারা তীর প্রস্তুত করিত এবং পক্ষী ও ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী পশুও বধ করিত, কিন্তু সচরাচর বল্লম ও ছোরা অবলম্বনে বৃহৎকায় জন্তু, বিশেষত ঘোড়া, আক্রমণেই প্রবৃত্ত হইত। ক্রোম্যাগনন প্রায়ই গুহা আশ্রয় করিয়া বাস করিত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই বাস গৃহের অনুকরণেই তাহাদের কবর স্থান নির্ম্মিত হইত।

ক্যানষ্ট্যাড মানবের সমসাময়িক জীব ছিল ম্যামথ লোমশ গণ্ডার, গুহা-ঋক্ষ ও গুহা-হায়েনা প্রভৃতি বিলুপ্ত বৃহৎকায় ও হিংস্রক জীব সকল। বলা বাহুল্য যে এই সকলের সহিত তাহার ক্রমাগত কঠোর দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। অস্ত্রশস্ত্রও কাজেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হরিণের শিং, ভালুকের চোয়ালের হাড় হইতেও প্রস্তুত অল্পসংখ্যক অস্ত্র পাওয়া যায়, কিন্তু অগ্নিপ্রস্তরেরই চাঁচক (scraper), থস্তা (borer), হাতল সমেত ছুরি, বাটালি ও হাতুড়ি অধিক দেখা যায়। পাতলা গোছের বৃহৎ কুঠার ক্যানষ্ট্যাড মানবের সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র ছিল। অস্ট্রেলিয় আদিম নিবাসীদিগের মুখের সহিত ক্যানষ্ট্যাডের মুখের যেমন সাদৃশ্য দেখা যায়, সেইরূপ তাহাদের উভয়ের নির্ম্মিত কুঠারও দেখিতে প্রায় এক। ক্যান্‌ষ্ট্যাডেরা নিতান্ত বেরসিক ছিল না—এই স্তরে সচ্ছিদ্র শম্বুক রাশি দেখা যায়, সম্ভবত সেগুলি অলঙ্কার স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। এই আদিম মানবের প্রধান কার্য্য ছিল শীকার, ইহারা বেশী গুহাশ্রয়ী ছিল না—মাঠে মাঠে, বনজঙ্গলে ছুটিয়া ছুটিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ জীব সকল শীকার করিয়া বেড়াইত। বোধ হয় নরমাংসও ইহাদের আহার্য্য ছিল। ইহারা গরিলাদের ন্যায় অসামাজিক ছিল।

ক্রোম্যাগনন যেমন শীকারী ছিল, তেমনি যোদ্ধাও ছিল। অস্ত্রশস্ত্রের তীক্ষ্ণতা ও পারিপাট্যে তাহাদের বড়ই লক্ষ ছিল। সচরাচর এই ক্রোম্যাগননের কালকে তাহাদের সহচারী জীব অনুসারে তিন স্তরে বিভক্ত করা হয়—(১) ম্যামথ ও গুহা ঋক্ষের স্তর, (২) মিশ্র স্তর এবং (৩) বল্গা হরিণের স্তর। এই তিন স্তরে অস্ত্রশস্ত্রেরও ক্রমিক উন্নতি দৃষ্ট হয়। প্রথম স্তরে ক্রোম্যাগনন যে কোন প্রকারের কঠিন প্রস্তর পাইত, তাহা হইতেই অত্যন্ত রুক্ষ অস্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারাই ম্যামথ, গুহাঋক্ষ প্রভৃতি বৃহৎকায়

জীব সকলের সহিত সংগ্রাম করিতে পরাংমুখ হইত না। ক্রমে যে সকল অগ্নি-প্রস্তর (flint) স্বভাবত ভাঙ্গা পাওয়া যাইত, তাহাই চাঁচিয়া ছুলিয়া, তীক্ষ্ণ-ধার করিয়া হিৎসরু প্রস্তুত হইত। এই স্তরে তীরফলকের সাঁপি (barb) দেখা যায় না এবং প্রস্তরনির্ম্মিত ফলকগুলিও অত্যন্ত অমসৃণ। বর্শা ও শড়কীর মুখগুলি ক্রমে তীক্ষ্ণধার প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই বর্শা ও শড়কীর এরূপ বল ছিল এবং সেগুলি এরূপ বলের সহিত নিক্ষিপ্ত হইত যে তাহা দ্বারা বল্গা হরিণের মেরুদণ্ড এবং মনুষ্যের জঙ্ঘাস্থি ভেদ করা কিছু কঠিন কার্য্য ছিল না। বল্গা হরিণের একটী কঙ্কালের মেরুদণ্ডে এবং মনুষ্যের একটী কঙ্কালে বিখণ্ডিত জঙ্ঘাস্থিসহ জানুতে বর্শা বা শড়কীর অগ্রভাগ বিদ্ধ থাকিতে দেখা গিয়াছে। চকমকি পাথরের এক আঘাতে প্রাপ্ত ফালিকে ছুরি করা হইত। উপরে যে হিৎসরুর কথা বলিয়া আসিলাম, তাহার একদিক বা মসৃণ হইত, অপর দিক হয়তো অত্যন্ত রুক্ষ থাকিত। দ্বিতীয় স্তরে হিৎসরুর উভয় পিঠই মসৃণ হইতে এবং দৃঢ়ভাবে ধরিবার জন্য তাহায় হাতল প্রস্তুত হইতে দৃষ্ট হয়। তীর ফলকেরও ক্রমশ সাঁপি প্রস্তুত হইতে লাগিল।

তৃতীয় বা বল্গা হরিণের স্তরে ম্যামথ প্রভৃতি প্রথম স্তরের জীব-সকল একপ্রকার অদৃশ্য হইয়াছিল বলিলেই চলে। দ্বিতীয় স্তরে তবু দুএকটা প্রথম স্তরের জীব দেখা যাইত। এই তৃতীয় স্তরে প্রকৃতপক্ষে হাড়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়। প্রথম দুই স্তরে যেমন চকমকি পাথর ও তদনুরূপ কঠিন প্রস্তর অস্ত্রশস্ত্রের নির্ম্মাণে প্রধানত ব্যবহৃত হইত, শেষ স্তরে সেইরূপ অস্ত্র নির্ম্মাণে প্রধানত হাড়েরই ব্যবহার চলিয়াছিল। তখনও ছুরিকাদি গার্হস্থ্য দ্রব্য নির্ম্মাণে অগ্নিপ্রস্তর প্রচলিত ছিল। এই প্রস্তর-ফলক সমূহের সাহায্যে হরিণ শৃঙ্গ ও পশুদিগের অস্থি সকল কর্ত্তিত ও খোদিত হইয়া অস্ত্রাকারে পরিণত হইত। এই স্তরে বর্ত্তমান কালের ছুঁচের মত লম্বা অস্থি-নির্ম্মিত সছিদ্র ছুঁচ পাওয়া যায়। শৃঙ্গ ও হস্তীদন্ত প্রভৃতি অবশ্য অস্থি শ্রেণীর অন্তর্গত বলা বাহুল্য। এই সকল ছুঁচের দ্বারা বোধ হয় সেই আদিম মানবগণ চর্ম্মখণ্ড সকল জীবতন্তুর সাহায্যে পরিধানের উপযুক্ত করিয়া শীত হইতে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিত। অস্থি হইতে তীরফলকেরও বেশ পরিষ্কার সাঁপি প্রস্তুত হইতে লাগিল। মানবের বর্ত্তমান সমাজের

৫১শ চিত্র।
সাঁপিহীন তীরফলক।

৫২শ চিত্র।
সবৃন্ত তীরফলক।

৫৩শ চিত্র।
সাঁপিযুক্ত তীরফলক।

৫৪শ চিত্র।
অস্থি নির্ম্মিত ছুঁচ ও পাথরের নেহাই।

উন্নতিসাধনে লৌহ যে সহায়তা করিয়াছে, মানবের সেই আদিম সমাজের উন্নতিসাধনে জীবের অস্থি, শৃঙ্গ প্রভৃতি সেই পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ক্রোম্যাগননের শীকারের প্রধান জন্তু ছিল ঘোড়া। যেস্থানে এই আদিম মানবেরা বাস করিত, তাহারই সন্নিকটে বাসস্থানের সর্ব্বপ্রকার আবর্জনা ফেলিত—একস্থানে এমন দুই তিন পুরুষ ধরিয়া এক পরিবার হয়তো আবর্জনা ফেলিয়া আসিতেছে, এই আবর্জনায় দগ্ধকাষ্ঠ, অস্থি প্রভৃতি নানা পদার্থই নিক্ষিপ্ত হইত। সেই আবর্জনারাশির মধ্যে বল্‌গা হরিণের ও ঘোড়ার হাড় এবং খরগোস, কাঠবিড়াল প্রভৃতিরও অস্থিশেষ বিস্তর পাওয়া যায়। কদাচিৎ ম্যামথের হাড় পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পক্ষীরও অস্থি সেই আবর্জনার সহিত মিশ্রিত। এই সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই সকল জীবজন্তু ক্রোম্যাগননের আহার্য্য ছিল। মৎস্যের হাড় তত বেশী পাওয়া যায় না, তাহাতে বোধ হয় যে মৎস্যাহার সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সেই মৎস্য গুলি জালে ধরা হইত না, বল্লমের সাহায্যে বিদ্ধ করা হইত। বৃহৎ কোন জন্তু মারিয়া গুহায় সমগ্র অংশ আনিবার অসুবিধা হইলে তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া আনা হইত। গুহায় মাত্র করোটী ও পৃথক্ পৃথক্ ছিন্ন অংশের অস্থি পাওয়া যায়। মজ্জা ও মগজ আদিম মানবের বোধ হয় অতি প্রিয় খাদ্য ছিল। যে সকল অস্থিতে মজ্জা পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সকল গুলিই চেরা দেখা যায়। আবর্জনার মধ্যে ছাই ও দগ্ধকাষ্ঠ খণ্ড সকল পাওয়া যাওয়াতে অনুমান হয় যে অগ্নিব্যবহার অজ্ঞাত ছিল না। কিরূপ প্রণালীতে এই অগ্নিব্যবহার হইত তাহা বলা বড়ই কঠিন। ক্রোম্যাগনন মানব যে স্তরে পাওয়া যায়, সেই স্তরে কোন প্রকার মৃণ্ময় পাত্র দেখা যায় না। সম্ভবত সাইবীরিয়দিগের ন্যায় চর্ম্ম বা কাষ্ঠস্থালীর জলে অত্যুষ্ণ প্রস্তরখণ্ড ফেলিয়া গরম করিত। যতদূর জানা যায় তাহাতে বোধ হয় যে নৃসিংহ মোটেই নরমাংসভুক ছিল না।

ক্যানষ্ট্যাড় অপেক্ষা নৃসিংহ বা ক্রোম্যাগনন অধিকতর সামাজিক ছিল। তাহারা বড় বেশী যাযাবর বা ভবঘুরে ছিল না। এক স্থানে স্থায়ী থাকিবার ভাব আসিয়াছিল, নচেৎ এক স্থানে আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত দেখা যাইত না। নৃসিংহের সামাজিকত্বের পরিচয় তাহাদের অলঙ্কারে পাওয়া যায়—

অপরের নিকট সুন্দর দেখানই অলঙ্কারের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সচ্ছিদ্র শম্বূকাদি নৃসিংহের বাসস্থলের নিকটে অনেক পাওয়া যায়। এই সকল শম্বূকের মধ্যে কতকগুলি সামুদ্রিক বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে ক্রোম্যাগনন্‌গণ কোনপ্রকার জলযান অবলম্বনে দেশবিদেশে যাতায়াত করিয়া সেই সকল সংগ্রহ করিত। ইহা ব্যতীত গলহার, কঙ্কণ প্রভৃতি নানা অলঙ্কার নৃসিংহযুগের শেষ স্তরে পাওয়া গিয়াছে। নৃসিংহধ্যানেও নৃসিংহকে অলঙ্কারশোভিত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। বৃহৎ মাংসাশী জীবের দাঁত, হস্তীদন্ত, নানাপ্রকার প্রস্তর এবং রৌদ্রশুষ্ক মৃত্তিকার প্রস্তুত গুটীর বা পলার মালা প্রস্তুত হইত। নৃসিংহ নিজদেহ নানাবর্ণে চিত্রিত করিতে ও বিরত ছিল না।

নৃসিংহের সুকুমার শিল্পের দিকে বেশ আকর্ষণ ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেও তাহার যাযাবরত্বের অভাব ও সামাজিকত্ব প্রকাশ পাইতেছে —একস্থানে স্থায়ী থাকিয়া একটু উদরের চিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া অপর পাঁচজনের অনুরাগ আকর্ষণ অথবা উপকার সাধনে অভিলাষ না জন্মিলে সুকুমার শিল্পের দিকে মতিগতি হওয়া সহজ নহে। নৃসিংহের রচিত ভাস্কর্য্য ও চিত্রকার্য্যের নমুনা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে খোদাই কার্য্য তত ভাল নহে। বল্‌গা হরিণের শৃঙ্গখণ্ডে যে বল্‌গা হরিণ বা ম্যামথ খোদিত দেখা যায় তাহা বেশ চেনা যায়, কিন্তু সেগুলি খুব সুন্দর হয় নাই। ছোরার হস্তীদন্ত নির্ম্মিত হাতলে নতগ্রীব বল্‌গা হরিণ এরূপভাবে খোদিত যে তাহা বল্‌গা হরিণ বলিয়া বুঝিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না—পা গুলি দেহের নীচে আনীত, মাথাটী বাহির করা, শৃঙ্গগুলি শরীরের উপরে বিস্তৃত। চিত্রের ভাব এত স্বাভাবিক এবং অনুপাত এত ঠিক যে বর্ত্তমানকালের কোন ভাস্কর তদপেক্ষা সুন্দর ভাব ও অনুপাত দিতে পারিত কিনা সন্দেহ। ভাস্করবিদ্যা অপেক্ষা চিত্রবিদ্যা নৃসিংহের কিছু বেশী অভ্যস্ত ছিল বলিয়া বোধ হয়। তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বল্‌গা হরিণের হাড়, শিং, ম্যামথের দাঁত এবং নানাপ্রকার প্রস্তরের উপর সূক্ষ্ম খোদাই করিয়া এই সকল চিত্র বিকশিত করা হইত। সেই আদিম মানব নৃসিংহ কখন বা নিজের পারিপার্শ্বিক উদ্ভিদ বা জীব আঁকিত, কখনও বা নিজের খেয়ালে যাহা আসিত তাহাই আঁকিত, সকল চিত্রই কিন্তু সুদৃশ্য।
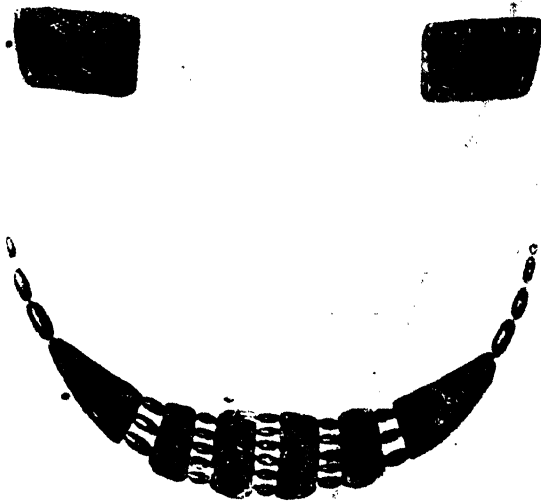
৫৫শ চিত্র।

স্বর্ণবিন্দু-খচিত কৃষ্ণপ্রস্তরের কণ্ঠী।

৫৬শ চিত্র।

(শ্লেট প্রস্তরে) বলগা হরিণ যুদ্ধ।
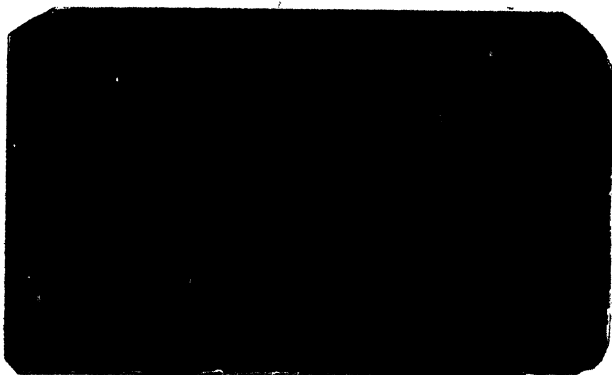
৫৭শ চিত্র।
হস্তিদন্তে ম্যামথ চিত্র।

৫৮শ চিত্র।
হরিণের শৃঙ্গে অঙ্কিত ঘোটক চিত্র
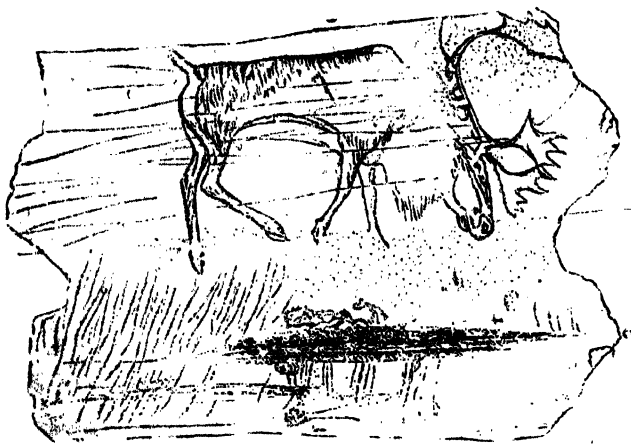
৫৯শ চিত্র।
১। আদিম মানবের অঙ্কিত বন্য হরিণ।

অঃ বাঃ পৃঃ ১৩৬।

খেয়ালের চিত্রে যে ভাবে প্রত্যেক অংশ অঙ্কিত হইত, আজ শতসহস্র শতাব্দী পরে সেই ভাবের মূলমন্ত্রগুলি পুনরাবিষ্কৃত হইয়া সাদরে গৃহীত হইতেছে। এই খেয়ালের চিত্রসমূহের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এত বেশী দেখা যায় যে তাহা হইতে ক্রোম্যাগননের কল্পনাশক্তি ও নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা খুব স্পষ্টই বুঝা যায়। বাস্তব পদার্থের, বিশেষতঃ জন্তুদিগের চিত্রাঙ্কনে তাহাদের যথেষ্ট শক্তি দেখা গিয়াছে। তাহারা চিত্রের বিষয়গুলি কি সমগ্র-ভাবে, কি প্রত্যেক অংশে, সকলেতেই সমানরূপে ধারণা করিতে পারিত—সূক্ষ্ম অংশ গুলিও নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হইত। আদিম মানবের চিত্রাবশেষের মধ্যে গরু, ঘোড়া, বল্‌গা ও অন্যান্য নানাপ্রকার হরিণ, কর্কট, মাছ প্রভৃতি অঙ্কিত দেখি। এই গুলির অনুরূপ জীব বর্ত্তমান কালেও দেখিতে পাই বলিয়াই এই চিত্রলিখিত জীবগুলি সুচিত্রিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি। কিন্তু যে সকল বিলুপ্ত জীবের চিত্র দেখিতে পাই, সেগুলিরও নির্ভুল হওয়া সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। একটী শ্লেট পাথরের উপর গুহা-ঋক্ষের ছবি এবং ফ্রান্সের পেরিগর্ড গুহায় ম্যামথের কতকগুলি ছবি পাওয়া গিয়াছে। সাইবীরিয়াতে বরফাচ্ছাদনের ভিতর হইতে অনেক-গুলি সমগ্র ম্যামথদেহ পাওয়া গিয়াছে—বর্ত্তমানকালের কোন চিত্রকর সেই ম্যামথের সূক্ষ্মবিসূক্ষ্ম অংশেও যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিত, আদিম মানব নৃসিংহও ঠিক সেইরূপ আঁকিয়াছে। ইহা হইতে গুহাঋক্ষের চিত্র যে নির্ভুল হইয়াছে তাহা অনুমান করিতে কোনই দ্বিধা হইবে না। আশ্চর্য্য এই যে যতগুলি চিত্র বা খোদাই কার্য্য পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটীও মানুষের চিত্র দেখা যায় না। একটী স্ত্রীলোকের হস্তীদন্তনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে বোধ হয় যেন এই শিল্প অতি শৈশবাবস্থায় ছিল। ইহা স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া চেনাই দুষ্কর। একটা হাড়ের একদিকে বল্‌গা হরিণের পশ্চাদ্ধাবমানা একটী স্ত্রীলোকের চিত্র অতি কুৎসিতভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারই অপর পৃষ্ঠে ঘোড়ার একটি সুন্দর মস্তক অঙ্কিত আছে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, মনুষ্য মাত্রেরই চিত্র অতি কুৎসিতরূপে অঙ্কিত হইত দেখা যায়। যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বোধ হয় মনুষ্যচিত্র ইচ্ছা করিয়াই এরূপ কুৎসিতরূপে অঙ্কিত হইত। আমেরিকার আদিম অধিবাসী-

দিগের মধ্যে সংস্কার ছিল যে চিত্রকর যাদুকর, চিত্রিত ব্যক্তির ভাল অংশ বাহির করিয়া লয়। সম্ভবত ক্রোম্যাগনন মানবেরও এইরূপ কোন প্রকার সংস্কার থাকাতে মনুষ্যচিত্র সুন্দররূপে অঙ্কিত হইত না। যাই হোক, তাহারা মানবের যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে তাহারা মাথায় কেশচূড়া বাঁধিয়া, হস্তে শড়কী লইয়া নগ্নদেহে বৃহৎকায় জীবজন্তুর শীকারে প্রবৃত্ত হইত এবং আরও বুঝা যায় যে তাহারা সময়ে সময়ে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত।

আর একটী ঘটনা নৃসিংহের সামাজিকত্ব ব্যক্ত করে। তাহাদের সঞ্চিত আবর্জনারাশির স্তরে স্তরে ক্রমশ জীববাহুল্য অধিক হইতে দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহারা নিতান্ত ভবঘুরে ছিল না। এই আবর্জনা রাশির মধ্যে শাবক, বৃদ্ধ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অবস্থার বল্গা হরিণ পাওয়া গিয়াছে—ইহা হইতে অনুমান হয় যে নৃসিংহ বল্গা হরিণকে পোষ মানাইয়াছিল। সোলুত্রে নামক স্থানে প্রায় ৪০ হাজার ঘোড়ার হাড় পাওয়া গিয়াছে—সম্ভবত আদিম মানব দলে দলে ঘোড়া পোষ মানাইত। সর্ব্বপ্রথমে কুকুর গৃহপালিত হইয়াছিল দেখা যায়। নৃসিংহযুগের শেষভাগে বল্গা হরিণের কঙ্কালাবশেষ ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। এখন পর্য্যন্ত আদিম মানব চাষ আবাদে বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই বলিয়া বোধ হয়। এ পর্য্যন্ত একটী মাত্র ছবি দেখিয়া অনুমান হয় যে চাষ আবাদ সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছিল—সেই ছবিতে বোধ হয় যেন একটা বল্গা হরিণের ঘাড়ে জোয়াল দেওয়া আছে। সমাজে দলবদ্ধ থাকিলেই পরস্পরের মধ্যে বিবাদকলহ একেবারে তিরোহিত হইতে পারে না—তাহারই যেন দৃষ্টান্ত স্বরূপে কুঠারাঘাতের চিহ্নসহ স্ত্রীলোকের একটী করোটী পাওয়া গিয়াছে।

নৃসিংহমানবের কি বুদ্ধি, কি সৌন্দর্য্য কিছুরই অভাব ছিল না। সমাধিস্থানের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধবয়সের সম্মান প্রদত্ত হইত। সমাধিস্থান গুলি যে প্রকার সযত্নে নির্ম্মিত হইত এবং মৃত ব্যক্তির দেহের সঙ্গে যখন খাদ্য, অস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সকল কবরে রক্ষা করা হইত, তখন স্পষ্টই বোধ হয় যে তাহাদের মধ্যে পরকালে বিশ্বাস ছিল। অন্তত আমেরিকা প্রভৃতির আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে এখন আমরা এই সম্বন্ধে যে রীতিনীতি ও বিশ্বাস প্রচলিত দেখি, তাহা হইতে অন্য কোন প্রকার মীমাং-

৬০শ চিত্র।

২। ঘোটক, মস্তক ও সর্পের সহিত প্রাচীনতম মানব চিত্র।

অঃ বাঃ পৃঃ ১৩৭।

৬১শ চিত্র।

আদিম মানবের সমাধিস্থান।

অঃ বাঃ পৃঃ ১৩৮।

সায় উপনীত হইতে পারি না। সম্ভবতঃ ইহাদের মধ্যে কোনও প্রকার ধর্ম্ম-প্রণালীও বিদ্যমান ছিল—নানা দ্রব্যের নির্ম্মিত ধুকধুকি প্রভৃতির অস্তিত্ব দেখিয়া পণ্ডিতেরা ইহাই অনুমান করেন। পণ্ডিতবর পিয়েত (M Piette) একটী ধুকধুকির মধ্যস্থলে ছিদ্র ও তাহা হইতে চতুর্দ্দিকে রেখা বিস্তৃত দেখিয়া অনুমান করেন যে ইহা সূর্য্যপূজার পরিচায়ক। অবশ্য এ বিষয়ে সকলে একমত নহেন।

নৃসিংহযুগের শেষে বরফও সরিয়া সরিয়া উত্তরে চলিয়া গেল এবং নৃসিংহও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইতে লাগিল এবং তাহার স্থান বামন মানব আসিয়া অধিকার করিল। তাহাদের সেই হনুর বিস্তৃতিভাব চলিয়া গেল, আকৃতি খর্ব্ব হইয়া আসিল এবং মুখমণ্ডল যথাযথ অনুপাতবিশিষ্ট হইল। ক্রোম্যাগননের কঙ্কাল দুএকস্থলে খর্ব্বাকৃতি অন্য জাতীয় মানবকঙ্কালের সহিত একত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, উভয় জাতীয় মানবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল এবং অবশেষে বামন-মানব বুদ্ধিশক্তি-প্রভাবে, গৃহপালিত জীবজন্তুর আধিক্যফলে এবং চাষ আবাদের কারণে নৃসিংহমানবকে পরাজিত এবং প্রকারান্তরে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে সক্ষম হইয়াছিল। বামন বলিতে আড়াই ফুট তিন ফুট মানব বুঝিতে হইবে না—প্রকৃত কথা এই যে ৬ ফুট ১০ ইঞ্চি নৃসিংহের সহিত তুলনায় তাহার ঠিক পরবর্ত্তী ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি মানবকে বামনের ন্যায়ই সকলের প্রতীয়মান হইয়াছিল।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায় আদিম মানবের আচার ব্যবহার মূলক দ্বাদশ কথা সমাপ্ত।

—:॥ ॐ ॥:—

ত্রয়োদশ কথা—বামন অবধি কল্কীযুগ।

এইবারে আমরা বামনযুগে আসিয়া পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বামন যুগের মানবকেও আদিম মানবেরই অন্তর্ভুক্ত ধরিয়াছেন এবং যেস্থানে এই মানবের কঙ্কাল প্রথম পাওয়া গিয়াছিল সেই স্থানের নামানুসারে ফারফুজ (Furfooz) নামকরণ করিয়াছেন। আমরা ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার কথায় দেখিয়া আসিয়াছি যে একটা জীব প্রথমে সামান্য ভাবে দেখা দেয়, পরে আকারে ও প্রকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহার পরযুগে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া অন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জীবকে স্থানদান করিয়া থাকে। ঋষিরা পূর্ণাভিব্যক্তির সময়ে জীবকে বিষ্ণুর অবতার কল্পনা করিয়া নিজেদের জ্ঞানের পূর্ণাভিব্যক্তিই প্রকাশ করিয়াছেন। নৃসিংহ-অবতারেও সেই একই মূল নিয়ম প্রযোজ্য। নৃসিংহ প্রথমত ক্যানষ্ট্যাড মানবের আকারে দেখা দিল, অবশেষে যখন ক্রোম্যাগনন মানবের আকারে নৃসিংহের পূর্ণাভিব্যক্তি লাভ করিল, তখনই ঋষিরা সেই পূর্ণাভিব্যক্ত নৃসিংহমানবকে অবতার কল্পনা করিলেন। তাহার পর নৃসিংহ বিলুপ্ত হইয়া ফারফুজ মানব বা বামনাবতারকে স্থানদান করিয়া গেল। পূর্ণাভিব্যক্ত জীবের বিলোপকালে যে কিছুই অবশেষ থাকে না তাহা নহে। বামনাবতারকালেও পূর্ব্ব যুগের পূর্ণাভিব্যক্ত নৃসিংহের বিলোপ সত্ত্বেও যে তাহার অবশেষ ছিল না তাহা নহে। আরও একটী বিষয়ের আমি পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি। একযুগে যিনি অবতার হইলেন, তাহাকেই পরযুগে, যে কোন কারণেই হউক, দৈত্য বা অসুর বলিয়া উল্লেখ হইল। যে কূর্ম এক সময়ে অবতারত্ব লাভ করিলেন, সেই কূর্ম বরাহযুগে দৈত্যরাজ সাজিলেন। সেইরূপ আমরা দেখিতেছি যে নৃসিংহ নৃসিংহযুগে অবতার হইলেন, তিনিই আবার বামনযুগে অসুর সাজিলেন।

ঋষিদিগের মতে বোধ হয় বামন মানব হইতেই প্রকৃত হিতাহিতজ্ঞানবিশিষ্ট মানবের সূত্রপাত। তাঁহারা নৃসিংহকে কার্য্যত সত্যযুগের পশু-অবতারের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন এবং ত্রেতা হইতে মানবত্বের সূত্রপাত প্রচার করিয়াছেন।

নৃসিংহমানব যেমন ভীষণ যোদ্ধা ও হিংস্রকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, তাহার ঠিক বিপরীতে বামন যতদূর সম্ভব শান্তিপ্রিয়রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বামনবিষয়ক কোন বর্ণনায় যুদ্ধের বিন্দুবিসর্গও উল্লিখিত হয় নাই। শতপথব্রাহ্মণে বামনাবতার বিষয়ক যে বিবরণ আছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বামনযুগ হইতেই কৃষিকার্য্যের এবং অগ্নির বিশেষরূপ ব্যবহারের সূত্রপাত হইয়াছিল। শতপথব্রাহ্মণোক্ত বামনাবতার-কথা উল্লিখিত হইল। একদা অসুরগণ জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে সমগ্র পৃথিবী তাহাদেরই আয়ত্ত এবং আপনাদিগের মধ্যে তাহা গোচর্ম দ্বারা মাপ করিয়া বিভাগ করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। দেবতারা বিষ্ণুসহায় হইয়া অসুরদিগের নিকটে গিয়া পৃথিবীর কিয়দংশ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। অসুরগণ বিষ্ণুকে বামন দেখিয়া বলিল যে বিষ্ণু যতটুকু ভূমিতে শুইতে পারিবে তৎপরিমাণ ভূমি দেওয়া যাইবে, কিন্তু তাহার বেশী কিছুমাত্র দেওয়া হইবে না। দেবতারা তাহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং অগ্নিকে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করিয়া অগ্নির সাহায্যে পৃথিবী জয় করিলেন। বিষ্ণু দেবতাদিগের আবদার সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া উদ্ভিদের শিকড়ে যাইয়া লুকাইলেন। দেবতারা ৩ ইঞ্চ গভীর ভূমি খনন করিয়া বিষ্ণুকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং ক্রমে দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তরে বিস্তৃতি লাভ করিলেন (শতপথ ব্রাহ্মণ—১কাং, ২অং, ৫ব্রাং)।

পুরাণাদিতে আছে যে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রপৌত্র বলি দানযজ্ঞ আরম্ভ করিলে বিষ্ণু দেবগণের অনুরোধে বামনাবতার গ্রহণ পূর্ব্বক বলির নিকট গিয়া ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি তাহা স্বীকার করিলে বিষ্ণু একপদের দ্বারা ভূমি, দ্বিতীয় পদের দ্বারা অন্তরীক্ষ অধিকার করিলেন এবং তৃতীয় পদের দ্বারা বলির স্বাধীনতা হরণ করিলেন।

এই দুইটী বর্ণনা হইতে আমরা বামনমানবের কি ইতিবৃত্ত পাই একবার আলোচনা করিয়া দেখিব। এক সময়ে নৃসিংহমানব পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি যে দুএক স্থানে বামন জাতীয় মানব ছিল, তাহারা নৃসিংহ হইতে নিজেদের বিলোপসাধনের জন্য সর্ব্বদা সশঙ্কিত অবস্থায় বাস করিত। অবশেষে বামনদিগেরই ক্রমশ উন্নতি হইতে লাগিল—তাহারা কিছুতেই অসন্তুষ্ট না হইয়া যেটুকু উন্নতি করিতে লাগিল, যেটুক ভূমি লাভ করিতে লাগিল,

তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিল—সন্তোষই তাহাদিগের উন্নতির মূল। ইহাই তাহাদের গভীর সামাজিকতার লক্ষণ। বোধ হয় বামনগণই সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃতরূপে অগ্নি ব্যবহার করিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম সীমা হইতে অরণ্য সকল অগ্নিদগ্ধ করিয়া কৃষির উপযোগী করিয়া লইয়াছিল। বামনেরাই সর্ব্বপ্রথম তিন ইঞ্চি মাত্র গভীর ভূমি খনন করিয়া কৃষি প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। বলি সম্ভবত নৃসিংহরেই ধ্বংসাবশেষ, বামনযুগে অসুরাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। পৌরাণিক আখ্যায়িকা আমাদিগের মতে বামনদিগের মঙ্কাবাস সূচনা করিতেছে। বামনাবতারের কথা সমগ্র পড়িয়া আমাদিগের ধারণা হইয়াছে যে হিমালয়ের কাছাকাছি কোথাও বলিরাজার প্রধান আড্ডা ছিল—সম্ভবত পঞ্জাব অঞ্চলের কাছাকাছি নৃসিংহদিগের এক প্রধান দল থাকিয়া গিয়াছিল। কোন আখ্যায়িকাতে এমন প্রকাশ নাই যে বামনাবতার যুদ্ধবিগ্রহপ্রিয় ছিলেন।

এখন দেখা যাউক যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বামন মানবের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে আমাদের উপরোক্ত মতের কিরূপ সমর্থন প্রাপ্ত হই। তাঁহাদের মতে ফারফুজ জাতি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, তাহাদিগের কবরে এ পর্য্যন্ত একখানি যুদ্ধের অস্ত্র পাওয়া যায় নাই। তাহারা ক্রোম্যাগননদিগের সমসাময়িক অর্থাৎ তাহাদিগের সময়ে ক্রোম্যাগনন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ চলিয়াছিল—তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। ইতিহাসেও দেখা যায় যে জেতৃবর্গ ক্রীতদাসদিগেরও কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ফারফুজ জাতিও ছুরি প্রভৃতি গার্হস্থ্যোপযোগী যন্ত্র সকল চকমকি পাথর হইতেই নির্ম্মাণ করিত এবং হরিণের শিং হইতে ন্যূনাধিক ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ বর্শা বা শড়কী প্রস্তুত করিত। ইহাদের মধ্যে তীর ধনুকের ব্যবহার দেখা যায় নাই। আশ্চর্য্য এই যে এই প্রকার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাহারা ক্রোম্যাগননের সহিত জীবনসংগ্রামে জয়ী হইল। তাহাদের পেশীবলের অভাব ছিল না। তাহাদের আকৃতি কতকটা যেন নেপালীদিগের ন্যায় বোধ হয়—মুখ চওড়া, নাক উঁচু ও লম্বা, হনু একটু বিকশিত এবং ক্রোম্যাগননের ন্যায় চোয়ালের ঝোলালো ভাব নাই। ইহাদের বাসস্থানে ঘোড়া, গরু, বন্য হরিণ, শৃগাল, বন্যশূকর, সামোয়া ছাগ, ধূসর ভল্লুক প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এবং ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের মধ্যে খরগোস, কাঠবিড়াল, জলমূষিক, পার্ব্বত্য মূষিক প্রভৃতিরও হাড়

৬২শ চিত্র।
বামন মানবের মৃন্ময় পাত্র।

ফারফুজদিগের মৃন্ময় পাত্র।
৬৩শ চিত্র।
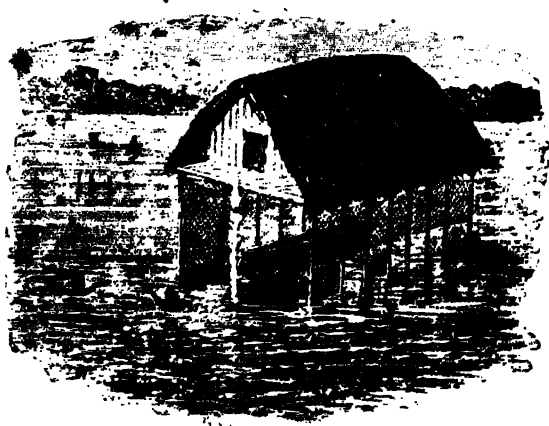
৬৪শ চিত্র
মঞ্চাবাস।
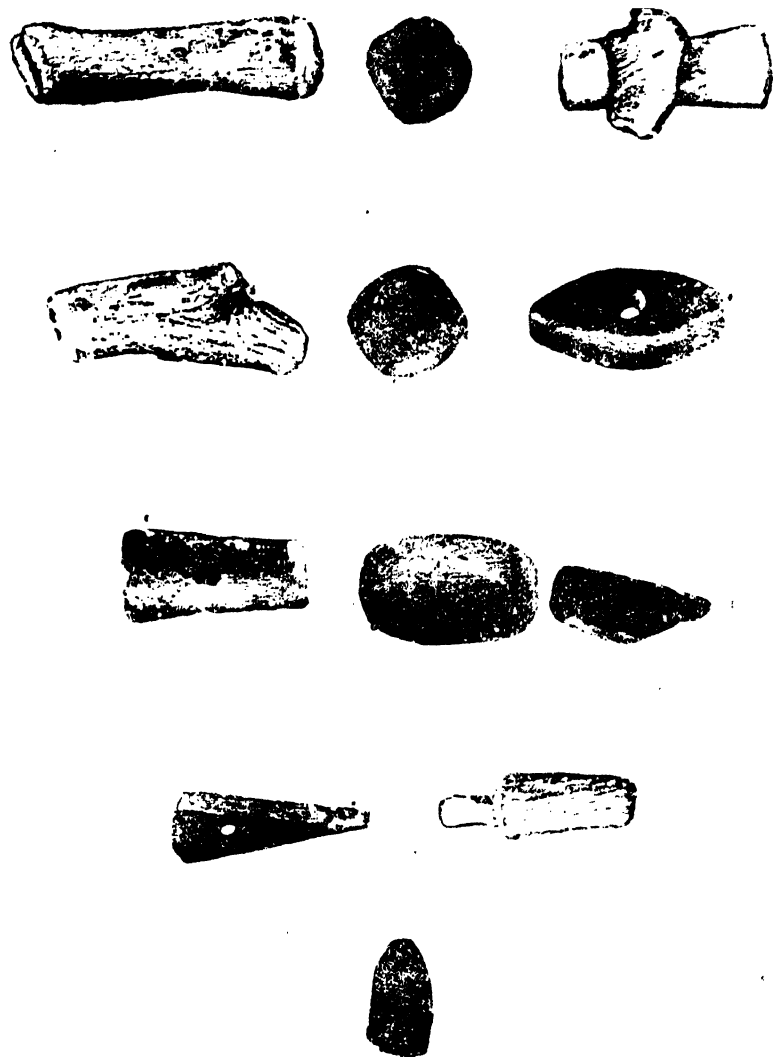
৬৫শ চিত্র।

হরিণ শৃঙ্গের আদিম হাতুড়ি প্রভৃতি (মঙ্কাবাসে প্রাপ্ত)।

অ:বা: পৃ: ১৪৩।

পাওয়া যায়। হাড়ের মজ্জা ইহাদিগেরও প্রিয় খাদ্য ছিল। ফারফুজ জাতিও সছিদ্র হাড়ের ছুঁচ ব্যবহার করিত এবং সম্ভবত নিহত পশুদিগের চর্ম্ম পরিধানের উপযুক্ত করিয়া লইত। পূর্ব পূর্ব আদিম মানব হইতে ইহাদের বিশেষত্ব এই যে ইহারাই প্রথম মৃন্ময় পাত্র আবিষ্কার করিয়াছিল। ইহারা নিজেদের মুখ এবং সম্ভবত দেহও চিত্রিত করিতে ভাল বাসিত। ইহাদের অলঙ্কার অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতির উপকরণ হইতে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে ইহারা বিধিবদ্ধ প্রণালীমতে এবং বেশ বড় রকমের ব্যবসা চালাইত।

সুইজার্লণ্ড ও ইতালীর হ্রদের গর্ভে যে সকল মঞ্চাবাস পাওয়া গিয়াছে সেই সকল মঞ্চাবাসের নির্ম্মাতা আদিম মানবগণ ফারফুজ জাতির অন্তর্গত কি না আমি সবিশেষ বলিতে পারিলাম না, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে বামন মানবের মধ্যে ধরিতে পারি—তাহারা যে ক্যানষ্ট্যাড বা ক্রোম্যাগনন নহে তাহা ঠিক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আদিম মানবের কালকে আর এক প্রকারে বিভক্ত করেন—(১) প্রস্তর কাল, (২) পিত্তল কাল এবং (৩) লৌহ কাল। কতকগুলি মঞ্চা-বাসের আবর্জ্জনা রাশিতে এই তিন কালেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথম আবর্জ্জনাস্তর ক্রোম্যাগননের সমসাময়িক এবং তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে তখনও সেই মঞ্চাবাসী মানবগণ শীকারী অবস্থা হইতে কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হয় নাই, নিযুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছে মাত্র। আবর্জ্জনার এই স্তরে হরিণ ও বন্যশূকরেরই অস্থি অধিক পাওয়া যায়, গরু, ও ভেড়ার অস্থি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। কৃষি ও ওষধি তখনও অজ্ঞাত, তবে একবীজ হেজেল বাদাম ভাজিয়া খাইবার জন্য সংগৃহীত হইত। পরবর্ত্তী স্তরে ক্রমশ বন্যজন্তুর হাড় কম হইয়া গরু ভেড়া প্রভৃতির বাড়িতে লাগিল। ছাগল, শূকর, ঘোড়া গৃহপালিত হইল, কৃষিযুগ আরম্ভ হইল। কুকুর সর্ব্বাগ্রেই পোষ মানিয়াছিল। যব ও গম প্রধান খাদ্যে পরিণত হইল। আপেল ও পেয়ার ফলে শীতের পূর্ব্বেই ভাণ্ডার পূর্ণ হইল। ক্রমে পাট আবিষ্কৃত হইয়া বস্ত্রবয়নের সুবিধা হইল। যখন ধাতু আবিষ্কৃত হইয়া প্রচলিত হইল, তখন হইতেই বলিতে গেলে মানবের উন্নতি দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথম আবিষ্কৃত ধাতু বোধ হয় তামা—প্রথমাবস্থায় এই তামাকে পিটাইয়া প্রস্তরাস্ত্রের আকার প্রদত্ত হইত। তার পরে যখন পিত্তল পাওয়া গেল, তখন তাহা হইতে নানা নূতন নূতন অস্ত্র যন্ত্র

প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে লাগিল। পিত্তল তামা ও টিনের নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে সংমিশ্রণের ফলে উৎপন্ন। আদিম মানব এই পিত্তল পাইল কোথা হইতে? সেই আদিম কালের যত পিত্তল পাওয়া যায়, সকলগুলি একইপ্রকার সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইহাতে বোধ হয় যে কোন এক স্থান হইতে সেই পিত্তল দেশবিদেশে আনীত হইত এবং সুতরাং বোধ হয় যে বাণিজ্যব্যাপার সেই বামনযুগে বেশ চলিতেছিল।

নৃসিংহযুগ নানা বিষয়ে উন্নতি প্রদর্শন করিলেও আমরা তাহাকে পাশব হিংসার যুগ বলিতে পারি। তাহার পরে বামনযুগে, আদিম মানবের শান্তির যুগ আসিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই প্রায় আদিম মানবের অস্তিত্বযুগের উপসংহার করেন। একপ্রকারে বলিতে গেলে বামনযুগেই আদিম মানবের উপসংহার। এই যুগেরই শেষ অংশে লৌহের আবিষ্কার ও প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতে কিন্তু বামনযুগের পরবর্ত্তী পরশুরাম যুগে লৌহের বিস্তৃত ব্যবহার দেখিতে পাই। এখানেও উত্থানশীল পরশুরাম হইলেন বিষ্ণুর অবতার এবং পূর্ব্ববর্ত্তী শান্তিপ্রিয় বামন মানবগণ অসুর বলিয়া স্পষ্ট উল্লিখিত না হউক, বিষ্ণুর অবতার পরশুরামের বিরোধী শত্রু প্রভৃতি নানা কটুবাক্য লাভ করিয়াছে। পরশুরামের জীবনে দুইটী প্রধান ঘটনা দেখা যায়—এক, বারম্বার নিঃক্ষত্রিয় সাধন এবং দ্বিতীয়, ব্যভিচার হেতু পিতৃ-আজ্ঞায় কুঠার দ্বারা মাতৃবধ সাধন। পরন্তু এই যুগের প্রধান লক্ষণ বলিতে পারি। যেখানেই সমাজ, সেইখানেই চিরকাল শান্তি থাকা অসম্ভব। বামনযুগে শান্তি ছিল, কিন্তু পরশুরামের আগমনে সে শান্তি রহিল না, শান্তিপ্রিয়, যুদ্ধে অনভ্যস্ত বামনগণ পদেপদে নিপীড়িত হইতে লাগিল, এবং ফলে বামনগণ লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। আমাদিগের বোধ হয় পরশুরামেরই যুগে ব্যভিচারের ক্ষতিকরত্ব লোকের উপলব্ধ হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে হয় নাই। পরশুরামের দুইটী প্রধান অস্ত্র পরশু এবং ধনুক।

পরশুরামের পর শ্রীরামচন্দ্রের যুগ। পরশুরামের যুগ বলিতে গেলে আদিম মানব ও বর্ত্তমান মানবের মধ্যবর্ত্তী শৃঙ্খল। শ্রীরামচন্দ্রের যুগ হইতে বর্ত্তমান মানব সমাজের পত্তন হইয়াছিল বলিলেও চলিতে পারে। শ্রীরামচন্দ্রের সময়েই মানবসমাজের প্রকৃত শোভা আসিল, এই কারণে রামচন্দ্রের নামোল্লেখে শ্রী-শব্দ

সংযুক্ত করিতে হয়। শ্রীরামচন্দ্রের নীতি প্রভৃতির নিকটে, যুদ্ধবিদ্যার নিকটে, সর্ব্বপ্রকারেই পরশুরামকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। নৃসিংহ যুগেও যেমন হিরণ্যকশিপু কূর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল, সেইরূপ শ্রীরামচন্দ্রের সময়েও লঙ্কায় নৃসিংহ রাবণ ও তাহার স্বজাতির অধিকার প্রচলন ছিল এবং সময়ে সময়ে তাহারা শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে আসিয়াও অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। এ সময়ে বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধী অসুর হইল নৃসিংহ। অগত্যা শ্রীরামচন্দ্র রাবণের বধসাধন করিয়া প্রজাগণকে জয়যুক্ত করিলেন। সমাজের গঠন দেওয়াই শ্রীরামচন্দ্রের অবতারত্বের প্রধান কার্য্য বুঝা যায়। এইখানে ত্রেতাযুগ বা ইতিহাসের অতীতযুগের শেষ হইল।

শ্রীকৃষ্ণ হইতে ঐতিহাসিক কাল আরম্ভ হইল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী পক্ষ দৈত্য প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইল না। শ্রীরামচন্দ্রের সাময়িক উন্নত সূর্য্যবংশ শ্রীকৃষ্ণের যুগে অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে। এই ঐতিহাসিক কালে কবি অতিরঞ্জিত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণযুগে বহির্বিবাদের পরিবর্ত্তে ঘোরতর, অন্তর্বিবাদ চলিয়াছিল—প্রত্যেক ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, প্রতি পরিবারে, প্রতি সমাজে, সমগ্র ভারতে অন্তর্বিবাদ সর্ব্বগ্রাসী হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এই বিবাদ শান্ত করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যে অসাধারণ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাঁহার যে অসাধারণ পরিশ্রম ও বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার অবতারত্ব স্বীকৃত না হওয়াই আশ্চর্য্য। তাঁহার জ্ঞানবলক্রিয়াকে সর্ব্বতঃপ্রসারিণী করিতে হইয়াছিল। সেই সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধিমহিমায় স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে পূর্ণাবতার বলিয়া পূজা করেন—তিনি পূজা পাইবার যোগ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বের প্রধান কার্য্য ভারতের অন্তর্বিবাদশান্তি।

বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী অবতার। বলা বাহুল্য বুদ্ধদেবের অবতারত্বের মূলমন্ত্র অহিংসা প্রচার। শ্রীকৃষ্ণের শত চেষ্টা সত্ত্বেও যে ভারতে অন্তর্বিবাদ সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নাই, তাহা যদুবংশধ্বংসের বিবরণেই বুঝা যায়। তাই বুদ্ধদেব সমুদয় বিবাদের মূলোচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া অহিংসামন্ত্র প্রচার করিলেন। বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়—বিষ্ণুর অবতার যে ক্ষত্রিয়কে পশুবলে, ক্ষাত্রতেজে নহে, ব্রহ্মতেজে বলীয়ান্ হইয়া ভারতে এক অমোঘ মন্ত্রের প্রচার আরম্ভ

করিয়া বারম্বার বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ক্ষাত্রতেজে হিংসাদ্বেষকে সমূলে উৎপাটিত করিবার উপায় প্রকাশ করিলেন। সমগ্র ভূমণ্ডল তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল, কিন্তু আজও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। সম্ভবত কল্কী অবতার যিনি হইবেন, তিনি পরশুরাম হইতে বুদ্ধদেব পর্য্যন্ত যে সকল নীতি ও সত্য পৃথকভাবে প্রচারিত হইয়াছে, সেই সকল নীতি ও সত্য সমষ্টিভাবে প্রচারিত করিবেন এবং সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় প্রকাশ করিয়া দিবেন।

আদিম মানবের আচার ব্যবহার আলোচনা করিতে করিতে শান্তিমন্ত্রে আসিয়া পড়িলাম। এই সূত্রে সভ্যসমাজের মতিগতি সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। এখন আর কোন জাতিই সহসা যুদ্ধে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত নহেন। সকলেই বুঝিয়াছেন যে যুদ্ধে কি ভয়ানক ক্ষতি। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য না হইলে আর আজকাল কেহ যুদ্ধে অগ্রসর হইবার পরামর্শ দেন না। এখন সকল কথায় মধ্যস্থের সালিসী মানা হয়। তবে কথা এই যে মানুষ সর্ব্বত্রই মানুষ। যখন কোন সবল জাতি দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিবার অবসর পায় এবং দেখে যে দুর্ব্বল জাতির কোনরূপ প্রতিবিধান করিবার উপায় নাই, তখন সবলের মুখে সালিসীর নামগন্ধ নাই। আবার যখন দুর্ব্বল সবলের অত্যাচারের অন্তত কিছুমাত্র প্রতিবিধানের উপায় করিতে পারে তখন সবল নিজ মান রক্ষার তরে তাড়াতাড়ি সালিসীর কথা বলেন এবং দুর্ব্বলকে অগত্যা তাহা স্বীকার করিতে হয়। যখন উভয় পক্ষই প্রবল তখন তো আর কথাই নাই, উভয় পক্ষই গুরুতর ক্ষতির ভয়ে সালিসী স্বীকার করেন। পূর্ব্বে এই সকল কিছুই সম্ভব ছিল না। এইরূপ সালিসী স্বীকার করা অবশ্য সুখের বিষয় সন্দেহ নাই—সমগ্র জগৎ যে পাশবরৃত্তি হইতে অধ্যাত্মরাজ্যের অভিমুখে চলিয়াছে, ইহা তাহারই লক্ষণ। বর্ত্তমানে সমগ্র ভূমণ্ডলে সালিসীর মধ্যস্থতাই একমাত্র মূলমন্ত্র—সকল স্থলে কার্য্যে পরিণত না-ই হউক। বর্ত্তমানযুগ বুদ্ধদেবেরই যুগ চলিতেছে। চৈতন্যদেব, যীশুখৃষ্ট, ইহাঁরা সকলেই সেই অহিংসামন্ত্রই প্রচার করিয়াছেন। এমন কি মহম্মদও দেশকালপাত্রের অবস্থা অনুসারে অহিংসাধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন বলিতে হইবে—ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত সুফিগণও মুসলমান এবং কোরাণেরই অভিব্যক্তিতে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত। এদিকে

মহাপ্রেমিক খৃষ্টীয়প্রবর শত অত্যাচারের মধ্যেও শান্তি মন্ত্র প্রচার করিতেছেন—পাশ্চাত্য জগতে আজকাল তাঁহার মন্ত্র প্রতিগৃহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আমরা এতদূর পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি যে "মৃত্যু যে সে অমৃতসোপান" এবং সংগ্রামেই শান্তি। এখনও আমরা তাহাই পুনরুক্ত করিব যে সংগ্রামেই শান্তি। কিন্তু এখনকার সংগ্রামে পূর্ব্বেকার পশুবল প্রয়োগ করিয়া অপরের বধসাধন করিলে শান্তি আসিবে না। এখন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে পাপপুণ্যের সংগ্রামে, সদসতের সংগ্রামে পুণ্যের, সতের পক্ষ লইতে হইবে—ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সংসারে এই পাপপুণ্যের সংগ্রামই ভীষণতম সংগ্রাম। এবং এই সংগ্রামে যে পক্ষে ন্যায় সত্য দণ্ডায়মান হইবে, পরিণামে সেই পক্ষেই নিশ্চিত বিজয়শ্রী লাভ—সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর স্বয়ং সেই পক্ষের উপদেষ্টা হয়েন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায় বামন অবধি কল্কীযুগ মূলক ত্রয়োদশ কথা সমাপ্ত।

—০—

চতুর্দশ কথা—জড় ও আত্মা।

প্রাণোহ্যেষযঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি। এই যিনি প্রাণস্বরূপ সর্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। ডার্বিন প্রচারিত অভিব্যক্তিবাদ জীবাদি প্রাণপঙ্ক হইতে মানবের অভিব্যক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু জড় হইতে প্রাণ, আত্মা প্রভৃতির অভিব্যক্তি সম্ভব কি না, এই প্রশ্ন অভিব্যক্তিবাদীদিগের মধ্যে এতই আন্দোলিত হইয়া থাকে যে তৎসম্বন্ধে আমাদিগের দুই চারিটী সামান্য বক্তব্য নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন না হইলেও হইতে পারে।

জড় হইতে প্রাণের অভিব্যক্তি বলিলাম, কিন্তু জড়পদার্থ বলিয়া কোন পদার্থ কি আছে? কে বলিতে পারে যে আমরা যাহাকে জড় পদার্থ বলিয়া নিজেদের চৈতন্যজনিত গর্ব অনুভব করি, তাহা সত্যসত্যই নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ? সত্যই কি তাহাতে প্রাণ নাই? একথা যদি সত্য হয়, তবে সমগ্র বিজ্ঞান ভ্রান্ত। একই মূলমন্ত্র বিজ্ঞানের সমগ্র অংশে কার্য্য করিবে। বিজ্ঞানের অবলম্বনীয় সাধারণ সত্য সকল যে তাহার এক অংশে কার্য্য করিবে, অপর অংশে করিবে না, ইহা নিতান্তই শৈশবোচিত কথা। জগতে অভিব্যক্তি কার্য্য করিতেছে, ইহা হইল বিজ্ঞানসিদ্ধ ও পরীক্ষিত একটী সত্য। একদিকে জ্যোতির্বিদ্‌গণ ধ্রুবসত্যরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে নীহারিকা হইতে নিত্য নবনব জগতের অভিব্যক্তি হইতেছে; আবার এদিকে জীবতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করিতেছেন যে জীবাদি হইতে মানবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এঅবস্থায় জগতে সেই জীবাদিরই সহসা আবির্ভাব কল্পনা করিবার আমাদের কি-ই বা অধিকার এবং প্রয়োজনই বা কি? আমরা সিদ্ধান্তমূলক অনুমানের সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে জড়পদার্থ বলিয়া প্রকৃত কোন পদার্থ নাই—প্রত্যেক পরমাণু প্রাণময় এবং জগতে যে কোন শক্তি কার্য্য করিতেছে, সকলই প্রাণশক্তিরই রূপান্তর।

সকলেরই জানা আছে যে কয়লার অভিব্যক্তিতেই হীরকের উৎপত্তি। অঙ্গার সংহত হয়, দানা বাঁধে, উজ্জ্বল হয় এবং ক্রমে হীরকে আসিয়া পৌছে। আবার যতদূর প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে অনুমিত হয় যে উদ্ভিদেরই রূপান্তরে

হীরকমূল অঙ্গারের উৎপত্তি। ইহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বলা বাহুল্য যে সেই উদ্ভিদ সময়ে প্রাণরাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং জীবনসংগ্রামেরই তাড়নায় উদ্ভিদভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্গারে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং অভিব্যক্ত হীরকেরও সংগঠনে যে জীবনসংগ্রামের কার্য্যকারিতার অভাব তাহা বলা যায় না। কোহিনুরের মত উজ্জ্বল ও নিখুঁত হীরক কি এপর্য্যন্ত মানুষে সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে? যে কারণে মানুষ জীবন সৃষ্টি করিতে পারে না, সেই কারণে কোহিনুরেরও সৃষ্টি করিতে মানব অক্ষম। অক্ষমতার কারণ আমরা যাহা অনুমান করি তাহা ক্রমশ ব্যক্ত হইবে। কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে মাংসাশী বৃক্ষ যখন সহসা অভ্যাগত জীবের রুধির প্রভৃতি শোষণ করিয়া তদুপাদানে স্বীয় জীবিকাসম্পাদন করে, আমরা তাহার নাম দিই প্রাণন কার্য্য। আর, কয়লা যখন যুগযুগান্তর ধরিয়া জল বালি প্রভৃতি উপাদানকে নিজের উজ্জ্বলতা সম্পাদনের, নিজের অভিব্যক্তির সহায় করিয়া লয়, তখন তাহাকে প্রাণন কার্য্য বলিতে চাহি না—প্রাণের কি বিসদৃশ ব্যাখা!

তোমরা বলিবে যে "জীবদেহ অপূর্ণগঠিত উপাদান অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া সেই উপাদান হইতে আপনার শরীরোপযোগী মসলা তৈয়ার করিয়া বৃদ্ধি পায়। গাছ হাওয়া, আর জল, আর ভস্ম বাহির হইতে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া স্বীয় দেহ নির্ম্মাণ করে। মনুষ্যদেহ শাকান্ন অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া মাংস, মজ্জা, স্নায়ু নির্ম্মাণ করিয়া লয় ও বৃদ্ধি পায়।" দেহপুষ্টি করিবার বা বৃদ্ধি পাইবার অর্থ অবস্থার মধ্যে নিজেকে যোগ্যতম করা। জগতে এমন কোন কিছু, একটী পরমাণুও আছে কি, যাহা স্ব স্ব অবস্থার মধ্যে যোগ্যতম হইবার চেষ্টা না করে? যেই কোন পদার্থ স্বীয় অবস্থার অযোগ্য হইয়া পড়ে, তখনই তাহা বিনাশের অভিমুখীন হয় অর্থাৎ নিজের খোলস ছাড়িয়া যোগ্যতর রূপান্তরগ্রহণে সচেষ্ট হয়। জীবগণ আপনাদিগকে যোগ্যতম করিবার জন্য যে পরিমাণ আহার করে অথবা বাহিরের উপাদানকে নিজস্ব করিবার চেষ্টা করে, তাহারা কি ঠিক সেই পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়? তাহাদের ক্ষমতার উপযুক্ত অংশটুকু অন্তরঙ্গ করিয়া লয় ও শরীরের উপাদানে পরিণত করে, বাকী অংশ নানা উপায়ে পরিত্যাগ করে। জড়পদার্থ সকলও ঠিক সেই একইরূপে বাহিরের উপাদানকে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে যোগ্যতম করিবার জন্য অহর্নিশি চেষ্টা করিতেছে—উভয়ের মধ্যে

প্রভেদ অন্তরঙ্গ করিবার কৃতকার্য্যতার পরিমাণে। কয়লা যে নিজেকে হীরকে পরিণত করে, আমাদের চক্ষে তাহা জৈবিক কার্য্যেরই নিতান্ত অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। জীবদেহেও যে রাসায়নিক কার্য্য, কয়লার হীরক হওয়াতে অথবা কাষ্ঠের প্রস্তর হওয়াতেও সেই একই রাসায়নিক কার্য্য। আমরা জীব ও জড়ের মধ্যে পরমাণুর অথবা শক্তিসমূহের সংহতির পরিমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না। জীবে যে প্রাণ সংহত, যে সকল পরমাণু সংহতভাবে আছে, জড়ে সেই প্রাণ ও সেই পরমাণু সকল বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্তভাবে থাকে। সূর্য্যরশ্মি এত বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত যে তাহা দ্বারা কোন পদার্থ সহসা দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আতস কাচের দ্বারা সেই রশ্মিকে সংহত আকারে আনিলে অথবা অগ্নি প্রভৃতিতে সেই সৌরতেজকে পুঞ্জীভূত আকারে প্রকাশ করিলে তাহা দ্বারাই দহনকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। পৃথিবীতে জলের অভাব নাই, লৌহও অপর্য্যাপ্ত আছে—কিন্তু সমস্তই বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতভাবে আছে। জীবরক্তেও সেই জল আছে, সেই লৌহ আছে, কিন্তু সকলই অধিকতর সংহত ভাবে। লৌহ জীব-রক্তে এতটা লম্বা, এতটা চওড়া আকারে থাকে না, কিন্তু রক্তের অন্যান্য উপাদানের পরমাণুর সহিত সংহত সংমিশ্রণে বর্ত্তমান থাকে।

জগতের অংশবিশেষকে জড়পদার্থরূপে বিভাগ করা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সকল পদার্থ যদি বাস্তবিক জড় বা নিষ্প্রাণ হইত, তাহা হইলে সেই সকল পদার্থ অবলম্বনে আমাদিগের প্রাণধারণ সম্ভব হইত না। আমরা যখন উদ্ভিজ্জ কাটিয়া অথবা জীবকে নিহত করিয়া আহারীয় প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করি, তখন সাধারণত বলিয়া থাকি যে তাহা হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সত্যই যদি মৃত্যুর ফলে তাহা প্রাণহীন পদার্থে পরিণত হইত, তাহা হইলে আমরা সেই উপাদান গ্রহণ করিয়া জীবনধারণে নিশ্চয়ই সমর্থ হইতাম না—কারণের অতিরিক্ত কার্য্য হওয়া বিজ্ঞানের অননুমোদিত। আসল কথা এই যে, জীবিত অবস্থায় জীবশরীরে যেরূপ অসংখ্য জীবাদিকোষ থাকে, মৃত্যুর পরেও তাহার অভাব ঘটে না। কেবল যে শৃঙ্খলা থাকাতে জীবিত প্রাণীর একদিকে গতি হইতেছিল, সেই শৃঙ্খলার অভাবে মৃতপ্রাণীর অপরদিকে কার্য্যগতি হইল। যখন মৃতজীবের শরীরেও জীবাদিকোষের অস্তিত্ব বিজ্ঞান

সিদ্ধ হইয়াছে, তখন এ অনুমান নিতান্ত অন্যায় নহে যে জড়াভিহিত পদার্থেও আমাদের আপাততঃ অগোচর জীবাদির অতি আদিম কোষ অথবা প্রাণের অস্তিত্ব আছে। জল একটী জড় পদার্থ, ইহা সর্ববাদসম্মত, ইহা দুইটী বাষ্প ও মিশ্রণোপায় তেজসংযোগে উৎপন্ন হয়; কিন্তু বিনা জলপানে জীবের জীবনধারণ একেবারেই অসম্ভব। বায়ু অম্লজান প্রভৃতি বিভিন্ন বায়বীয় জড়পদার্থে সংগঠিত, কিন্তু সেই বায়ু বিনা জীবগণের জীবনরক্ষা অসম্ভব। নদীমৃত্তিকার সাহায্যে জীবদেহ পরিপুষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। জীবদেহে রক্তের অভাব ঘটিলে লৌহ উপযুক্ত উপায়ে শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে পুনরায় রক্ত দেখা দেয়। একথা বলিলে চলিবে না যে এই সকল জড়পদার্থ জীবাদির অস্তিত্বের অনুকূল এবং সুতরাং জীবাদিকোষে গঠিত জীবদেহেরও পরিপুষ্টির অনুকূল। জড়পদার্থ, প্রাণহীন মৃত পদার্থ জীবাদিরই অস্তিত্বের অনুকূল হয় কেন? অম্লজান বায়ু দূষিত রক্তকে পরিষ্কার করে—কেন? মৃতপদার্থের এরূপ ক্ষমতা হয় কেন যে সে জীবিত প্রাণীর জীবনের প্রধান উপকরণ রক্তের শোধন করে? দেহে লৌহের অভাব ঘটিলে রক্তের লোহিত অংশ চলিয়া যায়—লৌহ প্রবেশ করিলে কেন জীবিত প্রাণীর রক্তের লোহিত অংশ ফিরিয়া আসে এবং কেন তাহাতে জীবের স্বাস্থ্যলাভ ঘটে? জড়-পদার্থকে প্রাণবিশিষ্ট না বলিলে এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না।

বিজ্ঞানের একটী সিদ্ধান্ত এই যে জগতের পরমাণুর সমষ্টি ধ্রুবনির্দ্দিষ্ট; বিজ্ঞানের আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে জগতের যাবতীয় শক্তিরও মূলসমষ্টি ধ্রুবনির্দ্দিষ্ট। এই কারণে আমরা একটী পরমাণুর সৃষ্টিও করিতে পারি না, ধ্বংসও করিতে পারি না; একটী শক্তিরও সৃষ্টি করিতে অক্ষম এবং বিনা-শেও অক্ষম। সুতরাং পরমাণুগুলি জড়ই হউক বা প্রাণময় হউক, অথবা প্রাণশক্তিরই রূপান্তরে যাবতীয় শক্তির উৎপত্তি স্বীকৃত হউক, তাহাদের মূলসমষ্টির ধ্রুবত্বের উপর যে সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগু-লিতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত এরূপ সম্ভা-বনা থাকিলে প্রাণের রূপান্তরে শক্তির উৎপত্তি স্বীকার করা অসম্ভব হইত। এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে কি পরমাণু, কি শক্তির ধ্রুবত্ব কেবল এই

পৃথিবী ধরিয়া নহে, জগত চরাচর ধরিয়া এই ধ্রুবত্ব প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই পৃথিবীতে মৃত্যু বা দৈহিক রূপান্তর ঘটিলেই যে দেহের ও শক্তির কার্য্য শেষ হইল তাহা বলা যায় না—লোকলোকান্তরে শক্তিরাশির বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র ছড়াইয়া আছে, দেহের অত্যল্প অংশও পৃথিবী ছাড়িয়া যায় কি না, মানবের বর্ত্তমান জ্ঞানে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। এই ধ্রুবত্বের উপর দাঁড়াইয়াই আমরাও বলিতেছি যে জগতে প্রকৃতপক্ষে একই শক্তি কার্য্য করিতেছে এবং এই ধ্রুবত্বের উপর দাঁড়াইয়াই বলিতেছি যে সেই শক্তি যাঁহার শক্তির কণিকার কণিকা, তিনি পূর্ণশক্তি, সেই মহাশক্তি পূর্ণ না হইলে এই শক্তির ধ্রুবত্ব অসম্ভব হইত।

এক সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে রসায়নগৃহে পরীক্ষা দ্বারা জড়-পদার্থ হইতে প্রাণের অভিব্যক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে; অপর সম্প্রদায়ের মতে তাহা অসম্ভব—মানব প্রাণের অভিব্যক্তি প্রদর্শনে অক্ষম। যে সকল পরীক্ষার উপর উপরোক্ত মতদ্বয় স্থাপিত, সেগুলি আমাদিগের মতে সন্তোষ-জনক নহে। এক সম্প্রদায় জলপূর্ণ এক পাত্র বদ্ধমুখ রাখিয়া কিছুকাল পরে তাহাতে প্রাণের উৎপত্তি দেখিয়া আনন্দিত হইয়া উঠিলেন যে প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। অপর সম্প্রদায় স্থির করিলেন যে এই পরীক্ষায় নিশ্চয়ই কোনপ্রকার ত্রুটী ছিল। তাঁহারা জল গরম করিয়া একটা পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া কিছুকাল পরে যখন দেখিলেন যে একটী প্রাণকণারও উৎপত্তি হয় নাই, তখন তাঁহারা আনন্দসহকারে ঘোষণা করিলেন যে প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তিসাধন মানবের পক্ষে অসম্ভব। আমা-দিগেরও মতে জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তিসাধন প্রদর্শন মানবের ক্ষুদ্র পর-মায়ুর পক্ষে অসম্ভব। প্রাণী মাত্রেরই অভিব্যক্তিতে দুইটী অধিকরণ আবশ্যক—স্থান ও কাল। এই দুইটী অধিকরণের বিস্তৃতির সঙ্গে অভিব্যক্তিরও প্রকারবিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব লাভ হয়। ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে একটী স্তর গঠিত ও সুতরাং সেই স্তরের প্রাণীগণের অভিব্যক্ত হইতে তিন কোটীরও অধিক বৎসর লাগিয়াছে, তবু এই স্তরে নিম্ন প্রাণীর অস্তিত্ব পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। এঅবস্থায় একটা ক্ষুদ্র পাত্রের জল হইতে, আমরা যাহাকে সচরাচর প্রাণ বলি তাহা বিনষ্ট করিয়া এক বৎসরে

দশবৎসরে, পঞ্চাশ বৎসরে অথবা একশত বৎসরেই বা কিরূপে তাহাতে প্রাণের অভিব্যক্তি আশা করিতে পারি? এরূপ পরীক্ষার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী অতি অল্প সময় বলিয়াই ধরিতে হইবে

দ্বিতীয়ত, নির্বাচনক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতাও অভিব্যক্তির বিশেষ অন্তরায়। নির্বাচনক্ষেত্র প্রশস্ত হইলে, একস্থানের গুণে হয়তো অপেক্ষাকৃত উচ্চ প্রাণী অভিব্যক্ত হইল, অপর স্থানের নিম্ন প্রাণীসকল সেই উচ্চ প্রাণীর সহিত সহবাসে ও সংঘর্ষণে ক্রমে শীঘ্র উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিতে পারে। নির্বাচনক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইলে সেই ক্ষেত্রস্থ প্রাণের উপর একই প্রকার অবস্থার প্রভাব পড়ে, সুতরাং অভিব্যক্তির একটী মূল পরিবৃত্তির কার্য্য করিবার তত সুবিধা হয় না। নির্বাচনক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতার কারণে পরিবৃত্তির অসুবিধা হওয়াতে অষ্ট্রেলিয়ায় কোষপায়ীর অতিরিক্ত বৃহৎকায় স্তন্যপায়ী জীবের অভিব্যক্তির অভাব ঘটিয়াছে। সেই একই কারণে ম্যাডাগাস্কার দ্বীপেও উন্নতজীবের অভিব্যক্তি ঘটিতে পারে নাই। এই দুই স্থান স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাবের পূর্বেই মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাগরপরিবেষ্টিত দ্বীপে পরিণত হইয়াছিল এবং নির্বাচনক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা হেতু এই সকল স্থানের প্রাণীরাজ্য একটা নিম্নসীমায় দাঁড়াইয়া গেল। সেই সীমা যে অতিক্রম করা যায় না, তাহা নহে—ঐ সকল সাগরবেষ্টিত দ্বীপেও উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর অভিব্যক্তির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাহা বহুকালসাপেক্ষ; তদুপরি তথায় সর্বভুক ও হিংস্রতম জীব মানবের সমাগম হওয়াতে উচ্চ জীবের অভিব্যক্তির আশা তো সুদূরপরাহত, তত্তদ্দেশীয় বর্ত্তমান জীবের অস্তিত্ব থাকিলে হয়। এ অবস্থায় সামান্য একপাত্র জলে, বিশেষত উত্তাপের সাহায্যে যতদূর সম্ভব সেই জলের অন্তরস্থ প্রাণের ধ্বংসসাধন করিয়া, তাহা হইতে সদ্য সদ্য নূতন জীবের অভিব্যক্তির আশা করা নিতান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয় এক পথে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরাও বিভিন্ন পথে সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। মোট কথা এই যে জড় হইতে প্রাণের অভিব্যক্তিরূপ মত যেন চারিদিক হইতে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে; এই মত সিদ্ধান্তসূর্য্যরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যেন তাহার অরুণাভাস দেখা দিতেছে। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে জড়পদার্থের উপর তাড়িতের কার্য্য জীবের পেশীর উপর আঘাতজনিত কার্য্যের সহিত

সমধর্মী। * তিনি দেখাইয়াছেন যে, যেমন জীবের পেশী আঘাতের ফলে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় উত্তাপ প্রভৃতি নানা উপায়ে স্বভাবে প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেইরূপ জড়পদার্থ সকলও তাড়িতের আঘাতে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উত্তাপ প্রভৃতি উপায় স্বভাবে ফিরিয়া আসে। এই বিকৃত অবস্থা হইতে স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটনায় জড় ও জীবে যে এমন সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সত্য। জীবদেহে বাহির হইতে কোন শক্তি কাজ করিলে তাহার উত্তরে সাড়া দিবার ক্ষমতাই প্রাণের প্রধান ও বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া উল্লিখিত হয়। চিম্‌টি কাটিলেই মাংসপেশীর সংকোচন ঘটে। পেশীযন্ত্র ও স্নায়ুযন্ত্রঘটিত যাবতীয় ব্যাপারের মূল এই সাড়া দিবার ক্ষমতা। এই সাড়া দিবার শক্তি আছে বলিয়াই জীবদেহ জড়জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষণে সমর্থ। জীবদেহ এমন ভাবে, এমন সময়ে সাড়া দিবার চেষ্টা করে যাহাতে তাহার মঙ্গল ঘটে, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষণ ঘটে। হার্বার্ট স্পেন্সরের মতে বাহ্যব্যাপারের সহিত আভ্যন্তর ব্যাপারের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি রক্ষার অবিরাম চেষ্টার নামই জীবন। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সত্যের সম্মুখে আমরা এখন হইতে এই সাড়া দেওয়াকে জীবের বিশিষ্ট লক্ষণ বলিতে পারিব না, ইহাকে জড়েরও লক্ষণ বলিতে হইবে, অথবা বলিতে হইবে যে জড় ও জীব এই বিষয়ে সমধর্মী ; অন্য কথায় বলিতে পারি যে সম্ভবত জড় প্রাণময়, কেবলই নিষ্প্রাণ জড় নহে।

এই সাড়া দেওয়া ব্যতীত আরও কয়েকটী বিষয়ে জীব ও জড়ের সমধর্মিত্ব অনুভূত হয়। জীবদেহ আপনাকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করিয়া সন্তান উৎপাদন পূর্ব্বক বংশরক্ষা করে। একখণ্ড জীবদেহ হইতে বহুখণ্ড জীবদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ও পিতৃপুরুষের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। সচরাচর ইহা জীবেরই বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু দেখি যে উপযুক্ত অবলম্বন পাইলে, যাহাকে আমরা জড়পদার্থ বলি, তাহাও বংশবৃদ্ধি বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। জড়ের বংশবৃদ্ধির উপায় যে বিভিন্ন হইতে

* অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত তত্ত্ব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করিলে পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৩০৮ সালের ভাদ্রের "সাহিত্যে" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত "জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার" প্রবন্ধটী পাঠ করিবেন।

পারে তাহা বলা বাহুল্য। সকল জীবেরও যে একই উপায়ে বংশবৃদ্ধি সাধিত হয় তাহা নহে। বীজ নিজের উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে উপযুক্ত গর্ভে স্থান পাইলেই অঙ্কুরিত হইতে থাকে। নিষিক্ত মনুষ্যবীজ উপযুক্ত অবলম্বন পাইয়া জরায়ু মধ্যে বহুকাল যাবৎ সযত্নে পরিবর্দ্ধিত হয়। ফুল হইতে ফলের উৎপত্তিও উপযুক্ত গর্ভে বীজনিষেকের ফলে সংঘটিত হয়। তবে, মনুষ্য প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রাণীগণ যেরূপ নিজ ইচ্ছায় নিষেক কার্য্য সম্পাদন করে, গাছেরা সেরূপ পারে না—তাহাদের ফুলে বীজনিষেকের জন্য পতঙ্গের সাহায্য আবশ্যক। কোন কোন গাছের একই ফুলের ভিতরে এমনি কৌশল আছে যে স্বতই যথাসময়ে নিষেককার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। এদিকে পুরুভুজ প্রভৃতি অতি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীগণ ভিন্ন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে। "তাহার সন্তানেরা প্রথমে তাহার শরীরোপরি ব্রণের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয় এবং ন্যূনাধিক দুই দিবসে সম্পূর্ণ সমস্ত অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার গাত্র হইতে স্খলিত ও পতিত হয়।" এই পুরুভুজকে আবার দুইখণ্ড করিলে প্রত্যেক খণ্ডই এক একটী নূতন পুরুভুজে পরিণত হয়। এই সম্বন্ধে আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে—জীব যতই উন্নত শ্রেণীর হয়, ততই তাহাদের সন্তানগণের মধ্যে পরিবৃত্তিজনিত বিভিন্নতা পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। জড়পদার্থকে সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর জীব বলিয়া ধরিলে আমরা অনুমান করিতে পারি যে জড়পদার্থের সন্তানগণ মোটের উপর নিতান্তই অভিন্নাকৃতি হইবে এবং ফলেও তাহাই দেখা যায়।

জড়পদার্থের বংশবিস্তৃতিসাধন আলোচনা করিতে গেলে আপাতত পৃথিবীস্থ জড়পদার্থের মূল সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। সূর্য্য যখন অবধি সংহত হইতে লাগিল, তখন অবধি কি তাহা হইতে সমধর্মী গোলকখণ্ডসকল বিচ্ছিন্ন হইয়া বলিতে গেলে সূর্য্যের বংশবৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে নাই? গ্রহউপগ্রহ সকলকে আমরা সূর্য্যের পুত্রপৌত্র বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সকল পদার্থেরই মধ্যে আকর্ষণ শক্তি কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ, দুই আকারে কার্য্য করিতেছে। কেন্দ্রানুগ আকারে আকৃষ্ট বস্তু আকর্ষক বস্তুর কেন্দ্রের অভিমুখীন হয়, কেন্দ্রাতিগ আকারে আকর্ষক হইতে দূরে চলিয়া যায়। একই আকর্ষণ শক্তির যে উপরোক্ত দুই আকার, ইহা বিজ্ঞানের একটী সিদ্ধান্ত। বলিতে

গেলে কেন্দ্রানুগ আকারেই জীবের আত্মরক্ষা সাধিত হয়, জীবসকল পদার্থকে আপনার শরীরের, মনের অনুগত করিবার চেষ্টা করে, এবং কেন্দ্রাতিগ আকারেই জীব অব্যবহার্য্য পদার্থ সকল শরীর হইতে বহিষ্ক্রান্ত করিয়া দেয় এবং নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিয়া সন্তানোৎপাদন করিয়া থাকে। জড়পদার্থও আকর্ষণের কেন্দ্রানুগ আকারে সংহত থাকিবার এবং প্রকারান্তরে আত্মরক্ষার উপায়বিধানের চেষ্টা করিয়া থাকে এবং কেন্দ্রাতিগ আকারে আত্মবিশ্লেষণ পূর্ব্বক প্রকারান্তরে বংশবিস্তৃতি সাধন করে। কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণেরই প্রভাবে সূর্য্য হইতে গ্রহগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে; লৌহ হইতে মরিচা ঝরিয়া যায়; জল হইতে বাষ্প উদ্গত হইয়া জলহীন স্থানে জল দান করে। এই কেন্দ্রাতিগ শক্তিরই ফলে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল সূক্ষ্ম বালুকণাতে পরিণত হয়—প্রস্তর সিক্ত হইবার পর তাহার অন্তঃস্থিত জল যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখন সেই বাষ্পের বিকর্ষণী শক্তির প্রভাবে প্রস্তর সংহত থাকিবার পরিবর্ত্তে বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বাকৃতি বালুকণায় পরিণত হয়, আবার সেই বালুকণা অন্যান্য পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া সময়ে বৃহদাকার ধারণ পূর্ব্বক নূতন পিতামাতার স্থান অধিকার করে।

পণ্ডিতবর ওয়ালেস মানুষ ও অন্যান্য পশুগণের মধ্যে পরস্পরের রোগ-সংক্রমণের সম্ভাবনাকে জীবমাত্রেরই শরীরের সমধর্ম্মিত্ব ও একই উপকরণে গঠিত হইবার অন্যতর প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ রোগসংক্রমণের প্রমাণ অবলম্বনে ওয়ালেস বলেন যে নিম্নশ্রেণীর শরীর হইতে মানবশরীরের অভিব্যক্তি সম্ভব। এখন, আমরা দেখি যে অম্লজান বায়ু জীবশরীরেও প্রবেশ করিয়া দহন কার্য্য সাধন করে—তাহার প্রণালী বিভিন্ন বলিয়া আমরা নাম দিই প্রাণন কার্য্য; আবার সেই অম্লজান অন্যান্য জড়পদার্থেও প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করে। লৌহ অম্লজান সহযোগে ভস্ম হয়; সকল পদার্থই ভস্ম হয়। এই অবস্থায় আমরা জীব ও জড়কে কেমনে সমধর্ম্মী বলিব এবং কিরূপেই বা জড় হইতে জীবের অভিব্যক্তি অসঙ্গত বোধ করিব? আমাদিগের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে জীব ও জড়ে বস্তুগত কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল শক্তিসংহতির পরিমাণে। এই বস্তুগত প্রভেদের অভাব বশতই অনেক জৈব পদার্থ, যথা ঘি, তেল, মদ, চিনি প্রভৃতি যাহা সচরাচর প্রাণীদেহে বা উদ্ভিদের দেহ মধ্যে নির্ম্মিত হয়, তাহা আজকাল জড় উপাদানেও নির্ম্মিত হইতেছে।

আমরা এতদুর দেখিয়া আসিলাম যে জীব ও জড়ে কোন মৌলিক প্রভেদ নাই। কিন্তু বিজ্ঞানে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে সত্তরটী মূলপদার্থের পরস্পরের মধ্যে একটা অদ্ভুতগোছ জ্ঞাতিসম্পর্ক বিদ্যমান আছে এবং যাবতীয় জড়শক্তি, যথা তাড়িত, উত্তাপ প্রভৃতি পরস্পরের মধ্যে পরিবর্ত্তনসহ অর্থাৎ একের পরিবর্ত্তনে অন্যের উৎপত্তি সম্ভব। উত্তাপের পরিবর্ত্তনে তাড়িতের উৎপত্তি সম্ভব, আবার তাড়িতের পরিবর্ত্তনে উত্তাপের উৎপত্তি সম্ভব। সেইরূপ উত্তাপ, গতি প্রভৃতি সকল জড়শক্তিই পরস্পরের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তবে, অল্প তাড়িতের প্রয়োগে অনেকটা উত্তাপ বা আলোক হইতে পারে, ইহার কারণ এই যে উত্তাপ বা আলোক একই শক্তির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আকার এবং তাড়িত অপেক্ষাকৃত সংহত আকার। সপ্রমাণ হইয়াছে যে আলোক তাড়িত প্রভৃতি জড়শক্তি ব্যোমে (ether) আঘাতজনিত উর্ম্মিরই নামান্তর। "ছোট ছোট ঢেউ গুলির নাম আলোকতরঙ্গ, বড় বড় ঢেউ গুলির নাম তাড়িততরঙ্গ; ছোট বড় সকল ঢেউ আকাশতরঙ্গ।" তাড়িত তরঙ্গের বৃহদাকৃতি হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। আবদ্ধ বা সংহত জলস্রোতের বহির্গমনকালে তাহার উত্তাল তরঙ্গের তেজ, আকৃতি ও ভীষণতা যেমন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ তাড়িতের সংহতির কারণেই প্রকাশের কালে তাহার তরঙ্গ ও তেজের আকারবৃদ্ধি দেখা যায়। আকাশবাহিত তাড়িততরঙ্গে ও আকাশবাহিত আলোকতরঙ্গে কোন মৌলিক প্রভেদ বর্ত্তমান নাই। সেইরূপ, উত্তাপ, চৌম্বক প্রভৃতি যাবতীয় জড়শক্তির পরস্পরের মধ্যে কোন মৌলিক প্রভেদ নাই বলিয়াই যাবতীয় জড়শক্তিই একমাত্র ব্যোম অবলম্বনেই পরিভ্রমণ করিতে পারে, ইহা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। তবেই বলিতে গেলে জড়পদার্থ সমূহের মৌলিক একত্ব এবং জড়শক্তিসমূহের মৌলিক একত্ব পৃথকভাবে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপরদিকে বিজ্ঞান ও দর্শন কেহই পরমাণু ও ও শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না—তাঁহারা উভয়েই অন্তর্দৃষ্টিবলে উভয়েরই মূল একত্ব অনুভব করিয়াছেন। এখনও সেই একত্ব সিদ্ধান্তরূপে সাধারণের প্রত্যক্ষ করাইবার উপযোগী প্রমাণ সংগৃহীত হয় নাই। যেদিন এই মৌলিক একত্ব সপ্রমাণ হইবে, সেদিন বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ে মিলিত হইয়া সৃষ্টিরহস্যের এক নূতন দ্বার খুলিয়া দিবে।

আমরা এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি আর সংবাদপত্রে দেখি যে জড়পদার্থ সকলের দানা বাঁধাও জীবনীশক্তির কার্য্যরূপে অনুমান সিদ্ধান্তকল্প হইয়া দাঁড়াইতেছে। সম্প্রতি জর্ম্মাণ পণ্ডিত ডাক্তার ভন স্ক্রন আবিষ্কার করিয়াছেন যে কলেরার জীবাণু সকল জড়পদার্থের ন্যায় দানা বাঁধিয়া থাকে। এই দানাবাঁধা বিষয়ে আলোচনার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে "আমরা যাহাকে জীবনীশক্তি বলি, যাবতীয় পদার্থে তাহাই একমাত্র কার্য্য করিতেছে।" তিনি বলেন "দানার আদিম উৎপত্তি, তাহাদের মূল ও অবান্তর অবস্থা বিষয়ক আলোচনার ফলে আমি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছি যে আমরা যে শক্তিকে জীবন বলি, সেই একমাত্র শক্তিই বিভিন্ন আকারে যাবতীয় পদার্থের উপর কার্য্য করিতেছে। যে প্রণালীতে জীবনীশক্তি দানাগঠন করে, তাহা ও তাহার আনুসঙ্গিক ঘটনা দেখিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে উত্তাপ, আলোক, রাসায়নিক শক্তি, তাড়িত, আকর্ষণ প্রভৃতি যাবতীয় শক্তিই সেই জীবনীশক্তিরই রূপান্তর মাত্র। আমার বিশ্বাস যে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গ সকল প্রাণতত্ত্বেরই বিভাগস্বরূপে পরিগণিত হইবে।" বলা বাহুল্য যে এই ভন স্ক্রন, পাস্তুরের পর সুপ্রসিদ্ধ জীবাণুবিদ্ কসের সহিত জীবাণুতত্ত্বে সমান স্থান অধিকার করেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে জীবনীশক্তি জড়শক্তিরই সংহত আকার মাত্র। আমাদের বিশ্বাস যে আমরা যাহাকে মন বা আত্মা বলি, তাহাও জড়শক্তির সংহত আকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাণ, মন, আত্মা এই সকল নাম একই শক্তির সংহতির পরিমাণ বা মাত্রানুসারে প্রদত্ত হয়। দেখিয়া আসিয়াছি যে জড়শক্তি সকল ব্যোম অবলম্বনে পরিভ্রমণ করে, আত্মশক্তি যে তাহা করে না, ইহা কে নিঃসংশয়ে বলিতে পারে? পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে তাড়িতবার্ত্তা তার প্রভৃতি স্থূল অবলম্বন বিনা চলিতে পারে না। এখন, কেবল মাত্র ব্যোম অবলম্বনে যে তাহা চলিতে পারে, তাহা সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ চিন্তা মানসিক কার্য্য হইলেও যখন তাহা অন্যের মনে প্রক্ষিপ্ত হয় তখন তাহা যে ব্যোম অবলম্বনে হয় না কে বলিতে পারে? জড়াভিহিত পদার্থ সকল যে আকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি প্রকাশ করে, তাহা ব্যোম অবলম্বনেই প্রকাশিত হয়। উদ্ভিদ প্রভৃতি প্রাণীগণ যে তাপ, আকর্ষণ প্রভৃতির

অতিরিক্ত বর্ণ বা প্রতিফলিত কিরণ বিকীর্ণ করে, তাহাও ব্যোম অবলম্বনেই প্রকাশ হয়। সেইরূপ স্বপ্নযোগে অথবা জাগ্রত অবস্থায় কাহারও মূর্ত্তি বা ছায়া যখন সন্দর্শন করা যায় তাহা যে ব্যোম অবলম্বনে হয় না একথা বলিতে পারি না। এক সময়ে আমি চিন্তাপ্রক্ষেপের (transference of thought) কার্য্য প্রত্যক্ষ দেখিতে উৎসুক হইয়াছিলাম। এই অবস্থায় আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে আমি এক আত্মীয়াকে কতকগুলি কথা বলিলাম ও তিনি তদুত্তরে আমাকে কতকগুলি কথা বলিলেন। নিদ্রাভঙ্গেই আমি সমস্ত কথোপকথন তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া রাখিলাম। পরদিন প্রভাতে আত্মীয়া আমার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই বলিলেন যে তিনিও ঠিক অনুরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। এরূপ ঘটনার পরিচয় এই একটী ছাড়া আরও অনেক প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ ঘটনা একটী হইলেও তাহা উড়াইয়া দিবার যোগ্য নহে—তাহার মধ্যে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। আমার চিন্তা যে ব্যোম অবলম্বনে অপরের মস্তিষ্কে আঘাত করিয়াছিল, এবং অপরের চিন্তা যে আমার মস্তিষ্কে প্রতি-আঘাত করিয়াছিল, একমাত্র এই তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ব অবলম্বনে এরূপ ঘটনা বুঝান সহজসাধ্য নহে। ইহা হইল চিন্তাপ্রক্ষেপের কথা। দ্বিতীয়ত, মূর্ত্তি বা ছায়া স্বপ্নযোগে বা জাগ্রদবস্থায় সন্দর্শন নিশ্চয়ই ব্যোম অবলম্বন ব্যতীত সম্ভব নহে। ইহাকে মানসিক ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। তাহা হইলে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, সকলই ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। লেখকের পিতামহী যখন কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন, শুনিয়াছি যে পিতামহ তখন সুদূর পশ্চিমে ছিলেন এবং সেই সুদূর অঞ্চলে তিনি পিতামহীর মৃত্যুকালে নিজ বাসগৃহের দ্বারে তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া কলিকাতা হইতে সংবাদবাহী লোক পৌছিবার বহু পূর্ব্বেই প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়াছিলেন। প্রবীণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে তাঁহার এক বন্ধুর প্রবাসস্থলে স্বীয় পত্নীর ছায়া সন্দর্শনের কথা শুনিয়াছি। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়েরও মুখে মৃতব্যক্তির ছায়াসন্দর্শনের কথা শুনিয়াছি। যখন সেই ছায়াগুলি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তখন বলিতে বাধ্য যে তাহাদের রশ্মিজাল ব্যোম অবলম্বনেই নেত্রপথে পতিত হইয়াছিল। আমাদের ধারণা যে মৃত্যুকালে মৃতব্যক্তিদিগের যাঁহাদিগকে দর্শন করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ও সুতরাং সংহত হইয়াছিল,

ইহাঁদিগের মানসিক চিন্তা শারীরিক পরমাণুর আকার গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যোম অবলম্বনে তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। ব্যোম অবলম্বনে চিন্তাস্রোতের যাতায়াত ব্যতীত এই সকল সমস্যা নিরাকরণের অন্য কোন উপায় দেখি না।

মানসিক চিন্তা অনেকস্থলেই যখন স্থূল পরমাণু (শরীর) ছাড়িয়া পরমাণুর আকার গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তখন সংহততর আত্মশক্তির প্রকাশের জন্য সেই আকারেরও প্রয়োজন হয় না, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। যখন আমরা ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, সংগ্রামে জীবনসমর্পণে উদ্যত হই, তখনতো স্পষ্টই প্রত্যক্ষ বুঝা যায় যে মনপ্রাণ সংহত হইয়া, বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জ্বলন্ত আত্মশক্তিকে কিরূপ পরিবর্দ্ধিত করে। আত্মশক্তি জীবনীশক্তির সংহততম অবস্থা। যে নিয়মে রুদ্ধস্রোত অবসর পাইলে দেশনগরগ্রাম ভাসাইয়া দেয়, সেই নিয়মে প্রাণশক্তির যে অবস্থা যত রুদ্ধ ও সংহত, সেই অবস্থা অবসর পাইলে তত আলোড়ন উপস্থিত করিয়া অসংখ্য অসংখ্য লোকের নানা শক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া সেই মূলশক্তির বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যায়।

জড়শক্তির অভিব্যক্তিতে আত্মশক্তির উৎপত্তির প্রত্যক্ষ নিদর্শন কোথায়? আমরা কি আত্মশক্তি প্রস্তুত করিতে পারি? আমরা পারি না, প্রকৃতি পারেন। আর আমরা কি-ই বা পারি? আমরা আত্মশক্তি নির্ম্মাণে অসমর্থ, জড়শক্তি নির্ম্মাণেই কি আমরা সমর্থ? আমরা জীবদেহ নির্ম্মাণেও যেমন অসমর্থ, জড়দেহনির্ম্মাণেও তেমনি অসমর্থ। আমরা যখন উদজান পোড়াইয়া জল তৈয়ার করি, আর গন্ধক পোড়াইয়া গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করি, সেই নির্ম্মাণই কি আমাদের কাজ? আমাদের যা কিছু কর্তৃত্ব যোজনা কার্য্যে। পাঁচটা উপকরণকে আমরা এরূপে যোটাইয়া দিয়া থাকি, যাহাতে উহারা আপন আপন ধর্ম্মবশে নূতন নূতন জিনিষের উৎপত্তি করে। জীবদেহ নির্ম্মাণের উপযুক্ত উপকরণ সমূহের সর্ব্বাঙ্গীন যোজনায় আমরা এখনও অসমর্থ ও অজ্ঞ, সুতরাং আমাদের জীবদেহ-নির্ম্মাণচেষ্টা অদ্যাপি সফল হয় নাই। কিন্তু প্রকৃতিতে এই নির্ম্মাণকার্য্য সর্ব্বদাই চলিতেছে। সেইরূপ যে বেগ প্রয়োগ করিলে জড়শক্তির আবির্ভাব হইতে পারে, অথবা যতটা সংহতি আত্মশক্তির অভিব্যক্তিতে আবশ্যক, তদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অসমর্থ। কিন্তু প্রকৃতিতে একশক্তি হইতে শক্ত্যন্তরের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলিতেছে।

এই উদজান ও অম্লজান অবস্থা বিশেষে জল হয়, অপর অবস্থায় আলোকে পরিণত হয়। জল প্রস্তুত করিতে গেলেই উভয়ের মধ্যস্থিত ব্যোমে উপযুক্ত আলোড়ন উপস্থিত করিয়া তাহাদের সংহতির উপায়বিধান করিতে হইবে। এখন, যদি আমাদের অজ্ঞতা বশত বা অন্য কোন কারণে উক্ত দুই বায়ুকে আমরা জলে পরিণত করিতে না পারি, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিব যে আমাদের সংযোজনায় কোন দোষ আছে, কিন্তু একথা বলিব না যে উভয়ের মিশ্রণোৎপন্ন আলোকের উপাদান এবং জলের উপাদান সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আলোক ও জলের মধ্যে একটা রহস্যময় দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অস্তিত্ব কল্পনা করিব না, কারণ আমরা উভয়ের উপকরণগুলি জানি। সেইরূপ যখন জানিতেছি যে জীবাদি প্রভৃতি অঙ্গার, জল ইত্যাদি উপাদানে গঠিত, তখন আমরা সেই সকল উপাদান হইতে জীবাদি প্রস্তুত করিতে পারি না বলিয়া উপাদান ও ফলের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য রহস্য-প্রাচীরের অস্তিত্ব কল্পনা করিবার অধিকার রাখি না। সম্ভবত আমরা উপাদানের সকল গুলি জানিতে পারি নাই অথবা জীবাদি উৎপাদনে যে সংহতি প্রয়োজন তাহা দিতে পারি না। মালাইয়ের বরফ প্রস্তুত করিতে গেলে জানা চাই যে ঠিক কতটা নাড়িলে মালাই জমিয়া যাইবে। সেই সীমার কমবেশী বেগ প্রয়োগ করিলে বরফ "ছিঁড়িয়া" যায়; এবং তাহার পর আর কিছুতেই ভাল জমাট বাঁধে না। ডিম যদি একটু বেশী বা কম গরম করা হয়, তাহা হইলে সেই ডিম হইতে শাবকনির্গমনের সম্ভাবনা একেবারেই তিরোহিত হইয়া যায়। ছানা বাহির না হইলে এইমাত্র বুঝা গেল যে উপযুক্ত উত্তাপের অভাব ঘটিয়াছিল, তাই বলিয়া ডিম ও শাবকের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য ব্যবধান স্বীকার করা যাইতে পারে না। ডিম হইতে যন্ত্রসাহায্যে উত্তাপ দিয়া যে ছানা বাহির করা যাইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে কল্পনায়ও আসিতে পারে নাই, কিন্তু এখন তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। সেইরূপ আশা করা যায় যে জীবাদি-নির্ম্মাণ অথবা আত্মশক্তির উৎপাদন কালে সম্ভব হইলেও হইতে পারে।

প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎপ্রতিষ্ঠিতং।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি নঃ॥ প্রশ্নোপনিষৎ।

ত্রিজগতে যাহা কিছু পদার্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, সমুদয়ই প্রাণের বশে রহি-

য়াছে। হে প্রাণস্বরূপ! মাতার ন্যায় পুত্রদিগকে রক্ষা কর এবং আমাদিগকে শ্রী ও প্রজ্ঞা বিধান কর।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায়
জড় ও আত্মা মূলক চতুর্দশ কথা সমাপ্ত।

পঞ্চদশ কথা—অভিব্যক্তিবাদ ও মৃত্যু।

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে জড়, প্রাণ, মন ও আত্মা, এ সকলই একই শক্তির সংহতির পরিমাণ বা মাত্রানুসারে বিভিন্ন নাম। আস্তিক্যাভিমানী অনেকেই এই বিষয়ের ভালরূপ আলোচনা না করিয়াই হয়তো ইহার ফলে নাস্তিকতা প্রচারের বিশেষ আশঙ্কা করিবেন। আমাদিগের মতে যদিও সংহতিমূলক অভিব্যক্তিবাদে নাস্তিকতাসমর্থনের বিশেষ আশঙ্কা নাই, কিন্তু সত্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া নাস্তিকতালাভও সহ্য হয়, সত্যানুসন্ধানে পরাংমুখ হইয়া আস্তিক্যাভিমানে জীবন্মৃত থাকা অসহ্য। প্রকৃত অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বন করিলে দ্বৈতাদ্বৈত, বিজ্ঞানদর্শন প্রভৃতির মতদ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া এক মহা সামঞ্জস্যধারা রচিত হইবে। বিজ্ঞান বলিতেছে, সম্ভবত প্রকৃতিতে একটীমাত্র মৌলিক প্রাকৃতিক শক্তি বিভিন্ন আকারে কার্য্য করিতেছে, দর্শন তাহা পূর্ণ করিয়া বলিতেছে যে এক স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণশক্তি পরম পুরুষের ইচ্ছাতেই সেই মৌলিক শক্তির উৎপত্তি এবং তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত সেই শক্তি কার্য্যক্ষেত্রে নামে নাই, নামিতে পারে না। সংহততম শক্তিময় পূর্ণপুরুষের অস্তিত্ব না থাকিলে জগতের সেই মৌলিক শক্তিরই যে অভাব ঘটিত তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সেই পূর্ণশক্তি পুরুষ যে পূর্ণজ্ঞান ও সত্যসংকল্প তাহাও স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

পূর্ব্বোক্ত অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বন করিলে সংসার ও যোগের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। সংসারের মূল চিত্তবৃত্তিপ্রসার, যোগের মূল চিত্তবৃত্তিনিরোধ। এখানে আত্মা ও চিত্তের মধ্যে সম্ভবত কোন প্রভেদ নাই বলিয়া ধরা যাইতেছে। কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে সংহতিমাত্রার উপরেই এই সকল নামকরণ নির্ভর করে। চুরি করা অথবা পার্থিব বিষয় সমূহে মনোনিবেশ মনের কার্য্য বলিয়া ধরা হয়, লোভসম্বরণ অথবা ধর্ম্মবিষয়ে মনোনিবেশ আত্মার কার্য্য বলিয়া কথিত হয়—এরূপ প্রভেদের মূলে সংহতিমাত্রার অতিরিক্ত কতটা যে সত্য আছে বলা কঠিন। যোগের পথপ্রদর্শক মহাযোগী পতঞ্জলি মুনিও অধ্যাত্মযোগের কথা বলিতে গিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চিত্তবৃত্তিরই নিরোধের বিষয় উল্লেখ করিয়া-

ছেন। যাই হোক, এখন অভিব্যক্তিবাদে সংসার ও যোগের সামঞ্জস্য কিরূপে সাধিত হয়, তাহাই দেখা যাউক।

বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছে যে যাবতীয় জড়শক্তি একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। আমি পেশীবলের সাহায্যে একটী চাকায় গতিপ্রয়োগ করিলাম, সেই গতির কতক অংশের প্রতিক্রিয়ায় সেই চাকা ঘুরিতে লাগিল; আবার তাহারই কতক অংশের সাহায্যে হয়তো তাড়িত উৎপাদিত হইল, কতক অংশ বা চাকার উত্তাপ উৎপাদন করিল; আবার সেই মূল পেশীবলের কতক অংশ হয়তো আমার শরীরের উত্তাপ জন্মাইয়া দিল। ইহার মধ্যে সারকথাটুকু এই যে আমার প্রযুক্ত সেই মূল শক্তির একটুকুও বিনাশ হইল না। সেইরূপ আত্মশক্তি বা চিত্তবৃত্তিকে যদি নিরুদ্ধ না করিয়া সংসারক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় কিম্বা যদি নিরুদ্ধই করা হয়, কোন অবস্থাতেই একবিন্দু শক্তিরও বিনাশ সাধন হইবে না—কেবল কার্য্যের তারতম্য ঘটিবে। তুমি ইচ্ছা করিলে নিম্নপ্রাণীদিগের সহিত সাধারণ্যে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন কার্য্যে রত থাকিয়া ক্রমেই আত্মশক্তিকে অসংহত করিয়া জড়শক্তির অভিমুখীন করিতে পার, প্রকৃত অভিব্যক্তির অন্তরায় আনয়ন করিতে পার—তখন তোমার কার্য্যের সহিত একটা কুকুরের কার্য্যের কোনই প্রভেদ থাকিবে না। আবার তুমি ইচ্ছা করিলে চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিয়া অভিব্যক্তিফলে বুদ্ধচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের ন্যায় জগতের অশেষ মঙ্গলসাধন পূর্ব্বক দেবগণের সহিত একাসনে সমাসীন হইতে পার। তুমি যদি পশুপক্ষীদিগের ন্যায় নিজের সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত থাক, তাহা হইলে তোমাকে তাহাদিগের ন্যায় সুখদুঃখ, ভয়ক্লেশ প্রভৃতিও ভোগ করিতে হইবে। আর যদি তুমি চিত্তবৃত্তিনিরোধের ফলে আত্মশক্তি বর্দ্ধিত কর, তাহা হইলে সহজেই ক্ষুধাতৃষ্ণা, ভয়ক্লেশ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহের হস্ত অতিক্রম করিয়া ন্যায় সত্য প্রভৃতির সূক্ষ্মতত্ত্বসকল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। ন্যায়, সত্য প্রভৃতিই প্রকৃতির সহজাবস্থা, এই কারণে ইহারা যোগের ও সংসারের সহায় এবং অসত্য, অন্যায় প্রভৃতি প্রকৃতির অপ্রকৃত অবস্থা বা বিকৃতি, এই কারণে তাহারা যোগের ও সংসারের উন্নতির অন্তরায়।

ন্যায়, সত্য প্রভৃতির ন্যায় বীর্য্যধারণই হইল জীবের প্রকৃত সহজাবস্থা এবং এই কারণে বীর্য্য ধারণে প্রকৃত সক্ষমতা যোগের ও সংসারের একটী প্রধান

সহায়, সন্তানোৎপাদনের জন্য বীর্য্যনিষেকে যে শক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহার কতকাংশ শরীরের উত্তাপোৎপাদনে ব্যয়িত হইয়া যায় এবং অধিকাংশ সন্তানোৎপাদনে প্রযুক্ত হয়—কাজেই সেই শক্তি আংশিক অসংহত হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন, বীর্য্যেই জীবের অভিব্যক্ত প্রাণশক্তি যথাযথ পরিমাণে বহুবৎসারাবধি সংহত ও পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে। অযথা বীর্য্যক্ষয় করিলে যে সেই সংহত শক্তি বিক্ষিপ্ত বা অসংসত হইয়া মানুষকে পশুবৎ বা পশুসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট করিয়া তুলে তাহা বলা বাহুল্য। অভিব্যক্তিবাদ বলে, যোগের সহায়তার নিমিত্ত বীর্য্যধারণ যেমন আবশ্যক, সংসারের জীবনসংগ্রামে সহায়তার জন্যও বীর্য্যনিহিত শক্তিধারণ ও সুতরাং সংহতিসাধন সেইরূপ আবশ্যক—বীর্য্যক্ষয়ে নষ্টবীর্য্য সন্তানসমূহ উৎপন্ন হইয়া জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইয়া পদে পদে দুঃখশোক বিস্তার করিবে। ঋতুরক্ষা পূর্ব্বক মাত্র সন্তানোৎপাদনে বীর্য্যক্ষয় করিবার পর অন্তত দুইবৎসর বীর্য্যধারণ শাস্ত্রের উপদেশ—এই দুই বৎসরে সেই নষ্টবীর্য্য কতক পরিমাণে ফিরিয়া পাওয়া যায়—বীর্য্য সংহত করিবার কতকটা অবসর পাওয়া যায়। এই উপদেশ অবলম্বন করিলে দেশের দুঃখদারিদ্র্য ও পরাধীনতা প্রভৃতি সমুদয় পাপ দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা। মাত্র সন্তানোৎপাদনেও বীর্য্যক্ষয় হইলে আত্মশক্তিবৃদ্ধির বিশেষ অনিষ্ট হয়। ঊর্দ্ধরেতা বিশ্বামিত্র এই তথ্যের জীবন্ত প্রমাণ অনুভব করিয়া নিজ কন্যা শকুন্তলার মুখদর্শনেও বিমুখ হইয়াছিলেন। আত্মার ক্রমশ অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে আমরা বলের সহিত বলিতে পারি যে বীর্য্যধারণের যথার্থ সক্ষমতা থাকিলে বিবাহ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিবাহ না করিলে চলে না, মানবসমাজে এইরূপ এমনি একটা সংস্কার পড়িয়া গিয়াছে যে অধিকাংশ স্থলেই বিবাহ আবশ্যক, নচেৎ উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব আসিয়া বীর্য্যক্ষয়ের প্রধান সহায় হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। অন্যায় বীর্য্যক্ষয় আত্মহত্যার অতিরিক্ত কিছুই নহে।

পৃথিবীর যাবতীয় জাতির মধ্যে পরকাল সম্বন্ধীয় উন্নত বা অনুন্নত বিশ্বাসের অস্তিত্ব শ্রুত হওয়া যায়। অভিব্যক্তিবাদে পরকাল স্বীকৃত হয় কি না? যে আত্মা জড় হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, মৃত্যুর পরে সেই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় কিনা? শক্তিসমষ্টির যখন বিনাশ নাই, তখন তাহা সংহত বা অসংহত, যে আকারেই থাকুক, মৃত্যুর পূর্ব্বে বা পরে কোন অবস্থাতেই যে বিনষ্ট হইবে

একথা বলিতে পারি না। অভিব্যক্তিবাদে উপরোক্ত প্রশ্নের অর্থ এই যে মৃত্যুর পরে আত্মশক্তির সংহত অবস্থা থাকে কি না? আত্মশক্তির অসংহত অবস্থা ঘটিলেই তাহা জড়শক্তিতে পরিণত হইল। মৃত্যুর পরে আত্মশক্তি জড়শক্তিতে পরিণতির অভিমুখীন হয় কি না? অভিব্যক্তিবাদের মতে যখন জড়শক্তিরই সংহতি হইতে হইতে আত্মশক্তির আবির্ভাব ঘটিল, তখন তাহার জড়শক্তিতে প্রতিগমন ততদূর সম্ভবপর নহে—তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে বলিতে হইবে যে প্রকৃতি নিজকৃত কার্য্যকে অকৃত করিবার জন্য অনেক সময় ও পরিশ্রম বৃথা নষ্ট করেন। বৃথা পরিশ্রম প্রকৃতির কার্য্যক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, এমন কোন কথা নাই যে আত্মা জড় হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই মৃত্যুর পরে পুনরায় জড়ে পরিণত হইবে, নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জড়শক্তির ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। আমরা জড়শক্তিবিষয়ক আলোচনায় দেখিতে পাই যে, উত্তাপের রূপান্তরে তাড়িতের অভিব্যক্তি হয়, কিন্তু যখন তাড়িত অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহার কার্য্যপরম্পরা উত্তাপের কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালী অনুসরণ করে। সেইরূপ জড়শক্তি যতক্ষণ জড়শক্তি, ততক্ষণ তাহার কার্য্য-প্রণালী একরেখা অনুসরণ করিয়া চলিবে; কিন্তু যখন সেই জড়শক্তি অভিব্যক্ত হইয়া আত্মশক্তিতে পরিণত হইল, তখন তাহার কার্য্য বিভিন্ন প্রণালী অনুসরণ করিবে। জড়শক্তির প্রধান লক্ষণ আকর্ষণ, আত্মশক্তির প্রধান লক্ষণ চৈতন্য ও ইচ্ছা। আত্মার মূর্ত্তি যখন বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখনি চৈতন্য, চৈতন্যমূল স্মৃতিশক্তি, আত্মপ্রত্যয়, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার ধর্ম্মসমূহও বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। চৈতন্য ও স্মৃতিশক্তি অবলম্বনে আত্মার ইহলোকে স্থায়িত্ব ও একত্ব স্থিরীকৃত হয়। দশবৎসর পূর্ব্বের আমি এবং দশবৎসর পরের আমি যে একই, তাহা স্মৃতিমূলক চৈতন্য অবলম্বনে বুঝা যায়। ইহার পর আত্মপ্রত্যয়. তো বলিয়াই দেয় যে আত্মা অনশ্বর অর্থাৎ চৈতন্য, ইচ্ছা প্রভৃতি ধর্ম্মোপেত আত্মার সংহতভাব কি ইহকালে, কি পরকালে কখনই বিলুপ্ত হয় না। বিশেষ, আত্মার জীবনে উন্নতিরই নিয়ম বিশেষত দেখিতে পাই। শরীর ব্যবচ্ছিন্ন হইলেও আত্মার কার্য্য বলবৎ চলিতেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দেহ রুগ্ন শীর্ণ হইলেও বর্দ্ধিত আত্মশক্তি সমানভাবে কার্য্য করিতেছে, এরূপ অনেক উদা-হরণ দেখা গিয়াছে। এলোকে দেখি যে আত্মা ক্রমাগত শিক্ষালাভ করিতেছে ও

তাহার ফলে সংহতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই জ্ঞানলাভ একক্ষণে হইল, আর পরক্ষণে চলিয়া গেল তাহা নহে—সেই জ্ঞানকণাগুলি অধিকতর জ্ঞানলাভের সহায়স্বরূপে আত্মাতে সঞ্চিত থাকে। যখন উন্নতির দ্বার এরূপ মুক্তভাবে উন্মুক্ত রহিয়াছে, তখন মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশ অপেক্ষা সংহত ও উন্নত জীবন থাকাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। জড়শক্তির উন্নতি হইতে হইতে যখন আত্মার অভিব্যক্তি হইল, তখন সেই উন্নতি মানব পর্য্যন্ত হইয়াই সহসা যে রুদ্ধ হইয়া যাইবে এরূপ কল্পনা অযৌক্তিক।

তৃতীয়ত, শরীরের অভাবে আত্মার কার্য্যকারিতা থাকে কি না? আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে আত্মশক্তি যতই সংহত হইতে থাকিবে, ততই তাহার কার্য্যকারিতার জন্য নশ্বর শরীরের প্রয়োজনবোধ যে থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। স্ত্রীতাড়িত (negative) ও পুংতাড়িত (positive) মিলিত হইলে তাড়িতস্রোত চলে বটে, কিন্তু প্রত্যেক তাড়িতভেদেরই আবার পৃথক পৃথক কার্য্যকারিতা দেখা যায় এবং উভয়েই আপনার উপযুক্ত সহযোগী পাইলেই মিলিত হয়। সেইরূপ দেহ ও আত্মা মিলিত হইলেই সংসারস্রোত চলিতে থাকে। কোন কারণে এই দেহ হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাদের উভয়েরই কার্য্য-কারিতা যে চলিয়া যায় তাহা নহে। উভয়েই আপনার আপনার উপযুক্ত সহযোগী পাইলেই মিলিত হয়, আত্মা উন্নত দেহ যথাসময়ে অবলম্বন করে এবং মৃতদেহ অন্যান্য প্রাণীগণের শরীরে ভক্ষ্যরূপে ও অন্যান্য নানারূপে প্রবেশ করিয়া আত্মশক্তির অভিব্যক্তিতে সহায় হয়। আমাদের বিশ্বাস যে কোন মান-বেরই আত্মা এতদূর সংহত হয় না যে এদেহের পরেই আর তাহার দেহান্তর পরিগ্রহ আবশ্যক হয় না। যেমন এই বালি, এই লৌহ, এই চুন প্রভৃতি নানা উপকরণ সকল মিলিত হইয়া কেমন মোলায়েম এই মানবদেহ রচনা করিয়াছে, সেইরূপ এই দেহের পর আত্মাও সূক্ষ্মতর ও উন্নততর দেহপরিগ্রহ পূর্ব্বক তদবলম্বনে সংহতির পথে অধিকতর অগ্রসর হইতে থাকে।

আমরা মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বের কথা বলিয়া আসিলাম। মৃত্যু জিনি-ষটাই বা কি? আমরা অভিব্যক্তিবাদ আলোচনার প্রারম্ভে বলিয়া আসিয়াছি যে "মৃত্যু যে সে অমৃতসোপান," আলোচনার অন্তভাগেও তাহাই পুনরুক্ত করিতেছি—"মৃত্যু যে সে অমৃতসোপান"। আত্মা দুই কারণে এদেহ পরিত্যাগ

করিতে বাধ্য হয়—এক, পাপের ফলে আত্মা যখন অসংহতির বড়ই অভিমুখীন হয়, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মে সেই আত্মা ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া পরলোকে নূতন জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পাপ হইতে অনেকটা বিশ্রামলাভ করে ও সেই অবসরে সংহতির অভিমুখে পুনরায় অগ্রসর হইতে থাকে। দ্বিতীয়ত, পুণ্যের ফলে যখন আত্মা এখানেই থাকিয়া এতটা সংহত ভাব অর্জ্জন করে যে এই শরীর সেই সংহত ও বর্দ্ধিত আত্মশক্তিকে আর ধারণ করিতে পারে না, তখন পুণ্যাত্মা নিজের উপযোগী দেহান্তর পরিগ্রহণে বাধ্য হয়। এই কারণে অবনতিতে এত কষ্ট ও দুঃখ, উন্নতিতে এত হর্ষ ও সুখ; পাপীদিগের দেহান্তর প্রাপ্তিতে এত যাতনা, পুণ্যবানদিগের দেহান্তর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় এত সাগ্রহ আনন্দ। অভিব্যক্তিবাদ আলোচনা করিয়া আমাদের এই ধারণা দাঁড়াইয়াছে যে ঈশ্বরের ইচ্ছাই যেন এই যে, জড় শক্তি ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিতে করিতে আত্মাকৃতি প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু আত্মশক্তি পুনরায় জড়শক্তিতে পরিণত হইবে না।

মৃত্যু তিন প্রণালীতে সংসাধিত হয়—স্বাভাবিক, পর কর্ত্তৃক হত্যা, এবং আত্মহত্যা। বলা বাহুল্য যে স্বাভাবিক পরমায়ুর অবসানে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল অথবা সংহতিসাধনের সর্ব্বাপেক্ষা সহায়—পরলোকে পূর্ব্বসংহতি পুনর্লাভের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না। অপর কর্ত্তৃক নিহত হইলে, উপযুক্ত সংহতির ব্যাঘাত সাধন করিল বলিয়া হন্তারই পাপ—হন্তারই তাহাতে প্রধান অসংহতি ঘটে—কিন্তু হতব্যক্তি অন্য কোন কারণের অভাবে, পরলোকে পূর্ব্বার্জ্জিত সংহতির পর অবধি সংহতি অর্জ্জন করিতে থাকিবে। আত্মহত্যা সর্ব্বাপেক্ষা পাপজনক। আত্মহত্যায় কেন যে পাপ হয়, কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাহার মীমাংসা প্রাপ্ত হই নাই। অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বনে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছি। তুমি স্বদেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিলে, তোমার স্থান স্বর্গে নির্দ্দিষ্ট হইল, স্বদেশপ্রেমিক তোমার জীবন ধন্য হইল। সত্যপ্রতিষ্ঠাই হউক বা মিথ্যাপ্রতিষ্ঠাই হউক, বিশ্বাসের বলে বা অন্ধ ভক্তির বলে, ধর্ম্মের নামে জীবন বলিদান করিলে সে জীবন পুণ্য বলিয়া প্রখ্যাত হইল; সতীদাহ ধন্য হইল। কিন্তু সংসারের যাতনা, অনাহারের তাড়না, রোগশোকের কঠোর পেষণ অসহ্য বোধ করিয়া যদি কেহ বিষপানে বা উদ্বন্ধনে বা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করে, সংসারের লোকে তাহাকে

কাপুরুষ, পাপী বলিয়া ধিক্কার প্রদান করিবে এবং ঊর্দ্ধদৈহিক সংকার হইবে না বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিবে। এই শোভনসুন্দর জগত সংসার যাহাকে জীবিত থাকিবার প্রলোভন দেখাইতে পারিল না, প্রাণপ্রিয় পরিজন সকল যাহার নিকট বিষবোধ হইল, যে সুখদুঃখ ভয়ভক্তি সমুদয় তুচ্ছ করিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইতে পারিল, ভ্রান্ত মানব ঊর্দ্ধদৈহিক শ্রাদ্ধশান্তি হইবে না বলিয়া তাহাকে ভয়প্রদর্শনে আত্মহত্যা হইতে নিরস্ত করিতে সক্ষম হইবে? যে আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইবে, সে পরলোক হইতে তোমার প্রদত্ত পিণ্ড আহার করিতে অথবা তোমার বাঁধানো মুখস্থ প্রার্থনার ছুটো কথা শুনিতে নিশ্চয়ই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবে না। চোরকে চোর বলিব বলিয়া ভয়প্রদর্শনে চৌর্য্য হইতে নিরস্ত করা যায় না। প্রত্যুত চোরকে যদি চোর না বলিয়া একদিকে চৌর্য্যবৃত্তির দোষ দেখাইয়া দেওয়া যায়, অপরদিকে তাহার সদ্বৃত্তি সকল উত্তেজিত অথবা আত্মার সংহতি বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে বিশেষ ফল দর্শে। সমাজের বর্ত্তমান গঠনানুসারে ভয়প্রদর্শন যদিও কতকটা আবশ্যক, কিন্তু তথাপি ইহা বলিতে বাধ্য যে তাহা আমাদিগের অসভ্যাবস্থার বা পশুভাবের পরিচায়ক একটি পোড়ো অংশ মাত্র।

অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বনে আত্মহত্যা কেবল যে পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা নহে, কিন্তু কেন যে হয়, তাহাও বুঝিতে পারি। আমাদিগের মতে আত্মহত্যাকে পাপ বলিবার কারণ এই যে তাহাতে আত্মার উন্নতি বা সংহতি সাধনে বিলম্ব পড়িয়া যায়। আত্মহত্যা দুই কারণে হয়—এক, রোগ প্রভৃতিজনিত নিজকৃত যন্ত্রণা যখন অসহ্য বোধ হয় এবং দ্বিতীয়, অপরের তিরস্কার প্রভৃতি কার্য্যজনিত যন্ত্রণা যখন মর্ম্ম ছিঁড়িয়া ফেলে। উভয়েতেই সেই মৃতব্যক্তির আত্মোন্নতির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। পরলোকে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আত্মশক্তির পুনঃসংহতি সাধনে যে সময় নষ্ট হয়, তাহা সত্য সত্যই একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়—সে সময়ক্ষেপণে অন্য নানাবিধ অজ্ঞাত উপকার হইতে পারে, কিন্তু সংহতিসাধনে তাহা নিতান্তই নিষ্ফল প্রতীত হয়। হিন্দুদিগের গর্ভযন্ত্রণাকে এত ঘৃণ্য ও ভয়জনকরূপে বর্ণনা করিবার ইহাই মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়। রোগাদি নিজকৃত যন্ত্রণার জন্য আত্মহত্যা সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণ্য। রোগাদির উৎপত্তিই আত্মশক্তির অসংহতিসাধন হইতে এবং তাহারা নিজেও ক্রমাগত অসংহতি

সাধন করিতে থাকে। এই অবস্থায় আত্মহত্যা করিলে পরলোকে যে সংহতি পুনরর্জ্জন করিতে অধিকতর কালবিলম্ব হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। পরকৃত কার্য্যজনিত যন্ত্রণায় আত্মহত্যা অপেক্ষাকৃত লঘুতর পাপ। এই অবস্থায় সচরাচর হত্যাকারী ব্যক্তি সহসা কর্ম্ম করিয়া ফেলে—পূর্ব্বার্জ্জিত সংহতি বিশেষ বিনষ্ট হইবার অবকাশ পায় না। আত্মার সংহতির অভাবেই এই আত্মহত্যা পাপের আবির্ভাব—তাহার দৃষ্টান্ত, ফ্রান্স প্রভৃতি যে দেশে ব্যভিচার প্রভৃতি সংহতি-নাশক উপায়ের যত আবির্ভাব, সেই দেশে আত্মহত্যারও সংখ্যা তত অধিক। আত্মহত্যা নিবারণের অদ্বিতীয় মহৌষধ আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষাপ্রণালী।

আত্মহত্যা যে পাপ, তাহা আমাদিগের ব্যাখ্যাত সংহতিপ্রাণ অভিব্যক্তিবাদের সাহায্যে যেরূপ বুঝান যাইতে পারে, অন্য কোন মতবাদ অবলম্বনে সেরূপ সুসার ভাবে বুঝান যাইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না, অন্তত আমরা তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছি। আত্মহত্যাতে কেবল পাপ নহে, তাহাতে কাপুরুষতাও প্রকাশ পায়। জীবনসংগ্রামে সংগ্রাম করাই পুরুষোচিত কর্ম্ম, আত্মহত্যারূপ পলায়ন ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন পুরুষের কর্ম্ম নহে, কাপুরুষের কর্ম্ম। আবার পরলোকে যখন জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হইবে, তখন সেখানেও কি আত্মহত্যা করিবে, রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে? কত জন্ম ধরিয়া এইরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শন করিবে? এই কাপুরুষোচিত কর্ম্ম হইতে আমরা কাহাকেও ভয় বা লোভপ্রদর্শনে নিরস্ত হইতে বলিতেছি না। আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছি যে ইহাতে সংহতি-সাধনে অন্তরায় ঘটে এবং সুতরাং নিজের মুক্তিপথে বিলম্ব ঘটে বলিয়াই ইহা পাপ কথিত হয়। অনেকেই বলিবেন যে কোন্ জন্মে কি ক্ষতি হইবে বলিয়া কি আত্মহত্যা নিবারিত হইতে পারে? আমরা বলি, ঈশ্বর জগতে যে সুখ-রাশি নিত্য বিতরণ করিতেছেন, তাহাই আত্মহত্যা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট, তাহার উপর আমরা ক্ষতি দেখাইয়া দিলেও যদি আত্মহত্যায় উদ্যত ব্যক্তি তাহা হইতে নিবারিত না হয়, তবে নাচার—কোন ঔষধই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না। এই সকল ক্ষতিবৃদ্ধি বুঝিবার পরও যদি কেহ ভীরু, কাপুরুষ, অবিবেচক, নিজের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, তবে সে আত্মহত্যা অবলম্বন করুক। যুদ্ধকালে যদি দেখা যায় কাহারও পৃষ্ঠপ্রদর্শনের নিতান্তই সম্ভাবনা, তবে অধি-

কাংশস্থলে তাহাকে সর্বসমক্ষে বধ করা হয়। এই আত্মহত্যাও সেইরূপ প্রকৃতির বধদণ্ডরূপে কার্য্য করে—প্রকৃতি এরূপ অধম কাপুরুষদিগকে জীবনসংগ্রামের ভীষণক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতে চাহেন। ভ্রান্ত মানব! একথা একবার মনেও স্থান দিওনা যে তুমি আত্মহত্যা করিলে বলিয়া জগত তোমার জন্য এক মুহূর্ত্তকালও থমকিয়া দাঁড়াইবে। ঈশ্বরের মঙ্গলচক্র এরূপ নিয়মে সংগঠিত যে যিনি যতই অমঙ্গলের বীজ রোপণ করুন, সকলই চরমফলে সেই মঙ্গল চক্রের গতি অনুসরণ করিবেই। আমাদিগের ক্ষুদ্র কণ্ঠের বক্তব্য এই যে জীবনসংগ্রামে কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিও না; বীরপদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া, পৃথিবীকে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যাও; জীবনসংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক এমন কর্ম্ম সকল সম্পন্ন কর যে যতদিন আছে শশী, যতদিন আছে রবি, ততদিন তোমার সেই সকল কার্য্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে হাসিতে, গল্পে, সঙ্গীতে দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে, পাণ্ডবদিগের বিজয়বার্ত্তার ন্যায় শ্রাদ্ধশান্তিকর্ম্মে নিত্য পঠিত হইবে।

অসংহতি ঘটাইবার কারণেই আত্মহত্যা যেমন পাপ বলিয়া উক্ত হইল, জীবহত্যাও সেইরূপ পাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আহারাদি প্রয়োজনীয় বা উপকারজনক কার্য্যে জীবহত্যা যে আত্মহত্যা অপেক্ষা লঘুতর পাপ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদিগের মতে অযথা জীবহিংসা আত্মহত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ, ইহাতে নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিহত জীবগণেরও সংহতিসাধনের বিশেষ অন্তরায় আনয়ন করা হয়। টুপিতে পালক বসাইবার জন্য পক্ষীকুলের ধ্বংস যে এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা বলা বাহুল্য। আহারাদির কারণে জীবহিংসায় ভক্ষকের শরীরে বলাধান হইয়া আত্মোন্নতির সহায় হইলেও সেই নিহত জীবগণের উন্নতিসাধনে জীবিত অবস্থা অপেক্ষা কিছু বিলম্ব পড়িয়া যায়। মুসলমানদিগের ন্যায় প্রাণীকে "হালাল" বা জবাই করিয়া অথবা বর্ত্তমান হিন্দুদিগের ন্যায় নামেমাত্র দেবসন্নিধানে বলিদান করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলে যে অসংহতি বা চিত্তবিক্ষেপ আসিয়া পড়ে, তাহা আহারের ফলে বলাধানজনিত সংহতি অপেক্ষা পরিমাণে অনেক অধিক হয় বলিয়া অন্যায় কথিত হয়। এই কারণে শাস্ত্রে বৈধহিংসারই যেটুকু অনুমতি আছে—যেটুকুর অভাবে শরীর রক্ষা অসম্ভব, সেই টুকুমাত্র হিংসা বলিতে গেলে অনুমোদিত। কিন্তু মোটের উপর

"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" আমাদের শাস্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে ঘোষিত হইয়াছে। মাংসাহার যদি নিত্যনিয়মিত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমাদিগের মতে প্রয়োজনমত মাংস দোকান হইতে ক্রয় করা গৃহে জীবহত্যা অপেক্ষা অনেক ভাল।

ফলমূল সকল প্রাণবিশিষ্ট হইলেও তাহা খাইয়া জীবনধারণ ভাল, কারণ তাহাতে ধরিতে গেলে জীবহিংসা হয় না। উদ্ভিদজাত পদার্থ সমূহে প্রাণ সংহত হইবার উপক্রম করিতেছে মাত্র এবং তাহারা উন্নততর জীবগণের ভক্ষ্য হইয়া তাহাদের এবং তৎসঙ্গে নিজেদেরও সংহতিসাধনের সহায়তা করে। উদ্ভিদরাজ্যে আত্মশক্তি, এমন কি মানসিক বৃত্তিসমূহও বিশেষ কোন মূর্ত্তি বা আকার ধারণ করে নাই। এই কারণে জীব যত উন্নত হয়, যে জীবে আত্মশক্তি যত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, সেই জীবের বধসাধনে আমাদের স্বভাবতই তত কষ্ট হয়। জীব যত নিম্নস্তরের হয়, আমাদিগের কষ্টও তত কম হয়। মনুষ্যের আত্মহত্যাতে তাহার আত্মশক্তির সংহতি বা উন্নতির ব্যাঘাত হয় বলিয়াই তাহা পাপ গণ্য হয়, কিন্তু কাঁকড়াবিছা যে নিজ ক্রোধে অন্ধ হইয়া আত্মহত্যা করে, তাহাকে পাপ বলিয়া ধরা যায় না, কারণ তাহার আত্মশক্তি বিশেষ সংহত মূর্ত্তিতে প্রকট হয় নাই। এতদিন মনুষ্যহত্যার শাস্তি বধদণ্ড ছিল—তাহাতে একজনের পরিবর্ত্তে দুইজনের সংহতির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। সুখের বিষয়, আজ কাল বধদণ্ডের বিরুদ্ধেই জনসাধারণের মত দাঁড়াইতেছে। আদিম মনুষ্য যে অসভ্য অবস্থায় মনুষ্যমাংস আহার করিত, তাহাতে তাহাদের পাপবোধ ছিল না এবং হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। তাহারা যেরূপ দৌড়ঝাঁপ করিতে বাধ্য হইত, তাহাদের চিত্ত যেরূপ বিক্ষিপ্ত ছিল—বলিতে গেলে তাহাদের আত্মা সবেমাত্র সংহতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে মাত্র—সেই অবস্থার তুলনায় মনুষ্যাহারে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। বর্ত্তমান কালের উচ্চ নীতির নিক্তিতে সে অবস্থা ওজন করিলে চলিবে না। মানবসমাজ যত সভ্য ও উন্নত হইতে লাগিল, ততই সংহতি ও শান্তির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মনুষ্যাহারের পরিবর্ত্তে অনুন্নত জীবের আহার ও ক্রমশ অহিংসার রাজত্ব বিস্তৃত হইতে লাগিল। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ এই মন্ত্রই ভারতের সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম সোপানে সর্ব্বপ্রথম আরোহণবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। স্বদেশের জন্য প্রাণ দেওয়া বা জীবহত্যা

করা ততটা দোষাবহ বোধ হয় না, কারণ ইহার ফলে অপর পাঁচজনকে সংহতির দিকে অগ্রসর হইতে দৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ উৎসৃষ্ট জীবনের রুধিরধারার উপর জগতের প্রায় অধিকাংশ ধর্ম্মই বিস্তারলাভ করিয়াছে। শক্রর সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদি উপায়ে দেশের শান্তিরক্ষা দ্বারা অপর পাঁচজনের সংহতি সাধনের উপায় বিধান হয় বলিয়া দেশের জন্য জীবন দেওয়া বা লওয়া ঘৃণিত হয় না। বৃথা বীরত্বপ্রদর্শনে অগৌরবই লাভ হয়, তাহাতে চিত্তবিক্ষেপ ও অসংহতিই সার হয়—নেপোলিয়নের মস্কৌ অভিযান, আমেরিকার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রভৃতি তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায় অভিব্যক্তিবাদ ও মৃত্যু মূলক পঞ্চদশ কথা সমাপ্ত।

ষোড়শ কথা—অভিব্যক্তিবাদ ও পাপ।

আমি ইহা পাপ, উহা পাপ বলিয়া আসিলাম। স্বীকার করিলাম যে আত্মশক্তির অসংহতিরই নামান্তর পাপ। কিন্তু সেই পাপ আসে কোথা হইতে? পাপের প্রেরয়িতা কে? তুমিই-বা পাপ কর কেন আর আমিই বা করি না কেন? তোমার আত্মশক্তি অবস্থাবিশেষে অসংহত হইয়া পড়ে কেন আর আমারই বা পড়ে না কেন? সাধারণত বলা হয় যে জন্ম, সঙ্গ ও শিক্ষা-দোষে অজ্ঞান আসে এবং অজ্ঞানের ফলে পাপ আসে। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, জন্ম, সঙ্গ ও শিক্ষাদোষই বা হয় কেন এবং কেনই বা অজ্ঞান আসে? অজ্ঞান কেন আসে—এই "কেন"র উত্তর নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এই উত্তর না পাওয়াতে কত লোকে ঈশ্বরে অভক্তিমান্ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে এবং কতলোকে এই উত্তর পাইবার জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার সুখশান্তি সমুদয় জলাঞ্জলি দিয়াছেন। বলা সহজ বটে, জন্ম, সঙ্গ ও শিক্ষা-দোষে অজ্ঞান আসে। চোরের ঘরে একটী শিশু জন্মগ্রহণ করিল; সাধারণত ধরা যায় যে সেই শিশুর জন্ম ও সঙ্গদোষে এবং সৎশিক্ষার অভাবে উপযুক্ত বয়সে মন্দ পথে চলিয়া জগতের প্রভূত অমঙ্গল আনয়ন করিবে। কিন্তু এমনও দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে চোরের সন্তান সহস্র জন্ম, সঙ্গ ও শিক্ষার দোষ সত্ত্বেও সৎপথ অবলম্বন করিয়াছে। পুরাণোক্ত প্রহ্লাদের দৃষ্টান্তই আপাতত যথেষ্ট হইবে বোধ হয়। এখন, সেই চোরের সন্তান ভালই হউক বা মন্দই হউক, আমার জিজ্ঞাস্য যে তাহা কেন হইল? সে যদি ভাল হয়, তবে প্রশ্ন এই যে তাহার আত্মা সেই চোরের গৃহে ভূমিষ্ঠ হইল কেন? তাহারও তো একটা আত্মা আছে, তবে সে পিতামাতার দোষের জন্য শাস্তি পায় কেন? বুঝিলাম যে পিতামাতা নিজেদের সন্তানকে মন্দপথের পথিক দেখিয়া কষ্ট অনুভব করিবে এবং তাহাতে যেন তাহাদের পাপের শাস্তি হইল, কিন্তু সেই সন্তানও নিজে শাস্তি পায় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে গেলে বিষয়টী দুই দিক দিয়া আলোচনা করিতে

হইবে—পারমার্থিক ও ব্যবহারিক। পারমার্থিক দিক দিয়া ধরিলে দেখা যায় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,' এই সকলই ব্রহ্ম, সুতরাং অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে পাপেরও অস্তিত্ব নাই। পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি একই শক্তির রূপান্তর মাত্র, তাহাকে জড়শক্তিই বল, অথবা অসংহত প্রাণশক্তি বল বা অপর যে কোন নামেই অভিহিত কর, এবং সেই শক্তি পূর্ণশক্তি পরমপুরুষেরই শক্তি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। ধরিতে গেলে, সকল পাপের, সকল পুণ্যের মূল উৎপত্তিও ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন আর কিছু হইতে সম্ভব নহে। আমি পাপ করিলাম—কেন? আমার পিতৃপুরুষের পাপের ফলে—তাঁহারা পাপ করিলেন কেন? তাঁহাদের পিতৃপুরুষদিগের পাপের ফলে। এইরূপে পিছাইয়া যাইতে যাইতে সেই জড়শক্তিতে এবং সুতরাং ব্রহ্মশক্তিতে যাইয়া পড়িতে হয়। আবার যদি আমার নিজের দোষেও পাপ করিয়াছি ধরা যায়, তাহা হইলেও তাহার মূল সেই জড়শক্তি ভিন্ন আর কিছুই ধরা যায় না। আমি পাপ করিলাম—বলা বাহুল্য অবস্থাচক্রে পড়িয়া করিতে বাধ্য হইলাম। জনসাধারণে যে অর্থে পাপ ব্যবহার করে, এখানে তাহাই ধরিতেছি। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করি—আমি মিথ্যাকথা বলিলাম—কেন? সম্ভবত প্রহার বা তিরস্কারের ভয়ে অথবা অপমানিত হইবার আশঙ্কায়। একথা বলিলে যথেষ্ট নহে যে সকল ভয় তুচ্ছ করিয়া আমি ইচ্ছা করিলে সত্যও বলিতে পারিতাম। সকল ভয় অপমান তুচ্ছ করিবার মত শিক্ষা হয়তো আমার নাই। সে শিক্ষা হয় নাই কেন? হয়তো পিতৃ-পুরুষদিগের বা সঙ্গীদিগের শিক্ষার অভাবে। তাঁহাদেরও উপযুক্ত শিক্ষার অভাব নিশ্চয়ই অবস্থাচক্রে পড়িয়াই ঘটিয়াছে। এইরূপে পিছাইতে পিছাইতে মনুষ্য হইতে জীবজন্তু এবং জীবজন্তু হইতে ক্রমেই জড়শক্তি অথবা ব্রহ্মশক্তিতেই পৌছিতে হয়। সুতরাং পারমার্থিক দিক দিয়া দেখিলে, আমি পাপ করিতেছি, তুমি পুণ্য করিতেছ, এসকল বৃথা অহঙ্কার ও মায়াবাদ মাত্র।

তবে কি ব্রহ্মশক্তিই পাপের উৎপত্তিকারণ? ব্রহ্মশক্তি যে নিজের মঙ্গল নিয়মের প্রতিরোধী পাপ নামক কোন পদার্থ সৃষ্টি করিবেন, তাহা নিতান্ত শৈশবোচিত কথা। আর যদি বলা যায় যে ব্রহ্মশক্তির ভিতরে পাপেরও অস্তিত্ব ছিল, তাহাও পরস্পর-বিরোধী হইয়া পড়ে। যে কোনরূপে নিছোক পাপের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্তিত্বসম্ভাবনা এবং

সুতরাং ঈশ্বরের বিলোপ সম্ভাবনাও স্বীকার করিতে হয়। সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষ তাঁহার নিজশক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া অসত্য, অসুন্দর ও অমঙ্গল পদার্থের স্রষ্টা হইতে পারেন না, কারণ তাঁহার বাহির হইতে কোন শক্তি গ্রহণ করিবার অবকাশই নাই—তিনি নিজে পূর্ণশক্তি এবং সুতরাং চরাচরের যাবতীয় পদার্থ, শক্তি বা ঘটনা তাঁহারই সত্তায় পরিপূর্ণ। শক্তির ধর্ম্মই হইল প্রকাশ, সুতরাং সেই পূর্ণশক্তি পুরুষ স্বপ্রকাশ, কারণ পূর্ণশক্তি দ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্বের অসম্ভাবনা। ইহা যদি সত্য হয় যে তিনি সর্বত্র ও সর্ব্বকালে নিজ স্বরূপে পূর্ণশক্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন এবং সুতরাং তিনি প্রতি পরমাণুতে, প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি মুহূর্ত্তে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, তবে ইহাও সত্য যে আমরা যে কিছু শক্তি বা ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, তাহা পূর্ণশক্তির অতীত ও অতিরিক্ত কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পাপের অস্তিত্ব নাই। পশুপক্ষীদিগের মধ্যে যে বিবাদ কলহ হইতেছে, খাদ্যখাদক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাতে তো পাপের কোন কথাই উঠে না—যদি সত্যই পাপ থাকিত, তাহা হইলে প্রকৃতির সর্বত্র সমানভাবে কার্য্যকরী হইত। পাপেরই যদি প্রকৃত অস্তিত্ব না রহিল, তবে পাপমূল দুঃখক্লেশেরও অস্তিত্ব রহিল না। দুঃখক্লেশের অভাব ঘটিলে ঈশ্বরের পক্ষপাতদোষেরও সুতরাং অভাব ঘটিল। সকলই যখন ব্রহ্মশক্তি, তখন কেই বা কাহার বিষয়ে পক্ষপাত করিবে এবং কাহার বিষয়েই বা অবিচার করিবে? কিন্তু এই সকলই পারমার্থিক দিক দিয়া দেখিলে, নচেৎ নহে। এই সূক্ষ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঋষিরা প্রতিপদে সুখদুঃখের অতীত হইয়া পরমার্থের সহিত নিজস্বকে, আত্মাভিমানকে বলিদান করিতে বলিয়াছেন। জগতের এই পারমার্থিক দিক গীতার একটী শ্লোকে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥" ৪ অঃ, ২৪।

ব্রহ্মই পাত্র, ব্রহ্মই হবি, ব্রহ্মই অগ্নি এবং ব্রহ্মই হোতা; ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে সমাধিমান্ সাধকের ব্রহ্মই গন্তব্য। নিজের নিজত্ব যখন কিছুই থাকিবে না, তখনই এই শ্লোকের মর্ম্ম হৃদ্গত হইবে এবং তখনই বুঝিবে যে পাপের অস্তিত্ব, পক্ষপাতের অস্তিত্ব এসকল কিছুই সম্ভবে না। আর বাস্তবিক তুমি একটী ক্ষুদ্র অসহায় জীব—পদে পদে মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া ভয় করিতেছ, তোমার সাধ্য

কি যে তুমি ব্রহ্মশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও? মশক যদি হস্তীর পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়ায়, তবে তাহা কি নিতান্তই হাস্যাস্পদ হয় না? এখন কথা এই যে, যদি জড়শক্তি অথবা যাবতীয় শক্তি পূর্ণশক্তি দ্বারা ওতপ্রোত থাকে, অথবা অন্য কথায় যাবতীয় শক্তিই যদি পরমার্থত বা বস্তুত ব্রহ্মশক্তি হয়, তবে তাহার আবার সংহত আকারই বা কি আর অসংহতিই বা কি? পারমার্থিক দিক দিয়া ধরিলে বাস্তবিকই সব এক—অবস্থাবিশেষে একই শক্তির এক নাম দাও, অপর অবস্থায় অপর নাম দাও। কিন্তু যেই বিভিন্ন নাম প্রদত্ত হইল, অমনি তাহা হইতে পারমার্থিকতা চলিয়া গিয়া ব্যবহারিকতা আসিল। যোগ অবলম্বনে ব্যবহারিক জ্ঞানকে পরিস্ফুট করিলে পারমার্থিক জ্ঞান স্বতই প্রতিভাসিত হয়। উত্তাপ হইতে যে তাড়িত উৎপন্ন হয়, ইহা অজ্ঞ লোকেরা বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু পরীক্ষা প্রভৃতি বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে তাহাদের জ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করিলে তবে বিশ্বাস করিবে। এমনই প্রকৃতির নিয়ম যে ব্যবহারিক জ্ঞানকে ভিত্তি না করিলে আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। এইবারে পাপের অস্তিত্ব ব্যবহারিক দিক দিয়া আলোচনা করিব।

পরমার্থত যদি পাপের অভাবই ঘটিল, ব্যবহারত পাপের অস্তিত্ব আসিল কি প্রকারে? পারমার্থিক সাম্য হইতে ব্যবহারিক বৈষম্য সৃষ্টিতে কিরূপে আবির্ভূত হইল? এই বৈষম্যতত্ত্ব সৃষ্টির অতীত না হইলে বুঝা ও বুঝান অসম্ভব। বেদান্ত এইস্থলে মায়ার বা ঐশী সৃষ্টিশক্তির অবতারণা করিয়াছেন।* আমাদিগের মতে, মায়ার পরিবর্ত্তে অভিব্যক্তি কথা বসাইলে সকল তত্ত্বের সামঞ্জস্য হয়। আমরা জগতে একটা নিয়মের, শৃঙ্খলার কার্য্যকারিতা দেখিতেছি—মায়াতে ঠিক সে ভাবটী সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে ঈশ্বর যে শক্তি তাঁহার সৃষ্টিতে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহা প্রাণময়। তিনি স্বয়ং জড় পদার্থ বা শক্তি নহেন, সুতরাং তাঁহার শক্তি যে প্রাণময় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখিয়া আমরা বলিতে পারি যে, যখন হইতে প্রাণশক্তির প্রকাশ হইল, তখন হইতেই তাহার কার্য্য অভিব্যক্তি প্রণালীতে হইতে লাগিল। প্রাণশক্তি ও অভিব্যক্তি নিয়ম, উভয়েই বলিতে গেলে অনাদি ও অনন্ত, কারণ তাহারা অনাদি ও অনন্ত পুরুষের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, সেই অনাদি ও অনন্ত পুরুষের অভাবে ইহাদেরও অস্তিত্বের অভাব

হইত নিঃসন্দেহ। তার পর কথা এই যে, যখনই অভিব্যক্তির কার্য্য প্রকাশ পাইল, তখন হইতেই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সৃষ্টির মধ্যে অপূর্ণতা প্রকাশ পাইল। যে স্থানের যে প্রাণাংশ যোগ্যতম হইল, সেই স্থানে তাহারই উদ্বর্ত্তন। সকল স্থানের প্রাণশক্তির সকল অংশ যোগ্যতম হইল না—এইখানেই অপূর্ণতা এবং অগত্যা এইখানেই জীবনসংগ্রামের আবির্ভাব। বলা বাহুল্য যে হিংসা, দ্বেষ বিবাদ কলহের প্রকৃত মূল এই জীবনসংগ্রাম। মিথ্যা বল, হিংসা বল, মদ-মাৎসর্য্য বল, বেশ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এসকলই নিজের জীবনরক্ষা, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অবলম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই জীবনসংগ্রাম, এই অভিব্যক্তি, এবং সর্বশেষে এই প্রাণশক্তি, এই ব্রহ্মশক্তিই পাপের মূল। পারমার্থিক দিক দিয়া যেমন দেখিয়াছি যে মনুষ্যের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব পাপের জন্য দায়ী হইতে পারে না, ব্যবহারিক দিক দিয়াও তেমনি দেখিতেছি যে প্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট আমরা পাপের জন্য দায়ী হইতে পারি না।

যিশুখৃষ্টের আবির্ভাবকালে তাঁহার জন্মস্থানে এপ্রকার পাপের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং পাপের নরকযন্ত্রণা লোকে এত অনুভব করিতেছিল যে, তখন আর তাঁহার বা তৎশিষ্যবর্গের পাপতত্ত্ব বুঝিবার অবকাশই হইল না। তাঁহারা পাপের বিভীষিকাপূর্ণ চিত্র দেখাইয়া জনসাধারণকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পরে ইউরোপ তদানীন্তন রাজবংশ রোমানদিগের নিকট হইতে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং বর্ত্তমান রাজবংশ ইউরোপীয়গণের নিকট হইতে খৃষ্টধর্ম্ম নাই হউক, খৃষ্টধর্ম্মোক্ত নানা ভাব সকল জগতের সর্বত্র গৃহীত হইতেছে—তন্মধ্যে এই বিভীষিকাপূর্ণ পাপচিত্র একটী। ভারতেও যে এরূপ ভাব অর্থাৎ নিজেকে ক্রমাগত পাপীবোধে বিমর্ষ মলিন করিবার ভাব আসে নাই তাহা নহে। আমাদিগের সন্ধ্যাপদ্ধতি ইহার প্রমাণ। তবে আমাদিগের সন্ধ্যা-প্রবর্ত্তক সকল পাপ পরমাত্মাতে আহুতি প্রদান করিতে বলিয়াছেন, এমন কথাটী অন্য কোথাও নাই। ভারতবর্ষ যখন পাপে জর্জ্জরিত হইয়াছিল, সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম তত্ত্ব সকল যখন দেশ হইতে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই সময়ে বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতির ন্যায় অবতার সকল দুর্জ্জয় সংহত ব্রহ্মশক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া লোককে বৈরাগ্যের পথে পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। ইহাঁদেরও অধিকাংশ পাপের ফলে বিষ্ঠাভোজী শূকর প্রভৃতির যোনিতে জন্মগ্রহণরূপ বিভীষিকা দেখাইতে

বাধ্য হইয়াছিলেন। একই প্রকারে নাই হউক, পাপের কোন না কোন বিভীবিকাময় চিত্র আজও বোধ হয় প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় জনসমক্ষে ধারণ করিতে সংস্কারবশে বাধ্য হয়েন। মোটের উপর, সূক্ষ্ম বিচার করিলে পাছে মনুষ্যস্কন্ধ হইতে পাপের দায়িত্ববোঝা নামাইতে হয়, এই ভয়ে বোধ হয় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহার প্রকৃত বিচার দেখিতে পাই না। আরও বোধ হয় যে যদি কোন ব্যক্তি বিচার করিয়া নিজ সম্প্রদায়বিরোধী মতের অবতারণা করিয়া বসেন, তাঁরও সংশয় হয় যে তাহা সত্য কি না, তাহাতে সম্প্রদায়ের অমঙ্গল হইবে কি না, জগতের অমঙ্গল হইবে কি না। এই সকল ভাবিয়া তিনিও সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বাহিরে যাইতে চাহেন না। এই প্রকারে বোধ হয় পাপতত্ত্ব চাপা পড়িয়া গিয়াছে—চাপা পড়িবার প্রধান কারণ অনুমিত হয় যে সকলেরই ভয়, পাছে লোকে দায়িত্বশূন্য হইয়া পাপকর্ম্মে রত হয়। আমরা কিন্তু এমতের পক্ষপাতী নহি। সত্যসুন্দর মঙ্গল পুরুষের রাজ্যের যে কোন ঘটনা বা কার্য্যের প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে অমঙ্গল আসিতে পারে এবিশ্বাস আমাদের নাই। এই কারণে আমরা পাপের মিথ্যা বিভীষিকাপূর্ণ চিত্র দেখাইয়া লোককে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করি নাই।

আমি বলিয়া আসিলাম বটে যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই পাপতত্ত্বের প্রকৃত বিচার দেখিতে পাই না, প্রত্যুত সকলেতেই প্রায় একধরণের বিভীষিকাচিত্র প্রদর্শিত হয়। কিন্তু ভারতের ইহা মহা গৌরবের বিষয় যে একমাত্র গীতায় এই তত্ত্বের প্রকৃত বিচার দেখা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও উপদেশকালে অর্জুনকে ইহাই বুঝাইয়াছেন যে পাপপুণ্য সকলই মূলত পরমাত্মা হইতে গঙ্গাস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। গীতা বলিতেছেন—"মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ" ঈশ্বর হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং অজ্ঞানও উৎপন্ন হয়। আরও স্পষ্ট—

> "বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
> সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয় মেবচ॥
> অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোঽযশঃ।
> ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ ১০ অ, ৪।৫।

উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে গীতোক্ত এই মতই যুক্তিবিচারে প্রকৃত সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। প্রকৃত সত্য

যাহা, তাহা নির্ভীকহৃদয়ে প্রচার করিতে হইবে। আমার সম্প্রদায় বিরক্ত হইবে, তোমার সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হইবে, এপ্রকার বিষ-ধারণা সত্য প্রচারের পথে যেন প্রতিবন্ধক না হয়। পৃথিবী পাপের ভরায় ডুবিয়া যাইবে অথবা পুণ্যের স্রোতে ভাসিয়া উঠিবে, সে ভাবনা তোমার আমার নহে। যাঁহার এই পৃথিবী, যাঁহার এই আমরা তোমরা, তিনিই তাহার লক্ষ্য রাখিবেন।

এইবারে দেখা যাউক যে পাপের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইলে অথবা পাপের চিত্রে বিভীষিকা প্রদর্শিত না হইলে পাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে কি না? পাপের অস্তিত্ব অবশ্য পরমার্থত অস্বীকৃত হয়। যিনি পারমার্থিক পথে সম্পূর্ণ চলিবেন, তিনিই কেবল পাপের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পাপবৃদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই। তিনি অবশ্য পরমাত্মাতে নিজস্ব স্বার্থ সমুদয় সমর্পণ করিয়া মমতাশূন্য ও সুতরাং দ্বন্দ্ববিহীন থাকিতে বাধ্য। স্বার্থই জীবনসংগ্রামের মূল, জীবনসংগ্রামই পাপের মূল; সুতরাং তাঁহার যখন কোন স্বার্থই রহিল না, তখন সেইখানেই পাপবৃদ্ধির সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। পাপের বিভীষিকা না দেখাইলেও যে পাপবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে তাহাও বোধ হয় না। বরঞ্চ বিভীষিকা দেখানই অহিতকর, কারণ বিভীষিকা একবার ভাঙ্গিয়া গেলে ভক্তিমূল শিথিল হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করিতে পারে। আর বাস্তবিক, মৃত্যুর পরে কি হবে না হবে, যাহার বিষয় কেহই নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারে না, তাহার ভয়ে সহজে আপাতমনোরম সুখ সকল বিসর্জ্জন দিতে কে স্বীকৃত হইবে? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে পাপের অব্যাহত স্রোত আজ দেখিতে পাইতাম না। বিশেষত আজকাল বিজ্ঞানের যেরূপ আলোচনা হইতেছে, তাহাতে বিভীষিকা পরীক্ষাস্ত্রের দ্বারা বিখণ্ডিত হইবে নিঃসন্দেহ। এই কারণে আমরা পাপের কল্পিত মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর দাঁড়াইয়া বলের সহিত নিষেধ করিতেছি যে পাপ করিও না। চিকিৎসক রোগ আসিবার পূর্ব্বে সাবধান করিয়া দেন এবং রোগ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতীকারের উপায় অবলম্বন করেন। আমরা পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিয়া দিতেছি যে পাপ করিলে অথবা প্রকৃতির সহজাবস্থা হইতে ভিন্নপথে চলিলে ক্রমশ জড়ত্বের অভিমুখীন হইবে। একটী মিথ্যাকথা বল, তাহাকে সত্যে পরিণত করিবার জন্য আরও পঞ্চাশটা মিথ্যার জোগান দিতে হয়—তাহাতে অগত্যা আত্ম-

শক্তির নিতান্তই অপচয় হইতে থাকে। পাপকর্ম্ম কৃত হইলে তাহার প্রতিবিধান স্বরূপে আমরা উপদেশাদি ঔষধের শরণগ্রহণ করি। কিন্তু আমরা পাপীকেও যেমন ঘৃণা করিতে পারি না, পাপকেও সেইরূপ ঘৃণা করিতে অক্ষম। পারমার্থিক দিয়াই হউক, আর ব্যবহারিক দিক দিয়াই হউক আমাদিগের পঙ্কচন্দনে সমজ্ঞান করিতে হইবে। ইহা হাসির কথা নহে—ইহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলে এবং তদনুসারে কার্য্য করিলে মানবের কোন কিছুর অভাব থাকে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। এক, যদি প্রত্যেক পরমাণু; প্রত্যেক শক্তিকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়া উপলব্ধি কর, তাহা হইলেতো স্পষ্টই ঘৃণা করিতে পারিবে না। আর, যদি সকল পদার্থকে, সকল শক্তিকে একই শক্তির অভিব্যক্ত আকার বলিয়া ভাব তাহা হইলেও কোনটীকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়া কোনটীকে সাদরে গ্রহণ করিতে পার না—কারণ সকলেরই যথাযথ দেশকালে অভিব্যক্তির একটা সম্ভাবনা আছে। পঙ্ককে গৃহে জমা করিয়া রাখিতে কেহ বলে না, সেইরূপ চন্দনকে সারস্বরূপে ব্যবহার করিবারও উপদেশ কুত্রাপি নাই। সেইরূপ প্রকৃতপক্ষে পাপও প্রকৃতির অভিব্যক্তির একটা সহায়, তাহা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং পাপেরও দাঁড়াইবার একটা স্থান আছে। ঈশ্বর যদি থাকেন এবং তিনি যদি সর্ব্বদর্শী হন, তবে নিশ্চয়ই সেই পাপ যে শুভফলোৎপাদক হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। একসময়ে একজন আত্মীয়ের পরামর্শে আমরা কয়েকজন বালক মিলিত হইয়া পাখীর পালক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। একদিন আমি একটী চড়ুই পাখীর বাসা ভাঙ্গিয়া পালক সংগ্রহ করিতে গেলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে সেই বাসায় একটা ডিম ছিল, বাসার সঙ্গে সঙ্গে ডিমটিও পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সেই অবধি পালকসংগ্রহ পরিত্যাগ করিলাম এবং নিরামিষাহার-প্রবণ হইয়া পড়িলাম। ঐ যে মনে হইল, একটী জীব বিনাপরাধে ও বিনাপ্রয়োজনে নষ্ট হইল, আজও সেই কথা আমার মনে যখন তখন অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব জাগ্রত করিয়া দেয়। পঙ্ক যেমন চাষার কাছে ঘৃণার পরিবর্ত্তে আদরের বস্তু এবং ধনীর নিকটে ঘৃণার বস্তু, সেইরূপ পাপও অধিকাংশস্থলে মনুষ্যের মনের উপর এবং বিভিন্ন অবস্থার উপরে নিজ অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে। তুমি একটী মিথ্যা কথা বলিয়া পঞ্চাশজনকে হয়তো গুপ্তহত্যা হইতে রক্ষা করিলে, তাহা পুণ্য বলিয়া গণিত হইল এবং তুমি যদি মিথ্যাকথা, এমন কি, সত্যকথা বলিয়াও পঞ্চাশজনের বধ

সাধনের উপায় করিয়া দাও, তাহা হইলে তোমারই তাহা পাপ বলিয়া বোধ হইবে, অপরের তো কথাই নাই। সুতরাং পাপপুণ্যের বিচার অবস্থার উপরে নির্ভর করে—যে কার্য্যে আত্মশক্তির সংহতি যত অধিক বিধান হইবে, তাহাই পুণ্য এবং যে কার্য্যে যত অধিক অসংহতি হইবে তাহা তত অধিকতর ঘৃণ্য পাপ বলিয়া গণ্য হইবে।

আর, বাস্তবিকই কি পাপপুণ্যের হ্রাসবৃদ্ধি আমাদের হাতে? জীবনসংগ্রামই বলিতে গেলে যে পাপের মূল, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জীবন-সংগ্রাম যত তীব্রতর হইতে থাকিবে, পাপের আধিক্য-সম্ভাবনা তত অধিক হইবে। দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব উপদ্রব যে জীবনসংগ্রামকে তীব্র করিয়া তুলে তাহা বলা বাহুল্য। আবার আজকাল সপ্রমাণ হইয়াছে যে সৌরকলঙ্কের সহিত অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রবের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সৌরকলঙ্ক উৎপাদন করা কি তোমার আমার উপর নির্ভর করে? তাহা যখন নহে, তখন ইহা বলা বৃথা যে পাপের হ্রাসবৃদ্ধি আমাদের হাতে, এবং ইহা বলাও অসঙ্গত যে পাপের জন্য আমরা দায়ী। এই প্লেগ যে আমাদের দেশকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল, ইহার ফলে নগরগ্রাম ছাড়িয়া লোক সকল পলায়ন করাতে বাণিজ্য প্রভৃতির কত না ক্ষতি হইল এবং তাহার ফলে কত গৃহে অনাহার অর্দ্ধাহার প্রবেশ করিয়া কত লোককে মন্দপথে প্রেরণ করিল, কে তাহার গণনা করিয়াছে? সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম, উড়িষ্যা প্রদেশে যখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, তখন কয়েকটী দেশবাসী সাগরজল হইতে বিক্রয়ার্থ লবণ প্রস্তুত করিবার অপরাধে বিচারকের নিকট আনীত হইল। বিচারক দেখিলেন যে তাহারা অনাহারের তাড়নায় এরূপ করিয়াছে অথচ তিনি আইনানুসারে শাস্তি দিতে বাধ্য। অবশেষে প্রত্যেকের এক টাকা করিয়া জরিমানা করিয়া নিজে তাহা দান করিলেন। এইস্থলে প্রথমত তাহাদের কার্য্যকে পাপ বলা যায় না এবং যদিবা তাহা পাপ হয় অর্থাৎ লুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করা অন্যায় হয়, তবে তাহার জন্য তাহাদিগকে দায়ী করা যায় কি? দুর্ভিক্ষই কি তজ্জন্য দায়ী নহে? ইহা বুঝিবার জন্য নৈয়ায়িক তর্ক দরকার নাই—সরলভাবে বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। ভূমিকম্প হইল, তজ্জন্য হয়তো চৌর্য্য বৃদ্ধি পাইল। ভূমিকম্প না হইলে তো আর চোরেরা প্রলোভনে পড়িত না। এইরূপে যেদিক দিয়াই দেখি-

বার চেষ্টা করি, দেখি যে ক্ষুদ্র জীব পাপপুণ্যের জন্য দোষার্হ বা প্রশংসার্হ হইতে পারে না—সকলই সেই ব্রহ্মের চরণে নিবেদন করিতে হইবে। তাই গীতা বলিতেছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮অ, ৬১।

তুমি হয়তো বলিবে যে তবে তুমি পাপ করিবে না কেন? প্রকৃতির এমনই নিয়মবন্ধন যে প্রকৃত পাপ করিলে প্রথম হইতেই তজ্জনিত ক্লেশভোগ করিতে থাকিবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে এসকলই ব্যবহারিক দিক্ হইতে বলা হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা না হয় যে তুমি পাপ বা অসংহতি-জনক কর্ম্ম কর, তবে তোমার তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিই হইবে না। দেখ, এক ব্যক্তি ধনী ও ধার্ম্মিক গৃহস্থের গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। শৈশব কাল হইতেই তাহার সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতে লাগিল, এবং তদুপরি নানা ধর্ম্ম উপদেশ ও দৃষ্টান্ত পাইতে লাগিল, সুতরাং তাহার পাপের দিকে হয়তো প্রবৃত্তি যাইবার কোন অবকাশই হইল না। আর একজন হয়তো এক দরিদ্র ও দুর্বৃত্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পদে পদে স্খলিতপদ হইতে লাগিল। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত আর কি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে? অভিব্যক্তি প্রভৃতি অথবা পিতৃপুরুষের দোষগুণ প্রভৃতি উপলক্ষ্য মাত্র—আবার সেই প্রশ্ন আসে যে কেন এরূপ বিভিন্ন অবস্থায় দুইটী আত্মার আবির্ভাব ঘটিল? এইখানে একটী কথা বলিয়া রাখি যে যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম অস্বীকার করিয়া পাপের অস্তিত্ব ও তজ্জনিত নরকযন্ত্রনার বিভীষিকা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের কথা নিতান্তই অযৌক্তিক বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহারা আসলে প্রকৃত সংশয়ের সহিত সত্যাসত্য সংগ্রাম করিয়া মীমাংসা করিতে উদ্যত নহেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা পাপপুণ্যের পার্থিব ফলাফল দেখাইয়াই অনেকটা নিরস্ত থাকেন দেখা যায়। আমরা তাহা পারিলাম না, আমাদিগের মতে সংশয়াগ্নিকে গোপনে পোষণ করিয়া দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা তাহার মূলোৎপাটনে যত্ন করা অনেক শুভজনক।

এইখানে আমরা ফলিত জ্যোতিষের দিক্ দিয়াও আমাদের দায়িত্ব বিষয়ে আলোচনা করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। যখন জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিতে পারিল যে তোমার দুই বৎসর পূর্ব্বে ইহা ঘটিয়াছিল, দশবৎসর পরে উহা ঘটিবে,

তখন কেমন করিয়া বলিব যে মূলত আমাদিগের কার্য্যের জন্য আমরা দায়ী? ফলিত-জ্যোতিষে অবিশ্বাসী ব্যক্তি বলিবেন যে জ্যোতিষীর সকল কথা ঠিক মেলে না, দৈবাৎ দুই একটী কাকতালীয়ের ন্যায় মিলিয়া যায়। এই কথার বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। যদি একটীও ঘটনা গণনানুসারে সম্ভব বলিয়া ব্যক্ত হয় এবং তাহা সত্যে পরিণত হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে ফলিতজ্যোতিষ বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটী অঙ্গ এবং ইহা দ্বারা ভূতভবিষ্যৎ গণনা করা যাইতে পারে—সকল গণনার নিখুঁত নিয়ম আবিষ্কারের অভাবে ইহা এখনও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বলিয়া গৃহীত হইতেছে না এই মাত্র। শুনিয়াছি, পূজ্যপাদ পিতামহদেব এবং পূজ্যপাদ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়েরও কোষ্ঠীতে লিখিত অনেক ঘটনা জীবনের সহিত মিলিয়াছে। আমি ফলিত জ্যোতিষে কখনও বিশ্বাসী ছিলাম না এবং এখনও ইহা অনুন্নত বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু বলিয়া বিশ্বাস করি না। একসময় আমি পরীক্ষার জন্য নষ্ট-কোষ্ঠী-উদ্ধার শিক্ষা করিয়াছিলাম এবং তন্নিয়ম অবলম্বনে নিজের সাময়িক মনের অবস্থা বাহির করিয়া জীবনের সহিত ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল দেখিলাম। অবশেষে একদিন আমাদের পারিবারিক কোষ্ঠীপ্রণেতা উপস্থিত হইলে পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে লিখিত তারিখে আমার মানসিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম। অতীত কালের ঘটনা কাহারও নিকট জানিয়া বলিতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা মিলাইবার জন্য অনেক সময়ে অব-কাশ ও স্মৃতির অভাব ঘটে। এই কারণে নিঃসংশয় হইবার জন্য আমার নিজের মানসিক অবস্থা, যাহা কেহ জানিত না, সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। অবশেষে আমার লিখিত অবস্থা এবং তাঁহার গণিত অবস্থা একেবারে ঠিক মিলিয়া গেল, সেই অবধি আমি ফলিতজ্যোতিষে বিজ্ঞান বলিয়া কিঞ্চিৎ আস্থাবান্ হইয়াছি। এই যে উভয়ের গণনা ঠিক মিলিয়া গেল, ইহাকে আমরা কিছুতেই কাকতালীয় বলিতে পারি না। যদি এই গণনার মধ্যে এতটুকুও সত্য থাকে, তবে একজন বাহিরের লোক কি প্রকারে সে সত্য বাহির করিল? তবেই স্বীকার করিতে হয়, ভূতভবিষ্যৎ বিধিলিখনের জন্য মানব সম্পূর্ণ দায়ী নহে। আর যদি বল যে মুখ, চোখ, অবস্থা প্রভৃতির ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভূতভবিষ্যৎ বলিতে পারে—তাহাই বা পারে কেন? যে কোনরূপেই হউক ভূতভবিষ্যৎ গণনার আয়ত্ত হইলেই বুঝিব যে মানব মূলত তাহার কৃত কার্য্যের জন্য দায়ী নহে, তবে

আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে অর্থাৎ যে অবস্থায় পড়িয়াছে সেই অবস্থারই ভিতরে সংহতি সাধন করিতে বাধ্য এবং সুতরাং এই বিষয়ে দায়ী।

অভিব্যক্তিবাদের ফলাফল আলোচনা করিতে গিয়া আমরা অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। উপসংহারে আমাদের সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, সর্ব্বতোভাবে আত্মার সংহতিসাধন আবশ্যক। ঈশ্বর অভিব্যক্তি নিয়মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র এই সংহতিসাধনের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমরা ইচ্ছা করি আর নাই করি পরিণামে এই নিয়মের অনুসরণ করিতেই হইবে—তবে বিলম্বে বা সত্বরে। আমাদের কর্ত্তব্য প্রকৃতির সহজাবস্থা অনুধাবনপূর্ব্বক অভিব্যক্তির সহায়তা করি। মানব যেমন একদিকে ক্ষুদ্র কীট, অপরদিকে সংহত আত্মশক্তি অবলম্বনে ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভের অধিকারী। যিনি একবার সেই অমৃতরসের আস্বাদন করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে সংহত আত্মশক্তির ক্ষমতা কি অসীম। উপনিষদে এই কারণে বারম্বার উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।" এই সংহতিসাধন করিতে গেলে যোগাবলম্বন আবশ্যক। যোগের নামে ভয় পাইবার কোনই কারণ নাই। সংক্ষেপে যোগের মর্ম্ম এই যে চিত্তকে একাগ্র করিবে; ঈশ্বরে দৃঢ়ভক্তি হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে সংসারে বিচরণ করিবে; অহিংসায় মনোযোগী হইবে; কর্ত্তব্যের নিকট আত্মবলিদানে দ্বিধা করিবে না; ক্ষমতা যদি থাকে পাপের প্রতিবিধান করিবে, ক্ষমতার অভাবে পাপকেও ঘৃণা করিও না, পাপীকেও ঘৃণা করিও না। ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে মনুষ্য দেবতা সকলকেই সমদৃষ্টিতে ও ব্রহ্মময় দেখিতে অভ্যাস করিবে। সর্ব্বোপরি, নিজেকে ব্রহ্মের চরণে সম্পূর্ণ বলিদান করিবে। ইহার ফল, তোমার আত্মজ্ঞান এবং তৎপ্রতিষ্ঠ পার্থিবজ্ঞান সমুদয়ই করতলন্যস্ত হইবে এবং ভগবান নিজে তোমার জন্য ভাবিয়া অস্থির হইবেন, তোমার "যোগক্ষেম" বা প্রয়োজন সকল তিনি নিজে সম্পন্ন করাইতে বাধ্য হইবেন। "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥" (গীতা ৯অ, ২২) যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া করিবে, কখনও ভাবিবে না যে তুমি করিতেছ। এইরূপ সমর্পিতচিত্ত ব্যক্তি পাপ করিতেই পারেন না এবং যদি বা কোন সূত্রে এমন কাজ করেন, যাহাতে লোকে অন্যায় ভাবিতে পারে, তাহাও পাপরূপে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

"যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৮ম, ১৭।
"ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ৫ম, ১।

আসক্তিরহিত হইয়া কর্ত্তৃত্বজ্ঞানকে বলিদান করিয়া যদি পাপও করা যায়, তবে তাহাও পদ্মপত্রে জলের ন্যায় পাপকারীকে স্পর্শ করিতে পারে না এই কথার মধ্যে একটী নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। বলা বাহুল্য যে আসক্তিরহিত ব্যক্তি পাপ করিতে পারে না। কিন্তু যদি ভুলিয়াও করেন, তবে তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইহার অর্থ এই যে ভগবান সেই পাপকে পুণ্যে অথবা আত্ম-শক্তির অসংহতিকে সংহতিতে প্রত্যাবর্ত্তিত করেন। তুমি "আমি অহংজ্ঞানে মত্ত হইয়া এতত্ত্বে অবিশ্বাস করিতে পারি—মনে করিতে পারি যে ইহাও তো বড় আশ্চর্য্য. আমি করিলাম পাপ অথচ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে না? ভগ-বান কি হাঁকে না করিতে পারেন? পাপকে পুণ্যে ফিরাইতে পারেন? একটু প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে ভগবানের এসামর্থ্যটুকু আছে। ইহা আছে বলিয়াই আজও লক্ষ লক্ষ কোটী কোটি লোকে তাঁহার নিকটে পাপ হইতে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া ক্ষমা লাভ করিতেছে। এই কারণেই তাঁহার নাম শরণাগতবৎসল পাপীতারণ ভয়হরণ ভবার্ণবকাণ্ডারী। পাপ হইতে মুক্তিপ্রার্থনায় যিনি সরলভাবে কাতরপ্রাণে ভগবানকে ডাকিয়াছেন, তিনিই সদ্যসদ্য প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় বলি-য়াই আজও তাঁহার নাম সর্ব্বক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মনের সংশয় নিবা-রণের জন্য এইরূপ প্রার্থনা কিরূপে সফল হইতে পারে আমরা তাহারই ইঙ্গিত করিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে পাপ অনেকটা মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। জগতের যে কোন শক্তির বা নিয়মের অযথা-ব্যবহারেরই আমরা নাম দিই পাপ। কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর যথাযথ ব্যবহারে পাপ হয় না, রিপু আখ্যাই প্রদত্ত হয় না; তখন ইহারা বন্ধুর কার্য্য করে। বন্ধুগণের সহিত অসঙ্গত ব্যবহারে তাহারাই শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, পাপে পরিণত হয়। বস্তু-সংগ্রহ অন্যায় নহে, কিন্তু তাহার অপব্যবহারই লোভে পরিণত হইয়া পাপের আকার ধারণ করে। পাপের ফল সাধারণ দৃষ্টিতে অমঙ্গল। এখন যদি একটা

পাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং তজ্জন্য মুক্তিপ্রার্থনা করা হয়, তাহা হইলে ভগবান সেই পাপের অনুষঙ্গে এমন ঘটনারাশি প্রেরণ করিতে পারেন যেগুলি সেই পাপ-অনুষ্ঠাতা এবং জনসাধারণের দৃষ্টিতে মঙ্গলপ্রসূ প্রতীয়মান হয়। ইহাও যে অনিয়মে ঘটিবে তাহা নহে। একদিকে দেখি যে সেই পাপ অনুষ্ঠান, সেই প্রার্থনা এবং তদানুসঙ্গিক ঘটনাসমূহের সংঘটন, সকলই ভগবানের জ্ঞানে বর্ত্তমান ছিল। সেই ঘটনাগুলিও দৈবক্রমে ঘটিবে না, তাহারও কার্য্যকারণশৃঙ্খলা অবশ্যই থাকিবে। এইরূপে প্রার্থনা ও তৎফললাভ ঘটিলে তাহাই তো একটা নিয়মের মধ্যে পড়িয়া গেল। অন্যদিকে দেখি, ঈশ্বর যেন সকল ঘটনাকে যথাযথ সংযোজিত করিয়া দেন—আমরা অবশ্য ঘটনার কার্য্যকারণশৃঙ্খলা সকল সময়ে না ধরিতে পারি। আমি পাপ হইতে মুক্তিলাভেচ্ছায় কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিয়া হয়তো নিদর্শন দেখিতে চাহিলাম। দৃষ্টান্তস্বরূপে ধরিতেছি যেন মেঘ হইয়াছে দেখিয়া আমি ভাবিলাম যে যদি ঈশ্বর আমার পাপ মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই মেঘ জলবর্ষণ করুক। জলবর্ষণ হইল। কিন্তু অবশ্য আমার প্রার্থনার কারণেই যে জলবর্ষণ হইল তাহা নহে, তবে তাহার আপনার কার্য্যকারণশৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইয়া জলবর্ষণ হইল, মধ্য হইতে জলবর্ষণ ও আমার প্রার্থনার সামঞ্জস্য করিয়া আমি শান্তিলাভ করিলাম—ইহাই কি অনিয়মিত হইল? কখনই নহে—ইহাও নিয়মের মধ্যে। মোটের উপর, ভগবান কি নিয়মে তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন, আমাদের আত্মশক্তিকে উপযুক্তরূপে সংহত না করিলে সেই সকল উপলব্ধি করিবার আশা বৃথা।

সর্ব্বশেষ বক্তব্য এই যে আত্মোন্নতি সাধন কর; একমাত্র ঈশ্বরকে নয়নের সম্মুখে সর্ব্বদা রাখিয়া হিমাচলের ন্যায় অটলপ্রতিষ্ঠ হও; নির্ভীক হৃদয়ে সংসারে বিচরণ কর এবং জগতকে অভয়দান কর। দিবানিশি বলিতে থাক, আমি কেহ নহি, তুমিই সব—আমিই তুমি, তুমিই আমি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী সন্ন্যাসী আসিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া কলিকাতার পথে পথে বিচরণ করিতেন এবং একটী সুমধুর মন্ত্র সুমধুর স্বরে পাঠ করিতেন—"ওঙ্কারে নিরাকারে নির্ব্বিঘ্নং? এই মন্ত্র সকলে গ্রহণ কর—"ওঙ্কারে নিরাকারে নির্ব্বিঘ্নং"—সেই নিরাকার ওঁকার স্বরূপ পরব্রহ্মেই নির্ব্বিঘ্ন। কথাটা যে কতদূর ঠিক, তাহা বিনা সাধনে কাহাকেও বুঝাইবার ক্ষমতা আমাদের

নাই। তবে সকলকে আর একবার অনুরোধ করি, তাঁহারা জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত ব্রহ্মে সমর্পণ করুন এবং প্রত্যক্ষ দেখুন যে এই গম্ভীর মন্ত্র "ওঁকারে নিরাকারে নির্ব্বিঘ্নং" অক্ষরে অক্ষরে সত্য, পরীক্ষিত সত্য। তাঁহাতেই অভয়, তাঁহাতেই শান্তি।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অভিব্যক্তিবাদ কথায়
অভিব্যক্তিবাদ ও পাপ মুক্তি ষোড়শ কথা সমাপ্ত।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ।
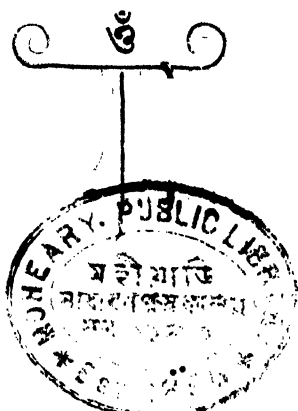
আর্য্য-রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে মতামত।

—০॰॰০—

Indian Mirror 30th June, 1901.

A perusal of the book under notice will convince even the most careless reader that the author knows fully well what he is about. "Motherhood" is the author's ideal of womankind, and in this book he has shown how far the education of Aryan women in the olden times made them approach that ideal, and how far the so-called education that is now imparted to them has had the effect of keeping them away from it. He has discussed and proved the following propositions :—First, that the Vedas, Tantras and other authoritative works contain nothing against Aryan women studying the Vedas and other works; secondly, that the Western system of education and liberty which are so eagerly sought after by the parents, and imparted to Aryan girls, are utterly incompatible with the ideal of "Motherhood", and therefore unsuitable to them; and, thirdly, that the system of education in use in days of old as also the system of seclusion such as obtained in the Vedic times, are the best calculated to preserve the "Motherhood," and the chastity of Aryan women intact, and these are eminently fit for adoption by them. The writer is a keen observer of social manners and customs, and an utter stranger to the art of mincing matters. He is unsparing in his condemnation as much of the "balls" as of the "Nautches" held in Hindu houses at times of marriage and other festivities. He condemns the European system of dressing which is affected by some go-a-head Indian ladies, and proposes a dress for out-door use which is at once cheap and decent. The author is liberal in his conservatism, and the gist of all that he urges is that Hindu ladies should not

adopt any customs, or systems of education and dressing that are outside the spirit of the Hindu Shastras, though in the present circumstances of the society they may appear to be going beyond the letter of them. The book before us is the result of careful thought and an earnest wish to better the condition of Hindu women, and it provides ample food for those who are interested, like the author, in bringing about the end desired.

আর্য্য-রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ তত্ত্ব-নিধি প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার ইতিমধ্যে কয়েকখানি সুন্দর পুস্তক প্রচার করিয়া সাহিত্য জগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকখানি যে মূলসূত্র ধরিয়া তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয় অর্থাৎ ঈশ্বরের মাতৃভাব স্ত্রী-প্রকৃতির মূলে এবং সেই মাতৃভাবের বিকাশেই স্ত্রীজীবনের সার্থকতা। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তিনি স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ কথার সহিত আমাদের ঐক্য আছে। বিলাতী আদর্শে এ দেশের নারীদিগকে গঠন করিতে গিয়া অনেকে যে মহাভ্রমে পড়িতেছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াও তিনি বঙ্গ সমাজের মহোপকার করিয়াছেন। গ্রন্থকারের স্বদেশহিতৈষিতা, প্রাচীন সুপ্রথা সংরক্ষণের চেষ্টা এবং আর্য্যরমণীদিগের চরিত্রোৎকর্ষ দর্শনের আগ্রহ বড়ই আনন্দজনক। কিন্তু প্রাচীনত্বের অতিরিক্ত পক্ষপাতিতাহেতু অবরোধ প্রথা প্রভৃতি কয়েকটী দেশাচারের যেরূপ সমর্থন করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা মিলিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। সুপ্রথা সকল সংরক্ষণ পূর্ব্বক কুপ্রথার সংস্করণ ভিন্ন ভারতের উন্নতির উপায় নাই। বামাবোধিনী, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি এ, তত্ত্বনিধি প্রণীত "আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা" নামক গ্রন্থ একখানি আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। "দেশীয় ভাবে সর্ব্বাঙ্গীন উচ্চ শিক্ষা যাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজে প্রবর্ত্তিত হয় সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার সদ্যুক্তি এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে ইহা লিখিয়াছেন। দৃষ্টান্ত এবং আদর্শরূপে শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরীর উচ্চ শিক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এক দিকে মহাকালী পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালী অপর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষোচিত

কঠিন শিক্ষা দেশীয় কন্যাগণকে স্ত্রীস্বভাবের এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিরুদ্ধে লইয়া যাইতেছে, এ সময় ক্ষিতীন্দ্র বাবু এই গ্রন্থখানি লিখিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আর্য্যকুলনারীরা ইহা পাঠ করিলে অনেক সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন। পরলোকগতা মহারাজ্ঞী অস্বাভাবিক উচ্চ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। নারীস্বভাবের উপযোগী উচ্চ শিক্ষা প্রচার এখন নিতান্ত প্রার্থনীয়। নববিধান, ফাল্গুন, ১৩০৭।

১৩০৮ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার নব্যভারতে "ক্ষিতীন্দ্রনাথের নূতন গ্রন্থ" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুহ লিখিতেছেন—"গ্রন্থটা সত্যই বড় Revolutionary। সকল সমাজে, বিশেষত র‍্যাডিকাল সমাজে, এ গ্রন্থের ভূয়ঃ প্রচার হউক। অতীতে এমন ভক্তিমান্, অথচ বর্ত্তমানে এত চক্ষুষ্মান্—এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থ বহুদিন পাঠ করি নাই।"

৬। অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র, ডাঃ মাঃ অর্দ্ধ আনা।

এই পুস্তকে হার্ব্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদী দিগের মত খণ্ডন করিয়া ভারতীয় সনাতন অধ্যাত্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্যোগ হইতেছে।

৭। রাজা হরিশ্চন্দ্র—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে বেদ অবধি কৃত্তিবাস রামায়ণ পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্র কথার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। উপসংহারে পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র কথার নিবৃত্তিভাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

৮। আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাঃ মাঃ ৴৹ এক আনা। এই পুস্তকখানি ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

৯। আমিষ ও নিরামিষ আহার—শ্রীমতী প্রজ্ঞা দেবী প্রণীত। ইহাতে দেশীয় ও বিদেশীয়, আমিষ, নিরামিষ, মিষ্টান্ন ও চাটনী প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্যের প্রস্তুত-প্রণালী, সুচারুরূপে লিখিত আছে। না দেখিলে ইহার কৃতিত্ব উপলব্ধ হইবে না।

১০। পাঁড়ি দরপাঁড়ি—নবাবিষ্কৃত ভারতের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সম্বলিত। মূল্য ৸৹ আনা, ডাঃ মাঃ অর্দ্ধ আনা।

১১। স্বভাব সঙ্গীত—৺হরদেব চট্টোপাধ্যায় রচিত মূল্য ॥৹ আট আনা ডাঃ মাঃ অর্দ্ধ আনা।

১২। Padaprante Rakho Sevake.

১৩। A Vedic Pymn.

Two musical pieces composed for the Pianoforte by Manisha Tagore (Trinity College,) Price 4s. each, postage half anna.